তা লি বে ই ল মে র

জীবন পথের পাথেয়

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী (রাহঃ)

অনুবাদ- আবু তাহের মেসবাহ
শিক্ষক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য
মাদরাসাতুল মাদীনাহ্ আশ্‌রাফাবাদ
লালবাগ, ঢাকা - ১৩১০

প্রকাশনায়

দারুল কলম

মাদরাসাতুল মাদীনাহ্ আশ্‌রাফাবাদ
লালবাগ, ঢাকা - ১৩১০
ফোন ঃ ৭৩২০২২০

প্রকাশক–
দারুল কলম
মাদরাসাতুল মাদীনাহ্ আশ্‌রাফাবাদ
লালবাগ, ঢাকা – ১৩১০

(সর্বস্বত্ত্ব অনুবাদকের)

প্রথম প্রকাশ–
রজব, ১৪২৩ হিজরী
সেপ্টেম্বর, ২০০২ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ- বশির মিছবাহ

মুদ্রণে– মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস
৪৯, হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা- ১২১১

কম্পিউটার কম্পোজ–
দারুল কলম কম্পিউটার
মাদরাসাতুল মাদীনাহ্ আশ্‌রাফাবাদ, লালবাগ, ঢাকা-১৩১০
ফোন ঃ ৭৩২০২২০ ।।

যে খা নে পা বে ন

মাওলানা ইয়াহ্‌য়া ছাহেব/
ইমাম জামেয়া শারইয়্যা মালিবাগ মসজিদ,
মালিবাগ, ঢাকা

মোহাম্মদী লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা, ১২১১

মোহাম্মদী কুতুবখানা
৩৯/১ নর্থ ব্রুক হল রোড বাংলাবাজার, ঢাকা

আহ্‌সান পাবলিকেশন্স
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা ১০০০
১৯১, ওয়ারলেস রেলগেইট, মগবাজার,
ঢাকা ১২১৭

কোহিনুর লাইব্রেরী
পাঠকবন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলাবাজার

মীর পাবলিকেশন্স
বাইতুল মুকাররম, ঢাকা

করীম ইন্টার ন্যাশনাল
মনিপুরী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা
ফোন– ৯১৩০৪৫৭

হাদিয়া ঃ ১০০ টাকা মাত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

নিবেদন

আম্মা-আব্বাকে, যারা নিজেদেরকে তিলে তিলে ক্ষয় করে আমাকে লালন-পালন করেছেন, শিক্ষা দিয়েছেন এবং মানুষ করার চেষ্টা করেছেন।

আব্বা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। কবরে আল্লাহ্ তাঁকে আরামে রাখুন। কবরের উপরে যেমন ফুল ফুটে আছে, কবরের ভিতরে যেন জান্নাতের ফুল ফুটে থাকে।

আম্মার মমতার ছায়া এখনো আছে আমার মাথার উপরে। আল্লাহ্ তাঁকে নিরাপদ ও দীর্ঘ জীবন দান করুন।

আমার বাবার কবর যেন শান্ত থাকে, আমার মায়ের হৃদয় যেন প্রশান্ত থাকে। হে আল্লাহ্! তোমার কাছে এই আমার মিনতি, এই আমার প্রার্থনা। আর বান্দার ডাক তুমি শোনো এই আমার 'ধারণা'।

সূচীপত্র

কিছু কথা, কিছু ব্যথা

একটা সময় আসে যখন ঝিনুক সমুদ্রের তলদেশ থেকে উঠে আসে এবং ষ্টিবিন্দুর জন্য উন্মুখ থাকে। সেই পরম মুহূর্তে যদি সে লাভ করে এক ফোঁটা বৃষ্টি, তাহলেই জন্মলাভ করে একটি মুক্তা।

মানবহৃদয় যেন সমুদ্রের তলদেশের সেই মুক্তা-ঝিনুক। হৃদয় যখন উন্মুখ হয় তখন আলোর সামান্য পরশেই তাতে সত্যের উদ্ভাস হয়, ভালোবাসার অঙ্কুরোদ্গম হয় এবং সৌভাগ্যের উন্মেষ হয়।

হঠাৎ একদিন আমারও হৃদয় তেমনি উন্মুখ হয়েছিলো কোন আলোকিত মানুষের একটু হাতছানির জন্য। কেননা হৃদয় অনুভব করেছিলো, অন্ধকারের মধ্য দিয়ে জীবনের দুর্গম পথে চলতে হলে আলোকনির্দেশের প্রয়োজন, আর তখনই আমি শুনতে পেলাম একটি নাম– মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নাদাবী।

হৃদয় উন্মুখ ছিলো, তাই হৃদয়ের কোমল মটিতে ভালোবাসার অঙ্কুরোদ্গম হলো এবং সেই ধীরে তা সবুজ বৃক্ষ হয়ে আমার সমগ্র হৃদয় জুড়ে ছায়া বিস্তার করলো।

আমি ভালোবাসলাম এই নামটিকে এবং এই নামের মহান মানুষটিকে। তাঁর জ্ঞানের কথা, গুণের কথা; তাঁর প্রতিভার কথা, প্রজ্ঞার কথা; তাঁর চিন্তার কথা, চেতনার কথা; সর্বোপরি তাঁর আত্মার ও আত্মশুদ্ধির কথা কিছুই আমার জানা ছিলো না, জানবার যোগ্যতাও ছিলো না। তবু ভালোবাসার অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিলো, কেননা হৃদয় তখন উন্মুখ ছিলো। ঝিনুক যখন উন্মুখ হয় এবং বৃষ্টি-বিন্দুর বর্ষণ হয় তখন মুক্তার জন্ম হয়। হৃদয়ও যখন ব্যাকুল হয় এবং বীজ প্রক্ষিপ্ত হয় তখন ভালোবাসার অঙ্কুরোদ্গম হয়।

ধীরে ধীরে তাঁর বিশাল ব্যাপ্ত জীবনের কথা জানলাম, তাঁর কলমের, তাঁর চিন্তার এবং তাঁর হৃদয়ের পরিচয় পেলাম – একজন ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে যতটুকু সম্ভব – তখন আমি আমার চিন্তার জগতে, কর্মের জগতে এবং হৃদয়ের জগতে তাঁকে আলোর মিনাররূপে গ্রহণ করলাম এবং তাঁর চিন্তার আলোক-রেখা অনুসরণ করে পথ চলা শুরু করলাম।

তারপর সৌভাগ্যের দিগন্ত আরো বিস্তৃত হলো। দুর্ভাগা বাংলাদেশ একদিন তাঁর শুভাগমনে আলোকিত হলো। তাঁর নূরানী চেহারা দেখে, তাঁর মোবারক হাত ছুঁয়ে আমি ধন্য হলাম। তিনি আমাকে চিনলেন। স্নিগ্ধ হাসি ও কোমল উপদেশ উপহার

দিলেন এবং মধুর করে বললেন, 'মুঝে আপসে দিলী মুহাব্বত হায়'। আমি অভিভূ হলাম। কৃতজ্ঞতার দু'ফোঁটা অশ্রু নিবেদন করে শুধু বলতে পারলাম, জাযাকাল্লাহ!

উম্মাহর চিন্তার জগতে, কর্মের জগতে এবং হৃদয়ের জগতে তিনি আলোর মিন হয়ে বিরাজ করলেন। মুখের কথা দিয়ে, কলমের লেখা দিয়ে আমাদের পথ দেখালে পাথেয় যোগালেন। চিন্তার ফসল দিয়ে, চেতনার সম্পদ দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করলে এবং আত্মার সান্নিধ্য দিয়ে, হৃদয়ের উত্তাপ দিয়ে আমাদের উদ্দীপ্ত করলেন। তারপ চিরবিদায় গ্রহণ করলেন। তিনি শান্তির সরোবরে অবগাহণ করলেন, আমরা শোকে সাগরে নিমজ্জিত হলাম। আল্লাহ তাঁকে শান্তি দান করুন এবং আমাদের সান্ত্বনা দা করুন। আমীন।

***

উম্মাহর প্রতি তাঁর বহুমুখী ও সুদূরপ্রসারী অবদানের একটি অবিস্মরণীয় দিক এ যে, আকাবিরে উম্মাহর সমগ্র জ্ঞান-ভাণ্ডার মন্থন করে এর সারনির্যাস তিনি রে গেছেন তাঁর রচনাসম্ভারে। তিনি ছিলেন আকাবিরে উম্মাহর সর্বজনস্বীকৃত মুখপাত্র বড়দের স্নেহভাজন, সহযাত্রীদের আস্থাভাজন এবং ছোটদের শ্রদ্ধাভাজন একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন তিনি। আরবে আজমে সমান গ্রহণযোগ্যতা ছিলো শুধু তাঁর। আমরা যদি তাঁ গ্রহণ করি চিন্তার ও কর্মের এবং পথের ও মঞ্জিলের রাহবাররূপে তাহে ফিতনা-ফাসাদের এ যুগে নিরাপদ হতে পারি সকল স্খলন ও পদস্খলন থেকে।

তালিবানে উলূমে নবুয়তকে তিনি মনে করতেন উম্মাহর আগামী দিনের সম্ভাবনা তাই তাদরে সম্পর্কে তাঁর ভাবনার অন্ত ছিলো না। তিনি বলতেন–

'তালিবানে ইলমের কর্তব্য হলো আত্মপরিচয় সম্পর্কে অবগত হওয়া, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জন করা এবং নির্ভুল পথে সাধনা ও মোজাহাদা আত্মনিয়োগ করা। তাহলেই তারা মঞ্জিলে মকছুদে উপনীত হতে পারে। পারে সময় ও সমাজের বুকে তাদের নির্ধারিত ভূমিকা পালন করতে।

কিন্তু আফসোস, আজকের তালিবানে ইলম যেন আত্মপরিচয়হীন এক জামাত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন এক কাফেলা। তারা জানে না, কী তাদের মাকছাদে হায়াত? কী তাদের বর্তমানের কর্তব্য এবং ভবিষ্যতের দায়িত্ব? তাদের ও অন্যদের মাঝে কোথা পার্থক্য? কোথায় তাদের শ্রেষ্ঠত্ব? নিজেদের শিক্ষা ও শিক্ষা-জীবন সম্পর্কে নেই কো আশ্বস্তি ও ইতমিনান, আছে শুধু হতাশা ও অস্থিরতা। ফলে সহজেই তারা বিভিন্ন ভ্রা চিন্তায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে? এমনকি একসময় তালিবে ইলমের কাফেলা থেকে ছিটকে পড়ে।'

এ বেদনাদায়ক অবস্থা হযরত আলী নাদাবীকে সারা জীবন চিন্তিত, বিচলিত ও ব্যথিত করেছে। তাই বারবার তাদের সামনে তিনি তাঁর বাণী ও বক্তব্য তুলে ধরেছেন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তাদের সচেতন করেছেন। বিজ্ঞ ও প্রা

চিকিৎসকের মত তিনি তাদের শিরায় হাত রেখে ব্যাধি চিহ্নিত করেছেন এবং চিকিৎসা দিয়েছেন।

বিভিন্ন উপলক্ষে তালিবানে ইলমের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তাঁর কয়েকটি মূল্যবান বক্তৃতা 'পা-জা সুরা-গে যিন্দেগী' নামে বেশ কয়েকবছর আগে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং বিদগ্ধ মহলে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে।

আমার 'ছাত্রজীবনের' শেষদিকে বইটি যেদিন হাতে এলো এবং পড়ার সৌভাগ্য হলো সেদিনকার অনুভূতি প্রকাশ করার সাধ্য আমার নেই। মনে হলো, দৃষ্টির সামনে চিন্তার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো। অজানা বহু রহস্য উদ্ঘাটিত হলো। আমি যেন আমার আত্মপরিচয় আবিষ্কার করলাম এবং জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য খুঁজে পেলাম। আফসোস হলো যে, এতদিন কেন এ সম্পদের সন্ধান পেলাম না! আরো আগে কেন এ পাথেয় আমার হাতে এলো না!

***

দীর্ঘ পঁচিশ বছরের শিক্ষক জীবন থেকে যে বেদনাদায়ক সত্য আমি উপলব্ধি করেছি তা এই যে, আমরা আমাদের ছাত্রদের শুধু আলফায ও শব্দের শিক্ষক, আফকার ও চিন্তার শিক্ষক নই। আমাদের সাথে তাদের সম্পর্ক শুধু দরসের ও কিতাবের। দিন-রাতের পরিসরে এবং চিন্তা-চেতনার জগতে আমাদের মাঝে কোন বন্ধন নেই। পরস্পর আমরা যেন আজনবী– অপরিচিত। এই যদি হয় অবস্থা তাহলে আমাদের শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানের ফলাফল কী? আমাদের কাওমী মাদরাসার ভবিষ্যত কী? ভবিষ্যত ফলাফল তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। আর এ চিন্তা সবসময় আমাকে যন্ত্রণাদগ্ধ করে। আমার মনে হয়, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কেউ আমরা এখন 'তালিবে ইলম' নই, যেমন ছিলেন আমাদের পূর্ববর্তীগণ। আমাদের বর্তমান অবক্ষয় ও অধঃপতনের রহস্য এখানেই নিহিত।

এ থেকে উদ্ধার পেতে হলে আমাদেরকে আবার সত্যিকার অর্থে তালিবে ইলম হতে হবে এবং তালিবে ইলমের ছিফাত ও গুণাবলী অর্জন করতে হবে। আর হৃদয়ের ব্যথা ও দরদ এবং আবেগ ও তড়প নিয়ে সেদিকেই আমাদের ডেকেছেন আল্লামা নাদাবী (রাহ) তাঁর বক্তৃতা সংকলনে। পাক-ভারত উপমহাদেশের জ্ঞানী ও অন্তর্জ্ঞানী সকলেই বলেছেন, পা-জা সুরা-গে যিন্দেগী কিতাবটি হলো তালিবানে উলূমে নবুয়াতের জীবন পথের অমূল্য পাথেয়। সুতরাং শিক্ষক ও শিক্ষার্থী আমাদের উভয়েরই কর্তব্য হবে কিতাবটিকে পাথেয়রূপে গ্রহণ করা এবং সেভাবে নিজেদের গড়ে তোলার সাধনায় আত্মনিয়োগ করা।

এ প্রেরণা থেকেই কিছুদিন আগে কিতাবটির তরজমা শুরু করেছিলাম। আল্লাহর রহমতে তরজমা শেষ হয়েছে এবং আমার সম্পাদিত 'পুষ্পে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে সর্বমহলে সমাদৃত হয়েছে। আল্লাহর শোকর, এখন তা গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ

করতে যাচ্ছে। অতীব প্রয়োজনীয় মনে হওয়ায় হযরত মাওলানার আরো দু'টি মূল্যবান বক্তৃতা পরিশিষ্টে যোগ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বক্তৃতাটি হযরত মাওলানা বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশের তালিবানে ইলমের উদ্দেশ্যেই করেছিলেন।

আমার যদ্দুর সাধ্য ছিলো, আমি শুধু ভাষার 'জাতিয়তা' এবং শব্দের 'গোত্র' পরিবর্তন করেছি। অর্থাৎ উর্দু থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছি। ভাষা ও শব্দের ভিতরের যে প্রাণ ও রূহ তা আমি কোথায় পাবো! তাই শুধু দু'আ করি, ছাহিবে কিতাবের ইখলাছ ও লিল্লাহিয়াত এবং রূহানিয়াত ও নূরানিয়াত অনুবাদেও যেন আল্লাহ্ দান করেন এবং আরো বৃদ্ধি করেন, و ما ذلك على الله بعزيز

হায়! আমি, তুমি, সে– আমরা সকলে এ পরম সত্য যদি উপলব্ধি করতে পারতাম যে, দুনিয়ার জীবন শুধু একবার, এ সুযোগ ফিরে আসে না দ্বিতীয়বার। তদুপরি তালিবে ইলমের 'ছাত্রজীবন' হলো শাহী যামানা। যা কিছু অর্জন করার, করতে হবে এখনই; অন্যথায় আফসোস করতে হবে সারা জীবন। এ সতর্কবাণী হযরত মাওলানা তাঁর প্রতিটি বক্তৃতায় বারবার উচ্চারণ করেছেন এবং তিনি বলেছেন– 'সম্ভব হলে আমি আমার দিল-কলিজা খুলে তোমাদের সামনে রেখে দিতাম যাতে বুঝতে পারো আমার দরদ-ব্যথা ও অন্তর্জ্বালা, কিন্তু তা তো সম্ভব নয়, কেননা ভাব প্রকাশের জন্য ভাষাকেই আল্লাহ মাধ্যম বানিয়েছেন।'

কিন্তু আমার হৃদয়ে তো সেই দরদ-ব্যথা নেই, সেই তড়প ও ব্যাকুলতা নেই। আমি কী করবো! আমি শুধু আল্লাহর কাছে মিনতি নিবেদন করি, আল্লাহ যেন আমাকে, আমার প্রিয় ছাত্রদেরকে এবং সমস্ত তালেবানে ইলমকে ইলমী ও আমলী যিন্দেগির সঠিক পথ ও পাথেয় গ্রহণ করার এবং মৃত্যু পর্যন্ত মাকছাদে হায়াতের উপর অবিচল থাকার তাওফীক দান করেন। আমীন।

আল্লাহর এক বান্দা যিনি আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে মুহাব্বত করেন, কিতাবটি প্রকাশ করার ব্যাপারে তাওফীক মত খিদমত করেছেন। আল্লাহ্ যেন তাকে এবং তার পরিবারের সকলকে আপন শান মোতাবেক আজর ও ছাওয়াব দান করেন। আমীন।

তালিবে ইলম
আবু তাহের মিছবাহ
মাদরাসাতুল মাদীনাহ, আশরাফাবাদ, ঢাকা

পূর্বকথা

'পা-জা সুরা-গে যিন্দেগী' এখন আমরা যে বইটি আপনার হাতে তুলে দিতে যাচ্ছি তা মূলত আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী (মুঃ যিঃ আঃ) এর একটি বক্তৃতা-সংকলন। বিভিন্ন উপলক্ষে এবং সাধারণত দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার শিক্ষাবর্ষের উদ্বোধনী মজলিসে ছাত্রদের সামনে হযরত মাওলানা এ সকল বক্তৃতা প্রদান করেছেন। প্রতিটি বক্তৃতা বড় দরদ-ব্যথার সাথে হৃদয়ের ভাষায় করা হয়েছে এবং আশা করি, উপস্থিত শ্রোতাগণ হৃদয়ের কানেই তা শ্রবণ করেছেন। সব ক'টি বক্তৃতার মূল বক্তব্য ও কেন্দ্রীয় চিন্তা ছিলো অভিন্ন। আর তা এই যে, একজন তালিবে ইলমের দৃষ্টি কী কী মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি নিবদ্ধ থাকা উচিত? এবং এই সীমাবদ্ধ পরিবেশে থেকেও নিজেদেরকে তারা কত সর্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে গড়ে তুলতে পারে এবং আল্লাহ তাদের মাঝে যে প্রতিভা ও যোগ্যতা গচ্ছিত রেখেছেন সেগুলোর উদ্ভাস ও বিকাশ ঘটিয়ে ইলম ও আমলের এবং রূহানিয়াত ও আধ্যাত্মিকতার কোন সুউচ্চ চূড়ায় তারা আরোহণ করতে পারে?

হযরত মাওলানা যে দরদ-ব্যথা নিয়ে এ বক্তৃতাগুলো প্রদান করেছেন এবং যে তড়প ও ব্যাকুলতা নিয়ে দীর্ঘ জীবনের সুগভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার সারনির্যাস তুলে ধরেছেন তা কিতাবের ছত্রে ছত্রে সুপ্রকাশিত রয়েছে। যেন কবির ভাষায়–

ہے رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو

'বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বাদকের হৃদয়ের শোণিতধারা প্রবাহিত।'

মুসলিম বিশ্বের অধঃপতন ও অবক্ষয়ের এ কঠিন সময়ে ওলামায়ে উম্মাতের কর্তব্য ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে হযরত মাওলানার সুতীব্র অনুভূতি, সেই সঙ্গে কর্তব্য পালনে তাদের ব্যর্থতার কারণে তাঁর সীমাহীন হৃদয়-যন্ত্রণা, সর্বোপরি নাদওয়াতুল উলামার ব্যাপক-বিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারার গুরুত্ব ও নাযুকতা সম্পর্কে তাঁর গভীর উপলব্ধি– সম্ভবত এগুলোই হযরত মাওলানাকে এতটা অস্থির ও বে-কারার করেছে, আর এক সুন্দর ভবিষ্যতের আশাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি তাঁর প্রিয় তালিবানে ইলমের সামনে সারা জীবনের জ্ঞান-সম্পদ ও অভিজ্ঞতা-সম্ভার পূর্ণ ইখলাছ ও আন্তরিকতার সাথে রেখে দিয়েছেন এবং ইলমী যিন্দেগীর সুদীর্ঘ সাধনা ও গবেষণার পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সেগুলোর সারনির্যাসও তাদের সামনে তুলে ধরেছেন, এ আশায় যে, হয়ত কারো হৃদয়-সমুদ্রে আলোড়ন ও তরঙ্গ-জোয়ার সৃষ্টি হবে এবং উম্মাহর আগামী দিনের রাহবার হওয়ার সাধনায় সে আত্মনিয়োগ করবে।

ইনশাআল্লাহ একটু পরেই একে একে সবক'টি বক্তৃতা আপনার নযরে আসবে এবং অধ্যয়ন করে আপনি অবশ্যই পরিতৃপ্ত হবেন। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, বক্তব্যের

আসল ভাব ও প্রভাব এবং বক্তার হৃদয়ের তাপ ও উত্তাপ কাগজের পাতা ও কালির হরফ থেকে অনুভব করা সম্ভব নয়। কেননা এর সম্পর্ক হলো বক্তা ও শ্রোতার জীবন্ত সান্নিধ্যের এবং দুই হৃদয়ের প্রত্যক্ষ সংযোগের সঙ্গে। পরে কালির আঁচড়ে কাগজে যা লেখা হয় তাতে হয়ত ছবি আসে, কিন্তু প্রাণ আসে না, বক্তব্য আসে, কিন্তু আবেদন আসে না। কিংবা যা আসে তা অতি সামান্য। তবে মুসলিম উম্মাহর অতীতের গৌরব, বর্তমানের হতাশা এবং ভবিষ্যতের প্রত্যাশার উপর যিনি তার কাব্যজগত নির্মাণ করেছেন সেই আল্লামা ইকবালের একটি কবিতা এখানে আমি উদ্ধৃত করবো। তাতে যে ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা, যে আকুতি ও মিনতি এবং যে দহন ও অন্তর্জ্বালার কথা বলা হয়েছে তা কিছুটা হলেও আমাদের হযরত মাওলানার হৃদয়-জ্বালার প্রতিনিধিত্ব করে–

شراب کہن پھر پلا ساقیا   وهي جام گردش میں لا ساقیا

'সাকী! আবার পিলাও সেই শরাব মদিরা। তপ্ত ঠোঁটের ফাঁকে আবার তুলে ধরো সেই পেয়ালা।

مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا   مری خاك جگنو بنا کر اڑا

ইশক ও প্রেমের ডানা মেলে উড়াও আমাকে। লক্ষ কোটি জোনাকি বানিয়ে আমাকে, আঁধারে দাও ছড়িয়ে।

خرد کی غلامي سے آزاد کر   جوانوں کو پیروں کا استاد کر

হৃদয়ের তরে বুদ্ধির দাসত্ব থেকে মুক্তি দাও। টগবগে তরুণদেরকে আদর্শ বানাও ঝিমিয়ে পড়া বুড়োদের।

هری شاخ ملت ترے نم سے هے   نفس اس بدن میں ترے دم سے هے

মিল্লাতের জীবন-বৃক্ষের শাখা সজীব রয়েছে তোমারই করুণায়।

تڑپنے پھڑ کنے کي توفیق دے   دل مرتضی سوز صدیق دے

তাওফীক দাও আবার উদ্দীপ্ত হওয়ার, আন্দোলিত হওয়ার। আলী মোরতাযার হৃদয় দাও, দাও ছিদ্দীকে আকবারের দহন-যন্ত্রণা।

جگر سے وهی تیر پھر پار کر   تمنا کو سینوں میں بیدار کر

সেই তীর আবার বিদ্ধ হোক এই বুকে, সেই তামান্না আবার জাগ্রত করো এই দিলে।

ترے آسمانوں کیے تاروں کی خیر   زمینوں کے شب زنده داروں کی خیر

তোমার আসমানের তারারা আবার ঝলমল করুক। যমীনে তোমার 'রাত জাগা' বান্দারা আবার ক্রন্দন করুক।

جوانوں کو سوز جگر بخش دے   مرا عشق میری نظر بخش دے

তরুণদের দান করো হে খোদা হৃদয়ের ব্যথা। দান করো আমায় প্রেমের দহন

এবং দৃষ্টির ব্যাকুলতা।'

দেখুন ইকবালের আরেকটি কবিতা –

مرے دیدہ ترکی بے خوابیاں   مرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں

আমার কিছু নেই, আছে শুধু অশ্রু-ভেজা চোখের বিনিদ্রতা, আছে হৃদয়ের কিছু সুপ্ত ব্যথা।

مرے نالہ نیم شب کا نیاز   مری خلوت و انجمن کا گداز

আমার কিছু নেই আছে শুধু নির্জন রাতের আহাজারি এবং নিরবে ও সরবে কিছু ফরিয়াদ ও রোনাযারি।

امنگیں مری آرزوئیں مری   امیدیں میری جستجوئیں مری

আমার কিছু নেই, আছে শুধু ভগ্ন হৃদয়ের কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং কিছু মিনতি ও ব্যাকুলতা।

مری فطرت آئینہ روزگار   غزالان افکار کا مرغ زار

আমার স্বভাব ও ফিতরত, সে তো যুগের দর্পণ এবং চিন্তার হরিণীদের সবুজ চারণভূমি।

مرا دل مری رزم گاہ حیات   گمانوں کے لشکر یقیں کا ثبات

আমার হৃদয়, সে তো আমার জীবন-যুদ্ধের ক্ষেত্র, যেখানে আছে বিশ্বাসের অটলতা নিয়ে প্রত্যাশার সৈনিক।

یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر   اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر

হে সাকী! এ-ই শুধু সম্পদ আমি অভাবীর। তাই শত অভাবেও নিজেকে ভাবি বাদশাহ-আমীর।

مری قافلے میں لٹا دے اسے   لٹادے ٹھکانے لگا دے اس

আমাদের প্রিয় তালিবানে উলূমে নবুয়ত, যারা এখন ইলমের বাগিচা সাজানোর এবং জ্ঞান-উদ্যানের পুষ্প-কলি ফোটানোর সাধনায় নিমগ্ন তারা হযরত মাওলানার প্রতিটি বক্তৃতার ভাব-তরঙ্গে, আবেগের উদ্বেলতায় এবং বক্তব্যের গভীরতায় অবশ্যই অনুভব করতে সক্ষম হবেন যে, কত বড় বড় আশা ও প্রত্যাশা করা হয়েছে তাদের কাছে এবং কী বিপুল ও বিশাল দায়িত্ব পালনের যোগ্য মনে করা হয়েছে তাদেরকে। হৃদয়ের বদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়ে জাগ্রত অনুভূতি নিয়ে যদি তারা এ বক্তৃতাসংকলন অধ্যয়ন করে তাহলে তাদেরও মাঝে অফুরন্ত উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে, মাদরাসার শিক্ষা জীবন থেকে কিছু অর্জন করে কর্মের অঙ্গনে প্রবেশ করার এবং দুনিয়াতে ইসলাম ও

ওলামায়ে ইসলামের নাম রৌশন করার।

মাদরাসার পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য, তালিবানে ইলমের দায়িত্ব ও কর্তব্য, তাদের কাছে বর্তমান সময় ও সমাজের দাবী ও চাহিদা, মানবসমাজে তাদের অবস্থান ও ভূমিকা, মানবতার প্রতি তাদের সেবা ও আত্মনিবেদন, তাদের সুমহান ইলমী ও দাওয়াতি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের গুরুত্ব – এই সব বিষয় যদি আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে না পারি তাহলে উলূমে নবুয়তের তালিবানদের কাছে কাওম ও মিল্লাতের কী আশা ও প্রত্যাশা এবং কী কামনা ও প্রার্থনা সেটাও আমরা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারবো না। এ প্রসঙ্গে আমরা স্বয়ং হযরত মাওলানার একটি লিখিত বক্তৃতার উদ্ধৃতি তুলে ধরাই সঙ্গত মনে করি–

'মাদরাসাকে আমি মনে করি সবচে' সুরক্ষিত ও শক্তিশালী কেন্দ্র এবং গতি ও প্রগতির উচ্ছলতায় এবং উদ্যম ও প্রাণচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। এর এক প্রান্তের সংযোগ হলো নবুয়তে মুহাম্মদীর সঙ্গে, অন্য প্রান্তের সংযোগ হলো জীবন ও জগতের সাথে। মাদরাসা একদিকে নবুয়তে মুহাম্মদীর চিরন্তন ঝরনাধারা থেকে 'জলসঞ্চয়' করে, অন্যদিকে জীবনের ফসলভূমিতে 'জলসিঞ্চন' করে। এটা দ্বীনী মাদরাসার সর্বক্ষণের দায় ও দায়িত্ব । মুহূর্তের জন্য যদি সে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা করে তাহলে জীবনের ফসলভূমি শুকিয়ে যাবে, মানুষ ও মানবতা নির্জীব হয়ে পড়বে এবং জীবন ও জগতের সব কিছুতে স্থবিরতা দেখা দেবে।

নবুয়তে মুহাম্মদীর ঝরনাধারা যেমন কখনো শুকোবে না তেমনি মানবতার পিপাসাও কখনো দূর হবে না। নবুয়তে মুহাম্মদীর কল্যাণ ও ফায়যানে যেমন কৃপণতা ও দানবিমুখতা নেই তেমনি মানবতার প্রয়োজন ও প্রার্থনারও বিরাম নেই। এদিক থেকে বারবার ধ্বনিত হয় 'আল্লাহ দেন, আমি বিতরণ করি'– এই আশ্বাস বাণী, ওদিক থেকে উচ্চারিত হয় 'দাও, আরো দাও'– চাহিদার কাতর ধ্বনি। দুনিয়াতে মাদরাসার চেয়ে কর্মচঞ্চল ও ব্যস্ত সচল প্রতিষ্ঠান আর কী হতে পারে! জীবনের সমস্যা ও প্রয়োজন অসংখ্য, জীবনের চাহিদা ও পরিবর্তন অসংখ্য, জীবনের বিচ্যুতি ও পদস্খলন অসংখ্য, জীবনের আশা ও উচ্চাশা অসংখ্য এবং জীবনের প্রতারণা ও প্রতারক অসংখ্য। মাদরাসা যখন এমন সমস্যাসংকুল ও প্রয়োজনবহুল জীবনের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেছে তখন তার অবসর যাপনের অবকাশ কোথায়?

দুনিয়াতে যে কোন মানুষ কাজ ছেড়ে আরাম করতে পারে, যে কোন প্রতিষ্ঠান অবসর যাপন করতে পারে। পৃথিবীতে সবার ছুটি ভোগ করার অধিকার আছে, কিন্তু মাদরাসার নেই কোন ছুটি। প্রতিদিন তার কর্মদিন, প্রতিমুহূর্ত তার ব্যস্ততার মুহূর্ত। দুনিয়ার যে কোন মুসাফির চাইতে পারে একটু আরাম, একটু বিশ্রাম, কিন্তু জীবনের সদা চলমান কাফেলায় মাদরাসা নামের যে মুসাফির, তার কপালে নেই কোন আরাম, তাকে চলতে হবে অবিরাম।'

যদি আমরা এই অনুভূতি ও উপলব্ধিকে হৃদয়ে ধারণ করে বক্তৃতা-গ্রন্থটি অধ্যয়ন করি তাহলে ইলমের ময়দানে কামাল ও পূর্ণতা, আখলাকের ময়দানে জামাল ও সৌন্দর্য এবং আমলের ময়দানে ইখলাছ ও লিল্লাহিয়াতের গুণ অর্জনের যে উদাত্ত আহ্বান হযরত মাওলানা তাঁর প্রতিটি বক্তৃতায় অত্যন্ত আস্থা ও বিশ্বাস এবং দুর্বার আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন তার হাকীকত ও স্বরূপ অবশ্যই আমরা উপলব্ধি করতে পারবো।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ধর্মহীনতার সর্বগ্রাসী সায়লাবের মোকাবেলায় সাধারণভাবে সকল মাদরাসার এবং বিশেষভাবে দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার তালেবানদের যিম্মাদারি ও দায়-দায়িত্ব আজ অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশী। নাদওয়ার দায়-দায়িত্ব বেশী হওয়ার কারণ এই যে, নাদওয়া তার জন্মলগ্ন থেকেই ধর্ম ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুসমন্বয় সাধন এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও সাহিত্যের অঙ্গনে প্রতিপক্ষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির ময়দানে সর্বাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে এসেছে। এবং এ আহ্বান তার মৌল চেতনা ও বুনিয়াদি উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো, বরং এটাই ছিলো নাদওয়ার অস্তিত্বের ভিত্তি।

আজ এই নাযুক সময়ে আমরা যদি কল্পনার স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করি, কিংবা সাগর তীরের নিরব দর্শক সেজে দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং রাজনীতি ও শক্তির এই পৃথিবীতে কিছুতেই আমরা যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হবো না। এ জন্য আমাদের প্রয়োজন জাগ্রত হৃদয়ের, সুদৃঢ় ঈমান ও ইয়াকীনের, উন্নত আখলাক ও চরিত্রের, ইলমী ও বুদ্ধিবৃত্তিক গভীরতার এবং নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা-সাধনা ও মেহনত-মোজাহাদার। আর এ মহাপবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য সুচারু রূপে পালন করতে পারে শুধু সেই সকল খোশনছীব ও সাহসী নওজোয়ান যাদের সিনায় রয়েছে ইলমে নবুয়তের নূর, যাদের বুকে রয়েছে সময়ের গতি বদলে দেয়ার সাহস ও হিম্মত, যাদের ধমনীতে রয়েছে জীবনের চাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ উষ্ণ রক্তের প্রবাহ, যাদের পদক্ষেপে রয়েছে অভিযাত্রীর অপরাজেয় আত্মবিশ্বাস, যাদের চোখের তারায় রয়েছে প্রতিজ্ঞা ও প্রত্যয়ের আলো এবং যাদের ললাটে জ্বল জ্বল করছে সৌভাগ্যের তারকা।

বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে বিপর্যস্ত এবং সমস্যা ও সংকটে জর্জরিত আজকের মুসলিম বিশ্বের এমন সাহসী তরুণদেরই প্রয়োজন। যদি আমাদের মাদারেসের খোশনছীব তরুণ শিক্ষার্থীরা এই বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক মহাসংগ্রামের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারে, যদি পারে ইখলাছ ও আত্মনিবেদন এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সুউচ্চ মনোবলের সঙ্গে তাদের ইলমী সফর ও জ্ঞানসাধনার সুদীর্ঘ অভিযাত্রা শুরু করতে তাহলে আজ এই সীমাবদ্ধ উপায়-উপকরণ এবং সংখ্যাল্পতা ও দুর্বল যোগ্যতা সত্ত্বেও এমন অসাধারণ গায়বী মদদ নেমে আসতে পারে এবং এমন বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং ইলমী সৌভাগ্যের এমন রাজপথ তাদের সামনে খুলে যেতে পারে, বর্তমান অবস্থায় যা কল্পনা করাও সহজ নয়।

এ গ্রন্থের ভূমিকা লেখক হিসাবে আমার সৌভাগ্য এই যে, আলোচ্য সংকলনের অধিকাংশ বক্তৃতায় উপস্থিত থাকার সুযোগ আমার হয়েছিলো। নিজের চোখে আমি দেখেছি বক্তার ভাব-উদ্দীপনা ও আবেগ-উদ্বেলতা। নিজের কানে আমি শুনেছি বক্তৃতার তরঙ্গময়তা ও শব্দের কল্লোলতা। সর্বোপরি আমি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছি বক্তব্যের মর্মগভীরতা এবং চিন্তার ব্যাপ্তি ও প্রসারতা।

আলোচ্য সংকলনের অধিকাংশ বক্তৃতা নদওয়া থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক তা'মীরে হায়াত-এ প্রকাশিত হয়েছে। আমরা এখন প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনসহ সেগুলোকে সংকলন আকারে কৃতজ্ঞচিত্তে আপনাদের সামনে পেশ করছি। সংকলনের দু'টি বক্তৃতা দারুল উলূম দেওবন্দের দু'টি ছাত্র-শিক্ষক মজলিসে পঠিত হয়েছিলো। একটি হলো 'তালিবানে ইলমের দায়িত্ব ও কর্তব্য'। এটি হযরত মাওলানার শ্রেষ্ঠ আবেদনপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী রচনারূপে পরিগণিত। দ্বিতীয়টির নাম 'আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও তার জওয়াব'। শেষ দিকে আরো দু'টি ভাষণ সংযুক্ত হয়েছে যা হযরত মাওলানা যথাক্রমে জামেয় রাহমানিয়া মোঙ্গের-এর এক ছাত্র-শিক্ষক সমাবেশে এবং জামেয়াতুল হেদায়াত জয়পুর-এর ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে প্রদান করেছিলেন। এভাবে সংকলন গ্রন্থটি মানে ও পরিমাণে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

যাই হোক, এই বিনীত ভূমিকার মাধ্যমে আলোচ্য মহামূল্যবান বক্তৃতা-সংকলনটি পা-জা সুরা-গে যিন্দেগী নামে দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামা এবং উপমহাদেশের সকল দ্বীনী মাদরাসার তালিবানের খিদমতে পেশ করা হলো। আল্লাহ করুন তারা যেন এটিকে জীবনের মূল্যবান পাথেয় ও আলোর মিনার রূপে গ্রহণ করেন এবং নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে ও পালন করতে পারেন। আল্লাহুম্মা আমীন।

মুহাম্মদ আলহাসানী
৩৭/ গোইন রোড লৌখনো
১১ই জুমাদাল আখিরাহ ১৩৯৯ হিঃ
৮ই মে ১৯৭৯ খৃঃ

মাদরাসার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১২ই মার্চ, ১৯৬৪ ইংরেজীতে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার সুপ্রশস্ত মসজিদে নতুন শিক্ষাবর্ষের উদ্বোধন উপলক্ষে হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নাদাবীর মূল্যবান ভাষণ। তাতে তিনি মাদরাসার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এ যুগের তালিবানে ইলমের করণীয় সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন।

তালিবানে ইলমের জীবন গঠনের ব্যাপারে হযরত মাওলানার অন্তরে যে দরদ-ব্যথা সর্বদা ক্রিয়াশীল তারই সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে আলোচ্য ভাষণের প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি ছন্দে। আল্লাহ্ কবুল করুন। আমীন।

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম!

আল্লাহর রহমতে আজ আমাদের নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হতে চলেছে। এ সময় আপনাদের সাথে পরিচিত হওয়া এবং নিজের জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা তুলে ধরা নিঃসন্দেহে একটি সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় কাজ। এ জন্যই আজ শিক্ষাবর্ষের উদ্বোধনী জলসায় আমি উপস্থিত হয়েছি। আপনাদের দু'টি কথা শুনবো এবং আপনাদের দু'টি কথা বলবো, এ-ই আমার ইচ্ছা।

আমার অনুভূতি এই যে, আপনাদের সঙ্গে কথা বলা যেমন সহজ তেমনি কঠিন, যেমন সরল তেমনি জটিল। সহজ ও সরল এ জন্য যে, আমার ও আপনাদের মাঝে লৌকিকতার কোন আড়াল এবং কৃত্রিমতার বেড়াজাল নেই। মনের কথা আমি মন খুলেই আপনাদের বলতে পারি। ঘরে পিতা ও পুত্রের আলোচনায়, কিংবা অন্তরঙ্গ পরিবেশে প্রিয়জনদের আলাপচারিতায় কি কোন আড়াল থাকে? দ্বিধা-সংকোচের বাধা থাকে?

থাকে না। আমার এবং আপনাদের মাঝেও নেই। সুতরাং কী প্রয়োজন দ্বিধা সংকোচের কিংবা গুরুগম্ভীর ভাষা ও শব্দ ব্যবহারের! আমি তো চিরকালের জানা-শোনা কথাই বলবো এবং আমার প্রিয়জনদের কাছে বলবো। আমি তো আমার জীবন-সফরের বিভিন্ন চড়াই-উতরাই ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরবো এবং আমার সন্তানদের কাছে তুলে ধরবো। সুতরাং খুব সহজ কথা এবং একান্ত সরল আলোচনা, যার জন্য বিশেষ চিন্তা-ভাবনার যেমন দরকার নেই তেমনি দীর্ঘ ভূমিকারও প্রয়োজন নেই।

এটা আমার ক্ষেত্রে যেমন সত্য, আপনাদের সকল আসাতেযা কেরামের ক্ষেত্রেও একই রকম সত্য। তারাও আপনাদের সঙ্গে একই ভাষায়, একই ধারায় কথা বলবেন। কেননা তাদেরও সঙ্গে আপনাদের হৃদয় ও আত্মার সম্পর্ক! এবং তাদেরও জীবন জ্ঞানে, প্রজ্ঞায় ও অভিজ্ঞতায় সুসমৃদ্ধ! কবির ভাষায়–

عمر گذری ہے اسی دشت کی سیاحی میں

'এ উপত্যকায় সফর করে করেই তো কেটেছে সারাটা জীবন।'

কিন্তু একই সঙ্গে আপনাদের সামনে কথা বলা খুবই কঠিন ও জটিল দায়িত্ব। কেননা আপনাদের মজলিসে যখন দাঁড়াই, আপনাদের সম্বোধন করে

যখন কিছু বলতে চাই তখন হৃদয় এমনই আবেগ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং কথার অথৈ সমুদ্র এমনই ঢেউ তোলে যে, কী বলে শুরু করবো, কী বলে শেষ করবো এবং কোন কথা রেখে কোন কথা বলবো বুঝে উঠতে পারি না। তাই মন চায়, জীবনের সমগ্র অভিজ্ঞতা এবং পঞ্চাশ বছরের ইলমী সফরের সম্পূর্ণ সারনির্যাস একত্রে আপনাদের হাতে সোপর্দ করি এবং আপনাদের আমানত আপনাদের হাতে তুলে দিয়ে দায়মুক্ত হয়ে যাই। কেননা মৃত্যুর ডাক কখন এসে পড়বে কেউ জানে না। মউতের পরোয়ানা কাউকে মুহ্লত দেয় না।

কিন্তু সারা জীবনের সব কথা, সারা জীবনের সব অভিজ্ঞতা এক সাথে তো বলা যায় না, ধারণ করাও যায় না। তাই সময় ও পরিবেশের আলোকে অতি সংক্ষেপে দু'চারটি কথাই শুধু এখন বলবো। যিন্দেগী যদি মুহলত দেয় তাহলে আবার আমি আপনাদের সামনে দাঁড়াবো এবং আরো অনেক কথা বলবো, ইনশাআল্লাহ। বলার মত অনেক কথাই আছে আমার হৃদয়ের ভাণ্ডারে।

***

সর্বপ্রথম আমি আপনাদের আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। বিগত বছরের তালিবানে ইলম যারা, তাদেরকে মোবারকবাদ এ জন্য যে, যুগের দুর্যোগ ও যামানার গার্দিশ মোকাবেলা করে এখনো তারা টিকে আছেন এবং ইলমের সাধনা ও মোজাহাদা অব্যাহত রেখেছেন। সর্বোপরি জীবনের সুমহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের পথে আত্মনিবেদিত রয়েছেন। পরিবেশ-পরিস্থিতির শত প্রতিকূলতা এবং সময়ের কঠিন ঝড়-ঝাপটা তাদের হিম্মতহারা করতে পারে নি। আলহামদু লিল্লাহ্!

আর ইলমে নববীর এ কাফেলায় নবাগত যারা, তাদেরকে মোবারাকবাদ এ জন্য যে, ফেতনা ফাসাদের এ ঘোর অন্ধকার যুগেও তারা ইলমে দ্বীন হাছিলের পথ গ্রহণ করেছেন এবং মাদরাসার 'কিশতিয়ে নূহ'-এ সওয়ার হয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার কী অসীম অনুগ্রহ ও করুণা যে তিনি আপনার আম্মা-আব্বাকে তাওফীক দিয়েছেন, আর দ্বীন শিক্ষার জন্য তারা আপনাকে দ্বীনী মাদরাসায় পাঠিয়েছেন। অবশ্য এমন তালিবও আছে যারা স্বেচ্ছায় আসেনি, পারিবারের চাপের মুখে এসেছে। তাদেরও আমি আদর করি, তাদেরও আমি সমাদর করি। কেননা তারাও আল্লাহর আদরের এবং সমাদরের। হাদীছ শরীফে আছে–

'এমন কিছু লোকও জান্নাতে যাবে, যাদের পায়ে থাকবে শেকল।'

অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ তা'আলার এমনই 'চাহ্তা বান্দা' ও প্রিয়পাত্র যে, স্বেচ্ছায় তারা জান্নাতের পথে আগুয়ান নয়, বরং জাহান্নামের পথে ধাবমান। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের শেকল-বাঁধা করে হলেও জাহান্নাম থেকে ফিরিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাবেন।

তদ্রূপ ইলমে দ্বীন এমনই বিরাট নেয়ামত যে, বাধ্য হয়েও যারা তা গ্রহণ করে এবং উদ্দেশ্য না বুঝেও মাদরাসার নূরানী পরিমণ্ডলে এসে পড়ে তারাও আমাদের মোবারাকবাদ লাভের যোগ্য। হয়ত না বোঝার কারণে আজ এ মহা নেয়ামতের কদর হলো না, কিন্তু আল্লাহ্ যেদিন অন্তর্চক্ষু খুলে দেবেন এবং ইলমের হাকীকত ও ফযীলত তাদের সামনে উদ্ভাসিত করবেন সেদিন চোখের পানি ফেলে ফেলে তারা মা-বাবার জন্য দু'আ করবে এবং আসাতেযা কেরামকে 'জাযাকুমুল্লাহ' বলবে।

মোটকথা, যে যেভাবেই দ্বীনী মাদরাসায় এসেছে এবং ইলমের নূরানী পরিবেশে দাখিল হয়েছে সে এবং তার মা-বাবা আমাদের হৃদয় নিংড়ানো মোবারাকবাদ লাভের যোগ্য।

***

এখন প্রশ্ন হলো, এখানে ইলমের ময়দানে কী আপনারা পাবেন? কোন মহাসম্পদের অধিকারী হবেন?

এটা অবশ্য বিশদ আলোচনা ও ব্যাপক আলোকপাতের বিষয়, যার সময় ও সুযোগ এখন নেই। যুগশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক পুরুষ হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (রহ) বিরচিত ইহয়াউল উলূম হচ্ছে এ বিষয়ের সর্বোত্তম গ্রন্থ। সময়-সুযোগ করে উস্তাদের তত্ত্বাবধানে এর নির্বাচিত অংশ পড়ুন। সেখানে আপনার প্রশ্নের সন্তোষজনক সমাধান রয়েছে। একটি দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার শিক্ষার্থীকে কী অমূল্য সম্পদ দান করে এবং সে কোন্ মহাসৌভাগ্যের অধিকারী হয়, অবশ্যই আপনি তা বুঝতে পারবেন।

আল্লাহর কালামের নেয়ামত

একটু আগে ক্বারী সাহেবের মুখে আল্লাহর কালামের তেলাওয়াত শ্রবণকালে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সমগ্র সত্তা এ ভাব ও ভাবনায় তন্ময় ছিলো যে, আমাকে ও মানব জাতিকে যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং বিশ্বজগতের যিনি স্রষ্টা তাঁর কালাম এক তুচ্ছ মানুষ তেলাওয়াত করছে আর আমি এক তুচ্ছতম মানুষ তা শ্রবণ করছি!

সুবহানাল্লাহ! আমার আপনার মত গান্দা ইনসানের কী যোগ্যতা আছে যে 'পবিত্র স্রষ্টার পবিত্র বাণী' উচ্চারণ করতে পারি, শ্রবণ করতে পারি এবং হৃদয়ঙ্গম করতে পারি!

আমার আল্লাহ আমাকে সম্বোধন করে কালাম করছেন, আর আমি তা শ্রবণ করছি এবং অনুভব করছি! মাটির মানুষের জন্য এ কোন্ আসমানী মর্যাদা ও সৌভাগ্য! তুচ্ছ মানুষ এ অত্যুচ্চ নেয়ামত লাভ করে কেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় না? আল্লাহর কালাম বুঝতে পারা তো এমন নেয়ামত যে, মানুষ যদি খুশিতে মাতোয়ারা এবং আনন্দে আত্মহারা হয়, আর লায়লার প্রেমে পাগল মজনুর মত দেওয়ানা হয়ে যায় তাহলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা কী বলবো! আমাদের না আছে সে হৃদয়, না আছে সেই অনুভূতি।

ছাহাবী হযরত উবাঈ ইবনে কা'অবের ঘটনা কি ভুলে গেছেন? ইতিহাসের পাতায় আবার নযর বুলিয়ে দেখুন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন–

'আল্লাহ তোমার নাম নিয়ে আমাকে বলেছেন যে, তাকে দিয়ে আমার কালাম পড়িয়ে শুনুন।'

এ খোশখবর শুনে তিনি এমনই আত্মহারা হলেন যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনেই খুশিতে চিৎকার করে বলে উঠলেন–

أو سماني ربي ؟!

সত্যি আমার আল্লাহ আমার নাম নিয়েছেন! সত্যি আমার আল্লাহ উবাঈ বিন কা'অব বলে আমায় ডেকেছেন!

সুবহানাল্লাহ! ইশকে ইলাহী ও ইশকে নবীর কেমন দিওয়ানা ছিলেন তাঁরা! এর হাজার ভাগের একভাগও কি আছে আমাদের কলবে, আমাদের অনুভবে?

আমার প্রিয় তালেবানে ইলম!

দ্বীনী মাদারেসে এসে আর কিছু যদি ভাগ্যে নাও জোটে, জীবনের সমস্ত সময় ও সম্পদ ব্যয় করে শুধু এই একটি নেয়ামত যদি নছীব হয়, যদি আল্লাহর কালামের 'সম্বোধনপাত্র' হওয়ার এবং তা বোঝার উপযুক্ত হয়ে যেতে পারি তাহলে বিশ্বাস করুন, দুনিয়ার সব সাজসজ্জা, আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ। এ 'নেয়ামত-মহান' যদি দান করেন আল্লাহ মেহেরবান, তাহলে জীবনের সবকিছু তাঁর জন্য কোরবান! তাহলে আপনার সাধনা ও

অধ্যবসায় সফল, আপনার মা-বাবার ত্যাগ ও আত্মত্যাগ সার্থক । আপনি ধন্য, আপনার পরিবার ধন্য।

***

প্রিয় বন্ধুগণ! এ কথা ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করুন যে, এখানে আপনারা কী জন্য এসেছেন? কোন্ প্রাপ্তির আশায় জড়ো হয়েছেন? শিক্ষা জীবনের শুরুতেই নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে হৃদয়ে বদ্ধমূল করুন এবং চিন্তা ও চেতনাকে জাগ্রত করুন।

এই দ্বীনী মাদরাসায় তোমরা স্বেচ্ছায় এসেছো না অনিচ্ছায় সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা এই যে, তোমাদের মাঝে এবং তোমাদের খালিক ও স্রষ্টার মাঝে রয়েছে এক 'স্বর্ণ-শৃঙ্খল', যার এক প্রান্ত তোমাদের হাতে, অন্য প্রান্ত আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের কুদরতি কবযায়। অর্থাৎ তোমাদের মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে এমন এক নূরানী রিশতা কায়েম হয়েছে যার বদৌলতে তোমরা তাঁর পাক কালাম বুঝতে এবং হৃদয়ঙ্গম করতে পারো, এমনকি আল্লাহর সঙ্গে কালাম করার তরীকাও জানতে পারো।

***

সবার আগে আমাদের জানতে হবে যে, মাদরাসার পরিচয় কী এবং তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী? কোন মাদরাসার এ পরিচয় আমি মেনে নিতে রাজী নই যে, এখানে আরবী ভাষা শেখানো হয়, যাতে আরবী কিতাব পড়া যায় কিংবা দুনিয়ার কোন ফায়দা হাসিল করা যায়। এটা কোন দ্বীনী মাদরাসার পরিচয় হতে পারে না। মাদরাসা তো সেই পবিত্র স্থান যেখানে – আগেও আমি বলেছি – তালিবে ইলমের মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে একটি প্রত্যক্ষ ও সুদৃঢ় সংযোগসূত্র সৃষ্টি হয়, যার একপ্রান্ত এদিকে, অন্য প্রান্ত স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কুদরতি হাতে।

আমাদের করণীয়

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম! ভালো করে বুঝে নাও যে, এ মহান নেয়ামতের উপযুক্ত হতে হলে কী কী গুণ অর্জন করা এবং ন্যূনতম কোন্ কোন্ চাহিদা পূরণ করা দরকার?

প্রথমত নিজের মাঝে শোকর ও কৃতজ্ঞতার অনুভূতি সৃষ্টি করো। নির্জনে আত্মসমাহিত হয়ে চিন্তা করো যে, আল্লাহ তোমাকে নবীওয়ালা পথে এনেছেন। এখন তুমি যদি আগের অন্ধকারে ফিরে যাও কিংবা এখানে থেকেও আলো

গ্রহণে ব্যর্থ হও তাহলে এ তোমার দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলো?

এ পথে তুমি প্রিয় নবীর পুণ্য পদচিহ্ন দেখতে পাবে এবং ইলমে নবুওয়তের আলো ও নূরের অধিকারী হবে। সবচে' বড় কথা, এ পথে তুমি তোমার আল্লাহর রিযা ও সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হবে।

দ্বিতীয়ত নিজেকে যথাসাধ্য মাদরাসার পরিবেশ মতে গড়ে তোলার চেষ্টা করো। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের নিজস্ব কিছু চাহিদা আছে এবং প্রতিটি পথের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সফলতা লাভের জন্য সেই চাহিদা পূরণ করা এবং সেই বৈশিষ্ট্য অর্জন করা অপরিহার্য। মাদরাসায় এসেও যারা মাহরূম হয় তারা এজন্যই মাহরূম হয়। মাদরাসার পরিবেশ থেকে তারা কিছু গ্রহণ করে না, বরং পরিবেশকে দূষিত করে।

তুমি যে দ্বীন শিখতে এসেছো, এ পথের দাবী ও চাহিদা এই যে, ফরয ও ওয়াজিব আমলগুলো পাবন্দির সাথে আদায় করবে। নামাযের প্রতি ভালোবাসা ও যত্ন পোষণ করবে। জামাতের বেশ আগে মসজিদে এসে নামাযের ইনতিযার করবে। যিকির ও নফল ইবাদাতের শওক এবং আল্লাহর কাছে চাওয়ার ও দু'আ মুনাজাতের যাওক পয়দা করবে।

তৃতীয়ত আখলাক ও চরিত্রকে ইলমের স্বভাব অনুযায়ী গড়ে তোলার চেষ্টা করো। ইলমের স্বভাব হলো ছবর ও ধৈর্য, বিনয় ও আত্মবিলোপ, যুহদ ও নির্মোহতা এবং গিনা ও আল্লাহ-নির্ভরতা। সুতরাং এই ভাব ও স্বভাব যত বেশী পারো নিজের মাঝে অর্জন করো। হিংসা ও হাসাদ, অহংকার ও ক্রোধ, কৃপণতা ও সংকীর্ণতা ইত্যাদি হলো ইলমের বিরোধী স্বভাব। সুতরাং এগুলো সম্পূর্ণরূপে পরিহার করো।

চতুর্থত তোমার চাল-চলন ও আচার-আচরণ সুন্নতের পূর্ণ অনুগত করো। এ পথের ইমাম ও রাহবার যারা তাঁদেরই মত যেন হয় তোমার বাহ্যিক বেশভূষা।

এসকল দাবী ও চাহিদা পূরণ করে দেখো দুনিয়া ও আখেরাতে তোমার মাকাম ও মর্যাদা কোথায় নির্ধারিত হয়! আল্লাহর কসম, তোমাদের সম্পর্কে আমার এ আশংকা নেই যে, দ্বীনী মাদরাসা থেকে ফারিগ হয়ে তোমরা অভাব ও দারিদ্র্যের শিকার হবে। আমার ভয় ও আশংকা বরং এই যে, আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের বে-কদরীর কারণে বিমুখতা ও বঞ্চনার আযাব না এসে পড়ে!

পক্ষান্তরে তোমরা যদি এ নেয়ামতের যথাযোগ্য কদর করো এবং পূর্ণ শোকর আদায় করো তাহলে প্রতিদান রূপে তোমাদের যোগ্যতা ও প্রাপ্তি বহুগুণ

বেড়ে যাবে। দেখো আল্লাহ কত মযবুত ভাবে বলছেন–

لئن شكرتم لأزيدنكم و لئن كفرتم إن عذابي لشديد *

যদি তোমরা শোকর করো তাহলে অবশ্যই আমি বাড়িয়ে দেবো, আর যদি কৃতঘ্ন হও তাহলে মনে রেখো, আমার আযাব অতি কঠিন।

আর শোনো, তোমার মাঝে এবং সবার মাঝে আল্লাহ রেখে দিয়েছেন কিছু সুপ্ত প্রতিভা ও ঘুমন্ত যোগ্যতা। ত্যাগ ও আত্মত্যাগ এবং নিরবচ্ছিন্ন সাধনার মাধ্যমে তুমি যদি সেই আত্মপ্রতিভার স্ফূরণ না ঘটাও এবং ইলমী যোগ্যতায় পরিপক্কতা অর্জনে সচেষ্ট না হও তাহলে তুমি কোন 'পদার্থ' বলেই গণ্য হবে না এবং দুনিয়ার কোথাও তোমার কোন সমাদর হবে না। তুমি কোন কাজেরই হবে না।

***

অবশেষে আবার আমি পরিষ্কার ভাষায় তোমাদের বলতে চাই যে, শিক্ষা জীবনের শুরুতেই নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝে নাও এবং নিজেদের মাকাম ও মর্যাদা চিনে নাও। ইলমের সাধনায় আত্মনিমগ্নতা এবং প্রতিভা ও যোগ্যতার বিকাশ সাধনে ঐকান্তিকতা– এই যেন হয় তোমার একমাত্র পরিচয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই যেন হয় তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য। এছাড়া অন্যদিকে চোখ তুলেও তাকিয়ো না। অন্যকিছুতে মন দিয়ে বঞ্চিত হয়ো না। জীবন-কাফেলার বৃদ্ধ মুসাফিরের এ উপদেশ যদি গ্রহণ করো, ইনশাআল্লাহ দুনিয়াতেও সফল হবে, সৌভাগ্য তোমাদের পদচুম্বন করবে। এরপর আল্লাহ রাব্বুল ইয্‌যতের দরবারে যখন হাযির হবে তখন তোমাদের চেহারা নূরে-ঝলমল হবে। আল্লাহ তোমাদের কামিয়াব করুন। আমীন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

সম্পর্ক, সাধনা ও আল্লাহ্-প্রেম

১৩৮৫ হিজরীতে দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার বিদায়ী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে হ্যরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নাদাবী (রহঃ) প্রদত্ত মূল্যবান ভাষণ। একজন তালিবে ইলম তার তলবে ইলমের সাধনায় কীভাবে, কোন্ পথে সফলতা লাভ করতে পারে সে সম্পর্কে তিনি তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে কয়েকটি উপদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম!

আমাদের প্রাচ্য সংস্কৃতির বহু যুগের প্রচলিত রীতি এই যে, আপন ও প্রিয়জনদের ছেড়ে মানুষ যখন দূরের সফরে যায় তখন যাত্রার প্রাক্কালে সে খান্দানের বা সমাজের কোন মুরুব্বী ব্যক্তি – যিনি বয়সে, জ্ঞানে, প্রজ্ঞায় ও অভিজ্ঞতায় বড় – তাঁর কাছে গিয়ে বসে এবং কিছু অছিয়ত-নছীহত ও আদেশ-উপদেশ গ্রহণ করে এবং জীবন ও জগত থেকে যে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছেন সে আলোকে কিছু দিকনির্দেশ লাভ করে, যেন সফরে ও প্রবাস জীবনে তা থেকে সে উপকৃত হতে পারে।

সুতরাং প্রাচ্য-সংস্কৃতির সন্তান হিসাবে আজ বিদায় কালে, জীবন-সফরের নবঅধ্যায়ের সূচনা-লগ্নে আপনাদের অন্তরে আমার কাছ থেকে কিছু উপদেশ ও দিকনির্দেশ লাভের এ আকাঙ্ক্ষা ও আকুতি খুবই স্বাভাবিক এবং প্রশংসার যোগ্য।

আমি বা অন্য কেউ এ উপলক্ষে যদি কিছু আদেশ-উপদেশ ও দিকনির্দেশ দান করেন, যা গ্রহণ ও পালন করে আপনারা কামিয়াবির মঞ্জিলের দিকে আগুয়ান হতে পারেন এবং আগামী জীবনের কর্ম ও কর্মপন্থা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তা থেকে আলোক গ্রহণ করতে পারেন, তাহলে আমি বলবো, এ আদেশ, উপদেশ ও দিকনির্দেশ প্রদান করা হবে খুবই সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত। এটা সময়েরই দাবী এবং প্রবীণদের উপর নবীনদের চিরন্তন অধিকার।

কিন্তু আমার প্রিয় তালিবানে ইলম! এত অল্প সময়ে এবং এমন ব্যথিত হৃদয়ে আমি ভেবে পাই না যে, কী বলবো? কী ভাবে বলবো? এবং কোন্ বিষয়ে কোন্ উপায়ে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো?

তবু দায়িত্বের তাগিদে এবং হৃদয়ের সান্ত্বনা হিসাবে সংক্ষেপে দু'টি কথা বলি। যদিও এটা হবে বিসমিল্লাহির রহমানির-রাহীম-এর স্থলে ৭৮৬ লেখার মত। এ সংখ্যা কি বিসমিল্লাহর বিকল্প হতে পারে? এবং বিসমিল্লাহর অশেষ বরকত কি ৭৮৬ লিখে হাছিল হতে পারে? পারে না। তারপরও যদি শুনতে চান

তাহলে খুব সংক্ষেপে তিনটি কথা আমি আপনাদের বলতে পারি। হৃদয়ের মণিকোঠায় তা মুদ্রিত করে নিন এবং দিল-দিমাগের আমানাতখানায় তা হিফাযত করে রাখুন।

আমি মনে করি, এ ক্ষেত্রে আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরাই ভালো হবে এবং আমিও আস্থা ও নির্ভরতার সাথে বলতে পারবো, কেননা জীবনের অভিজ্ঞতায় ভুল-বিচ্যুতি ও দ্বিধা-সন্দেহের খুব কম সম্ভাবনা থাকে। তাই আমি আমার জীবন থেকে লব্ধ কিছু অভিজ্ঞতাই আপনাদের সামনে পেশ করবো।

তা'আল্লুক ও সম্পর্ক

আল্লাহর রহমতে আমার জীবনের যা কিছু অর্জন ও প্রাপ্তি তার জন্য প্রথম উপাদান হলো উসতাদের সঙ্গে আমার সব সময়ের গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক। নিয়ম ও সৌজন্য রক্ষার সাধারণ সম্পর্ক নয়, বরং হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক এবং আত্মার সঙ্গে আত্মার বন্ধন। এ সম্পর্ক ছিলো দিন-রাতের এবং সকাল-সন্ধ্যার। এ বন্ধন ছিলো চিন্তা ও চেতনার এবং ভাব ও ভাবনার। সম্পর্কের ও বন্ধনের এ গভীরতা ও নিবিড়তা আমি যেমন অনুভব করতাম আমার মুখলিছ আসাতিযা কেরামও তেমনি অনুভব করতেন।

এটাই হলো আমার ইলমী ও আমলী যিন্দেগীর উন্মেষ ও বিকাশের প্রথম মৌলিক উপাদান, যা আমার জীবনের চলার পথে অশেষ কল্যাণ বয়ে এনেছে। আল্লাহর রহমতে যা কিছু আমি পেয়েছি; যা কিছু আমি দেখেছি, শুনেছি এবং শিখেছি তা এই সম্পর্কেরই অবদান। আর সৌভাগ্যক্রমে আমার শিক্ষা-দীক্ষার আয়োজন ও ব্যবস্থাই ছিলো এমন যাতে শিক্ষকের সংখ্যা ছিলো অল্প। ফলে তাঁদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখা, এবং তাঁদের প্রতি আত্মনিবেদিত হওয়া এবং তাঁদের মূল্যায়ন ও কদর করা আমার জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ ছিলো।

একজন তালিবে ইলমের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য একান্ত অপরিহার্য হলো মাহির ও প্রাজ্ঞ উসতাদের ছোহবত ও সান্নিধ্য গ্রহণ করা। যে ফন ও শাস্ত্রের প্রতি শিক্ষার্থীর সহজাত অনুরাগ ও মায়লান রয়েছে, তার কর্তব্য হলো সেই ফন ও শাস্ত্রের মাহির ও বিশেষজ্ঞ উসতাদের ছোহবতে পড়ে থেকে যোগ্যতা অনুযায়ী তা আত্মস্থ করার সাধনায় লেগে থাকা। উসতাদের সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ সংযোগ ছাড়া কখনই কাঙ্ক্ষিত ফায়দা হাসিল হতে পারে না।

আপনি যদি সাহিত্যিক হতে চান তাহলে এমন কাউকে আদর্শ রূপে গ্রহণ

ও অনুসরণ করুন যার সাহিত্য আপনার জন্য অধিক কল্যাণপ্রসূ। তদ্রূপ যদি হাদীছ-তাফসীর কিংবা অন্য কোন শাস্ত্রের প্রতি আপনার মায়লান থাকে তাহলে সেই শাস্ত্রের প্রাজ্ঞ ব্যক্তির নিকট-সান্নিধ্য গ্রহণ করুন।

***

এখন আমি আপনাদের সামনে এমন কিছু কথা তুলে ধরবো যার আলোকে আপনারা জ্ঞান-সাধনা ও কর্ম-সাধনার সুদীর্ঘ জীবন-সফর সুন্দর ভাবে শুরু করতে পারেন।

সর্বপ্রথম কথা এই যে, জীবনের জন্য এবং হৃদয় ও আত্মার জন্য একজন রাহবার ও পথপ্রদর্শক গ্রহণ করুন। কেননা মোম থেকে মোম আলো গ্রহণ করে এবং প্রদীপ থেকে প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়, এটাই হলো চিরন্তন সত্য। এ জন্য একান্ত কর্তব্য হলো, আল্লাহর যমীনে, যে কোন স্থানে আল্লাহর কোন মুখলিছ বান্দাকে আপনি যদি খুঁজে পান – এবং আপনাকে পেতেই হবে – তাহলে তাঁকে, আল্লাহর সেই নেক বান্দাকে আপনার রাহনুমা ও পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করুন এবং তাঁর নির্দেশিত পথে জীবন গঠন শুরু করুন। অবশ্য নির্বাচনের পূর্ণ স্বাধীনতা আপনার রয়েছে। নির্ধারিত শর্তের আলোকে যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করুন এবং যেখানে ইচ্ছা গমন করুন। দুনিয়ার যেখানেই তিনি থাকুন, খুঁজে খুঁজে তার দুয়ারে গিয়ে হাজির হোন। আমি তো এতদূর বলতে চাই যে, জীবিতদের মাঝে না পেলে বিগতদের মাঝে তাঁর খোঁজ করুন। মোটকথা, মাটির উপরে কিংবা মাটির নীচে যেখানেই আল্লাহর সেই বান্দার সন্ধান পাবেন তাঁর করতলে নিজেকে অর্পণ করুন, এবং তাঁর পদতলে নিজেকে উৎসর্গ করুন। একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তাঁর জীবন ও চরিত্রের এবং চিন্তা ও কর্মের সবকিছু নিজের দেহ-সত্তায় এবং হৃদয় ও আত্মায় পূর্ণ রূপে ধারণ করুন। অন্তত সাধ্যমত চেষ্টা করুন।

মানুষের সহজাত প্রবণতা এই যে, যাকে সে ভালোবাসে তাকে সে আদর্শ রূপে অনুকরণ করে, এমনকি নিজেকে তার প্রতিচ্ছবি রূপে গড়ে তোলার সাধনা করে। চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে এবং হৃদয় ও আত্মার জগতে আপনিও তাই করুন। আমলে, আখলাকে, চিন্তায় ও বিশ্বাসে পদে পদে প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁকে অনুকরণ করুন এবং নিজের ভিতরে তাঁর পূর্ণ ছবি গ্রহণ করুন।

এটা যদি করেন তাহলেই আপনি বড় হতে পারেন, এমনকি তাঁকে ছাড়িয়ে বহু উর্ধ্বে উঠে যেতে পারেন। সেই সর্বোচ্চ শিখরেও আপনার উত্তরণ হতে পারে যেখানে সম্পর্কের প্রয়োজন এবং অনুসরণের দায়বদ্ধতা আর থাকে না।

মানুষ নিজেই যেখানে আলো হয়ে আলো ছড়ায় বাতির প্রয়োজন বোধ করে না। অবশ্য খুব কম মানুষের ক্ষেত্রেই এমন হয়ে থাকে।

চেষ্টা ও সাধনা

দ্বিতীয় যে কথাটি আমি আপনাকে বলতে চাই তা এই যে, ইতিহাসের যে কোন বরণীয় ব্যক্তির জীবন-চরিত পাঠ করুন এবং তাঁর সফলতা ও কামিয়াবির নিগূঢ় রহস্য জানার চেষ্টা করুন, আপনার নিজেরই এ স্বতঃস্ফূর্ত উপলব্ধি হবে যে, তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের বিনির্মাণ ও শোভা-সৌন্দর্যের পিছনে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক উপাদান ছিলো – অন্য কিছু নয় – তাঁর নিজস্ব চেষ্টা-সাধনা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁর ঐকান্তিকতা ও একাগ্রতা। এ অমূল্য সম্পদ যদি তোমার না থাকে তাহলে সুবিজ্ঞ ও সুপ্রাজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী তোমাকে গড়ে তোলার যত চেষ্টাই করুন এবং স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তোমার উন্নতির জন্য যত উদ্যোগ আয়োজনই গ্রহণ করুক, ব্যর্থতা ও দুর্ভাগ্যের পাঁকে আটকা পড়া তোমার জীবনের চাকা সচল করে তোলা কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না।

যিনিই গড়ে উঠেছেন এবং আপন কীর্তি ও কর্মে প্রোজ্জ্বল হয়েছেন, নিজের চেষ্টা-সাধনা ও পরিশ্রমের বিরাট বিনিয়োগের মাধ্যমেই হয়েছেন। অলস, কর্মবিমুখ ও নিশ্চেষ্ট মানুষের জন্য সাধনার এই পৃথিবীতে কোন স্থান নেই।

নিঃসন্দেহে আল্লাহর তাওফীক ও মদদই হলো সফলতার প্রথম শর্ত, কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ তো তাদেরই জন্য যারা মেহনতের পর দু'আ করে।

তদ্রূপ সামনে চলার পাথেয়রূপে আসাতেযা কেরামের পথনির্দেশও অপরিহার্য, কিন্তু বারুদ ছাড়া বন্দুক যেমন বেকার তেমনি তোমার চেষ্টা সাধনা ছাড়া সবই নিষ্ফল।

আল্লাহর তাওফীক যদি শামিলে হাল হয় তাহলে নিজের চেষ্টা সাধনা দ্বারা মানুষ যা ইচ্ছা তাই হতে পারে, যা ইচ্ছা তাই করতে পারে।

আল্লাহ-প্রেম

তৃতীয় ও শেষ যে কথাটি আমি বলতে চাই তা এই যে, মানুষের কর্তব্য হলো, যে উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সে সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকা। তোমার জীবন গঠনে এবং জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে প্রকৃতপক্ষে যা কাজে আসবে তা হলো আখেরাতের চিন্তা এবং আল্লাহর রিযা ও সন্তুষ্টি লাভের

জাযবা ও ব্যাকুলতা। বলাবাহুল্য যে, আল্লাহর প্রতি প্রেম ও আত্মনিবেদনের প্রাণ ও রূহ যদি মানুষের ভিতরে না থাকে তাহলে মানুষ যত বড় লেখক,সাহিত্যিক ও বাগ্মী হোক না কেন, যত বড় মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিছ ও ফকীহ হোক না কেন, এই মহাসম্পদ থেকে সে মাহরূমই থেকে যাবে।

হতে পারে কিছু দিনের জন্য বিমুগ্ধ মানুষের করতালি ও বাহবা সে পেলো এবং কিছু স্তুতি ও সুখ্যাতি ভোগ করলো। কিন্তু এর বেশী কিছু প্রাপ্তি তার কিসমতে নেই। হাকীকতে যে জিনিস তোমার কাজে আসবে তা হলো আল্লাহর ভয়, আখেরাতের চিন্তা এবং আল্লাহর রিযা ও সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা।

মাওলানা ফযলুর-রহমান গাঞ্জে মুরাদাবাদী (রহঃ) এক তালিবে ইলমকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী পড়ো? সে বললো, (তর্কশাস্ত্রের কিতাব) কাযী মোবারাক পড়ি।

হযরত মুরাদাবাদী বললেন–

আসতাগফিরুল্লাহ! এসব পড়ে কী লাভ? ধরো, মানতিক পড়ে তুমি কাযী মোবারাকের মতই মানতেকী হয়ে গেলে, কিন্তু তার পর কী হবে? কাযী মোবারাকের কবর খুলে দেখো, কী তাঁর অবস্থা! আর এমন কোন কবরের সামনে দাঁড়িয়ে দেখো যার ইলম তেমন ছিলো না, কিন্তু আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের দৌলত ছিলো, দেখো সেখানে আনওয়ার ও বারাকাতের কেমন ফায়যান ও উচ্ছলতা!

মেনে নিলাম যে, তুমি বড় মাপের লেখক সাহিত্যিক হয়ে গেলে (যদিও আমি সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্য-কুশলতার জোরদার সমর্থক এবং দাওয়াতের ময়দানে সাহিত্য থেকে আমি নিজেও বিরাট সেবা গ্রহণ করেছি।)

কিন্তু তোমার সাহিত্য-প্রতিভা তখনই সার্থক হবে যখন উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর রিযা ও সন্তুষ্টি। অন্যথায় তা হবে নফসের বাহন এবং বরবাদীর কারণ।

সুতরাং প্রিয় বন্ধুগণ! আল্লাহর রিযা ও সন্তুষ্টিকেই সবার আগে রাখো এবং এটাকেই মাকছাদে হায়াত রূপে গ্রহণ করো।

ইখলাছ, আত্মত্যাগ ও আত্মযোগ্যতা

২৫ ডিসেম্বর ১৯৬৩ ইংরেজি। দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার শিক্ষা সমাপনকারী তালিবানের বিদায়ী অনুষ্ঠান। হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী (রহ) বিদায়ী তালিবানের উদ্দেশ্যে এ ভাষণ প্রদান করেন। তাতে তিনি ঐসকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন যা ছাড়া তাদের জীবনের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না।

এ মূল্যবান ভাষণে রয়েছে এমন কিছু দিকনির্দেশনা যা তালিবে ইলমের ইলমী জীবনের জন্য আলোকবর্তিকা হতে পারে, হতে পারে অমূল্য পাথেয়।।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি ছাড়া কোন সহায় নেই। এবং দুরূদ ও সালাম তাঁর হাবীবের প্রতি, সারা জাহানের জন্য যিনি করুণা ও রহমত, যার আনুগত্যই হলো মুক্তির একমাত্র পথ।

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম!

এখন বিদায়ের সময় এবং সবাই দুঃখ ভারাক্রান্ত। এটাই স্বাভাবিক। কেননা বিদায় আনন্দ-বেদনার মিশ্র অনুভূতিরই মুহূর্ত। আনন্দ হলো সামনের সম্ভাবনাময় কর্মজীবনের জন্য এবং বেদনা হলো বর্তমানের প্রিয়জনদের বিচ্ছেদের জন্য। কিন্তু বিদায় তো সময়েরই অনিবার্য প্রয়োজন! সারা জীবন তো শুধু বিদায়েরই আয়োজন। বারবার ক্ষণিকের বিদায়, তারপর একবার চিরকালের বিদায়। সুতরাং বিদায়কে অনিবার্য সত্যরূপে বরণ করে নেয়াই হলো বুদ্ধিমানের কাজ।

যে মা সন্তানকে শুধু বুকে আগলে রাখেন, আঁচলে ঢেকে রাখেন। কখনো চোখের আড়াল করতে রাজী নন, তাকে যতই মমতাময়ী বলুন– তিনি আদর্শ মা নন। তার সন্তান কখনো বড় হতে পারে না। জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে পারে না এবং জগতের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। কেননা সে তো মায়ের নিরাপদ আঁচলেই লুকিয়ে ছিলো, জগতের বাস্তবতা এবং সময়ের তিক্ততা থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তো সে পায়নি।

মায়ের স্নেহ-মমতায় প্রতিপালিত হওয়ার জন্য রয়েছে একটা নির্ধারিত সময়। ততক্ষণ মা তাকে আঁচলের ছায়া দিয়ে, বুকের উত্তাপ দিয়ে পরম মমতায় লালন পালন করে থাকেন। তারপর সেই মমতাময়ী মা-ই বুকের মানিককে বুক থেকে আলগ করে দেন এবং শিক্ষার জন্য, দীক্ষার জন্য চোখের আড়ালে দূরে বহু দূরে পাঠিয়ে দেন। যাতে সন্তান তার বড় হয়, জ্ঞানী হয়, গুণী হয় এবং মানুষ হয়। তাহলেই না এ সন্তান বার্ধক্যে তার চোখের আলো হবে, বুকের বল হবে এবং মৃত্যু পর্যন্ত তার সকল দুঃসময়ের সহায় হবে।

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম!

আপনার জ্ঞান-সত্তার জন্য মাদরাসাও তেমনি এক মমতাময়ী মা। মাদরাসার প্রশান্ত, পবিত্র ও জ্ঞানগম্ভীর পরিবেশে আপনার জীবনের দীর্ঘ সময়

কেটেছে। সুতরাং এর প্রতিটি ইট-পাথরের সাথে এবং এখানকার প্রত্যেক মানুষের সাথে ভালোবাসার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। এটা মানব স্বভাবের স্বঃতস্ফূর্ত চাহিদা। সকল সৃষ্টির মাঝেই আল্লাহ ভালোবাসা ও অন্তরঙ্গতার গুণ রেখেছেন। তবে মানুষের মাঝে এ গুণের প্রকাশ আরো গভীর ও নিবিড়।

শুধু ভাষা বিজ্ঞানই নয়, বরং মনোবিজ্ঞানেরও বড় বড় বিশারদ বলে থাকেন যে, স্বয়ং 'ইনসান' শব্দের ধাতুগত অর্থও হচ্ছে ভাব ও ভালোবাসা এবং অনুরাগ ও অন্তরঙ্গতা।

যাই হোক, এদিক থেকে তো এখন আমাদের অন্তরে যথেষ্ট বেদনা ও যন্ত্রণা আছে যে, আমাদের মাঝে আজ বিদায়ের ও বিচ্ছেদের ডাক এসেছে। দীর্ঘদিনের একত্র জীবনের ইতি হতে চলেছে। কত কথা, কত স্মৃতি মনের মণিকোঠায় জমা হয়ে আছে। অথচ কঠিন সত্য এই যে, হয়ত অনেক দিন, কিংবা কোনদিন আমাদের আর দেখা হবে না। কিন্তু অন্য দিক থেকে আমরা অশেষ আনন্দিত যে, আপনারা সুষ্ঠু সুন্দর ভাবে আপনাদের শিক্ষাকাল পূর্ণ করেছেন। এমন এক নাযুক ও সঙ্গিন সময়ে আপনারা দ্বীনের ইলম হাছিল করেছেন যখন পরিবেশ সম্পূর্ণ বৈরী। সমাজ থেকে স্বস্তি ও স্থিতি যখন অপসৃত এবং ঘাত-প্রতিঘাতে সবাই যখন বিপর্যস্ত। তারপরো আপনারা টিকে ছিলেন এবং শিক্ষাজীবনের নির্ধারিত পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন। এ জন্য আপনারা অবশ্যই আন্তরিক অভিনন্দন লাভের যোগ্য।

শিক্ষার সমাপ্তি নেই

এ ক্ষেত্রে 'শিক্ষা-সমাপ্তি' পরিভাষার বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু এর অর্থ ও মর্ম অনুধাবনে অনেকেই ভুল করে থাকেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই একটি শিক্ষাকাল নির্ধারণ করতে হবে এবং শিক্ষার্থীকেও তা সমাপ্ত করতে হবে। কিন্তু এখানে আমরা যে মহাগুরুত্বপূর্ণ কথাটি আপনাকে বলতে চাই তা এই যে, শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন কখনো 'সমাপ্ত' হতে পারে না এবং তালিবে ইলম কখনো তলবে ইলম থেকে 'ফারিগ' হতে পারে না।

আল্লাহ না করুন, আপনি যদি 'শিক্ষা-সমাপ্তি'র অর্থ এই মনে করে থাকেন যে, তালিম ও শিক্ষা অর্জন থেকে আপনি ফারিগ হয়ে গেছেন। অধিক তালিম ও তারবিয়াতের আপনার প্রয়োজন নেই। শিক্ষায় দীক্ষায় আপনি এখন সম্পূর্ণ। কেননা আপনি 'শিক্ষা সমাপ্ত' করেছেন, তাহলে কোন রকম দ্বিধা সংকোচ ছাড়া

পরিষ্কার ভাষায় আমি বলবো যে, আপনি কিছুই শিক্ষা লাভ করেন নি। আপনাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান তার উদ্দেশ্যের পথে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। আর আমরা যারা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত ছিলাম, আমরা হয়েছি সর্বস্বান্ত।

কিন্তু আমি আগেও বলেছি যে, আপনাদের প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। আমার বিশ্বাস, শিক্ষাসমাপ্তির এবং তালিম থেকে ফারাগতের এই গলদ অর্থ আপনারা গ্রহণ করেন নি, বরং আপনাদের মহান পূর্ববর্তীদের কাছে এর যে অর্থ ও মর্ম ছিলো আপনারাও তাই বুঝেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন।

সুযোগ্য পূর্বসূরীর সুযোগ্য উত্তরসূরী হিসাবে আপনারাও নিশ্চয় বিশ্বাস করেন যে, ফারিগ হওয়ার অর্থ হলো, শিক্ষা লাভের এমন এক স্তরে আপনারা উপনীত হয়েছেন যে, এখন যে কোন বিষয়ে কিতাব হাতে নিতে পারেন এবং সাহস করে জ্ঞান সমুদ্রে ডুব দিয়ে প্রয়োজনীয় মণি-মুক্তা তুলে আনতে পারেন। বরং এভাবে বলা অধিক সঙ্গত যে, জ্ঞান-ভাণ্ডারের চাবিগুচ্ছ আপনার হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। আপনি এখন যে কোন তালা খুলতে পারেন এবং যত ইচ্ছে জ্ঞান-সম্পদ আহরণ করতে পারেন। এই চাবিগুচ্ছ আপনি যত বেশী ব্যবহার করবেন তত বেশী লাভবান হবেন, তত বেশী বিদ্বান ও বিত্তবান হবেন।

যে কোন নিছাব ও পাঠ্যব্যবস্থার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। আমাদের দ্বীনী মাদারেসের নিছাব ও পাঠ্যব্যবস্থা যদি তার শিক্ষার্থীর মাঝে 'আমি কিছু জানি না' – এই অজ্ঞতাবোধ সৃষ্টি করে দিতে পারে তাহলেই নিছাবের উদ্দেশ্য সফল। তাহলেই এতো সব উদ্যোগ আয়োজন এবং এতো সব শ্রম ও পরিশ্রম সার্থক।

'অজ্ঞতা' শব্দটি হয়ত অনেকের কাছে অদ্ভূত মনে হবে। কিন্তু পূর্ণ সচেতনভাবেই শব্দটির উপর আমি জোর দিতে চাই। আধুনিক যুগের মানুষ 'সুশীল' ভাষায় এটাকেই 'জ্ঞানমনস্কতা' বলে।

এই অজ্ঞতাবোধ কিংবা জ্ঞানমনস্কতা যদি আপনার মাঝে জাগ্রত হয়ে থাকে তাহলেই আপনি সফল। আপনার শিক্ষাজীবন সার্থক। আমি আপনাকে, আপনার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এবং আপনাকে গড়ে তোলার কারিগর যারা তাদেরকে অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানাবো।

এই ভূমিকা নিবেদনের পর সংক্ষিপ্ত সময়ে আমি আমার বিদায়ী ভাইদের উদ্দেশ্যে তিনটি কথা আরয করবো এবং আপনাদের সজাগ দৃষ্টি ও পূর্ণ মনসংযোগ আশা করবো।

ইখলাছ ও লিল্লাহিয়াত

মুসলমানের যিন্দেগির কামিয়াবির প্রথম কথা হলো ইখলাছ ও লিল্লাহিয়াত। বড় বড় বুযুর্গানে দ্বীন, ইমাম ও মুজতাহিদীন এবং জ্ঞানসাধক ও যুগসংস্কারক, পৃথিবীতে যারা অমর হয়েছেন এবং ইতিহাসের পাতায় যাদের নাম স্বর্ণোজ্জ্বল হয়েছে, যদি তাঁদের জীবনচরিত অধ্যয়ন করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে, ইখলাছই ছিলো তাঁদের জীবনের বিনির্মাণের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। লিল্লাহিয়াত ও আল্লাহর প্রতি আত্মনিবেদনই তাঁদের প্রতিটি কর্ম ও কীর্তিকে এমন অমরত্ব দান করেছে।

দরসে নিযামীর 'বানী' ও প্রবর্তক মোল্লা নিযামুদ্দীনের কথাই ধরুন। দ্বীনী শিক্ষাব্যবস্থা হিসাবে দরসে নিযামীর অপ্রতিহত প্রভাব যুগ যুগ ধরে শুধু পাক-ভারতে নয়, পৃথিবীর আরো দূর দূরাঞ্চলেও অব্যাহত রয়েছে। এত এত সংস্কার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাকে 'টস থেকে মস' করা সম্ভব হয়নি। কিসের জোরে, কিসের বলে? শুধু জ্ঞান-প্রতিভা ও বুদ্ধি-প্রজ্ঞার বলে নয়। কেননা তাঁর সমকালে বহু ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব এমন ছিলো যারা মেধায় ও প্রতিভায় এবং জ্ঞানে ও গুণে তাঁর থেকে অগ্রসর না হলেও সমকক্ষ অবশ্যই ছিলেন। কিন্তু লুকিয়ে আছে কী এমন রহস্য যে, মোল্লা নিযামুদ্দীন তো আজও জীবন্ত, অথচ অন্যদের আলোচনা পর্যন্ত বিলুপ্ত! বরং তাদের নাম উচ্চারিত হয় এই সুবাদে যে, তারা ছিলেন তাঁর সমসমায়িক!

যদি আপনি চিন্তার সঠিক রেখায় অগ্রসর হন এবং তাঁর জীবন ও কর্মের গভীরে প্রবেশ করেন তাহলে ইখলাছ ও লিল্লাহিয়াতেরই মহাশক্তিকে সেখানে ক্রিয়াশীল দেখতে পাবেন।

ইখলাছ এবং একমাত্র ইখলাছই মোল্লা নিযামুদ্দীনকে অমর জীবন ও অক্ষয় কীর্তি দান করেছে।

ঘটনা শুধু এই ছিলো যে, সুদীর্ঘ শিক্ষাজীবন থেকে 'কিছুই জানি না'র শিক্ষাটুকু তিনি অর্জন করেছিলেন। আর এই 'অজ্ঞতাবোধ' তাঁকে এমনই অস্থির করে তুলেছিলো যে, সে যুগের এক উম্মী বুযুর্গ ও নিরক্ষর সাধক পুরুষের দুয়ারে গিয়ে তিনি হাজির হয়েছিলেন, যিনি অযোধ্যার ছোট্ট এক গুমনাম বস্তিতে ইখলাছের পুঁজি ও 'সারমায়া' নিয়ে বসেছিলেন। 'জ্ঞানগরিমা' বিসর্জন দিয়ে নিজেকে মোল্লা নিযামুদ্দীন সেই উম্মী সাধকের সাথে জুড়ে দিলেন এবং তাঁর পদ-সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। এই বিসর্জনই ছিলো তাঁর সকল অর্জনের উৎস।

এক্ষেত্রেও মোল্লা নিযামুদ্দীন ঐসকল বুযুর্গানের আস্তানায় যেতে পারতেন যারা ছিলেন 'সময়ের ইমাম' এবং যুগের স্বীকৃত সাধক পুরুষ। কিন্তু নিজেকে তিনি এমন এক গুমনাম ইনসানের হাতে তুলে দিলেন, মানুষের জগত যাকে চিনেছে মোল্লা নিযামুদ্দীনেরই সুবাদে। যদি বলতে যাই তাহলে অসংখ্য উদাহরণ আছে। কিন্তু হৃদয় যদি শিক্ষা গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত থাকে তাহলে একটি কথাই যথেষ্ট।

ত্যাগ ও কোরবানি

দ্বিতীয় যে কথাটি আমি আপনাকে বলতে চাই তা হলো ত্যাগ ও কোরবানীর জাযবা। বস্তুত ত্যাগ ও কোরবানী এবং পণ ও প্রতিজ্ঞা এমনই মহাশক্তি যে, তা যদি ব্যক্তির মাঝে জাগ্রত হয় তাহলে তাকে আকাশের উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। যদি প্রতিষ্ঠান বা সম্প্রদায়ের মাঝে সৃষ্টি হয় তাহলে পৃথিবী তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়।

সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ শিক্ষাজীবন থেকে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং যে নীতি ও আদর্শ আপনি অর্জন করেছেন তার জন্য আপনার জীবন-যৌবন এবং আপনার বর্তমান-ভবিষ্যত সবকিছু কোরবান করুন। নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করুন। তারপর দেখুন, কোথায় কোন্ মাকামে আল্লাহ আপনাকে পৌঁছে দেন।

আত্মযোগ্যতা

জীবনের সফলতার জন্য তৃতীয় বিষয় হলো মানুষের আত্মযোগ্যতা ও সুপ্ত প্রতিভা। মানুষ যদি তার আত্মযোগ্যতা ও সুপ্ত প্রতিভার পরিপূর্ণ স্ফূরণ ঘটাতে পারে তাহলে সে অসাধ্য সাধন করতে পারে। যুগে যুগে এটাই ছিলো মানুষের উন্নতি, অগ্রগতি ও অক্ষয় কীর্তির একমাত্র পথ।

আমাদের সবসময়ের একটি সহজ অনুযোগ এই যে, 'যামানা বদলে গেছে', কিন্তু আপনি যদি ইখলাছ ও লিল্লাহিয়াত, ত্যাগ ও কোরবানি এবং প্রতিভা ও আত্মযোগ্যতার সমাবেশ ঘটাতে পারেন তাহলে দেখতে পাবেন, যুগের কোন পরিবর্তন ঘটেনি বরং সময় ও সমাজ এখনো আপনাকে বরণ করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

পক্ষান্তরে জীবন পথের এই তিন পাথেয় ছাড়া যার সফর শুরু হবে, পৃথিবীর যেখানেই সে যাবে এবং ডিগ্রী ও সনদের যত বাহারই দেখাবে সময় ও সমাজের কাছে সে অবজ্ঞাই শুধু পাবে।

আমি আবারো বলছি, এ গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো আপনি যদি অর্জন করতে

পারেন তাহলে আলমগীরের যামানা, নিযামুল মুলক তূসীর যামানা, ইমাম গাযালী, ইমাম রাযী, ইমাম ইবনে কাইয়েম ও ইমাম ইবনে তায়মিয়ার যামানা আজো আপনার প্রতীক্ষায় রয়েছে। সেই সোনালী অতীত আবার ফিরে আসতে পারে শুধু আপনারই জন্য।

এ ধারণা অবশ্যই ভুল যে, সময় আগে থেকে জায়গা খালি রেখে কারো অপেক্ষায় থাকবে। আর তিনি যথাসময়ে সেই সংরক্ষিত আসনে বসে পড়বেন। না, এমন কখনো হয় নি, কখনো হবেও না। লোক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সময় বড় বাস্তববাদী ও অনুভূতিপ্রবণ। সময়ের নীতি হলো– البقاء للأصلح –যোগ্যতরেরই টিকে থাকার অধিকার।

অযোগ্যতার তো প্রশ্নই আসে না, সময় তো এত নির্মম যে, যোগ্য ব্যক্তির পরিবর্তে যোগ্যতরের এবং উপযোগীর পরিবর্তে অধিকতর উপযোগীর সে পক্ষপাতী।

মোটকথা প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও উপযোগিতা যদি থাকে তাহলে যে কোন সময় ও কাল আপনার অনুকূল এবং যে কোন সমাজ ও সম্প্রদায় আপনার জন্য ব্যাকুল। সময়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসলে নিজের অযোগ্যতা ও দুর্বলতাকে আড়াল করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা এবং হিনমন্যতা ছাড়া আর কিছু নয়।

সময় ও কালের কোন পরিবর্তন হয়নি, হয়েছে আমার আপনার। আমরা বদলে গেছি। সে যুগের ইখলাছ ও তাকওয়া এ যুগে নেই। তাঁদের ত্যাগ ও কোরবানীর জাযবা আমাদের মাঝে নেই। প্রতিভা ও আত্মযোগ্যতার বিকাশের যে চেষ্টা-সাধনা তাঁদের মাঝে ছিলো তা আমাদের মাঝে নেই। সেই যুগ, সেই কাল এখনো আছে, নেই শুধু সেই মানুষগুলো। সেই গুণগ্রাহিতা ও মূল্যায়ন এখনো আছে, নেই শুধু সেই যোগ্যতা ও সাধনা। অর্থাৎ আমাদের মাঝে পরিবর্তন এসেছে, সুতরাং সময়ের স্বীকৃতি আদায় করতে হলে আমাদের মাঝেই পরিবর্তন আনতে হবে।

শেষ কথা–

যে কল্পনা ও পরিকল্পনা এবং যে চিন্তা ও চেতনার কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম তা যদি না হতো তাহলে যুগের এই দুর্যোগে এবং সমাজের এই বৈরী পরিবেশে কোন মুসলিম শিশুকে মা-বাবার কোল থেকে কেড়ে এনে দ্বীনী তা'লীমের ছেঁড়া চাটাইয়ে বসিয়ে দেয়ার কোন অধিকার ও বৈধতা আমাদের থাকতো না। কেননা দৃশ্যত এ শিক্ষার না আছে কোন মূল্য ও সম্মাননা, না

আছে কোন ভবিষ্যত সম্ভাবনা। তবু আমরা আছি, সময় ও সমাজের কাছে আমাদের দাওয়াত ও আহ্বান আছে এবং দুনিয়ার 'সম্ভাবনা' থেকে আখেরাতের সম্মাননার দিকে মুসলিম শিশুদের টেনে আনার অধিকারও আছে। কেননা ইখলাছ, কোরবানি ও আত্মযোগ্যতা– এই তিন গুণের সমাবেশ হলো আমাদের সফলতার যামানত। সুতরাং এটা শুধু আমাদের অধিকার নয়। সময় ও সমাজেরও ব্যাকুল দাবী এই যে, মানবতা ও তার মূল্যবোধের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই হিন্দুস্তানের বুকে নাদওয়াতুল উলামা, দারুল উলূম দেওবন্দ, মাযাহেরুল উলূম সাহারানপুর এবং এ ধরনের সব প্রতিষ্ঠান যেন টিকে থাকে এবং উন্নতির পথে আগুয়ান থাকে।

আমি আশা করি, যে সকল প্রিয় তালিবানে ইলম আজ বিদায় ও বিচ্ছেদ গ্রহণ করে যিন্দেগির নয়া সফর শুরু করছেন, আগামী কর্ম-জীবনে তারা এই মূলনীতিগুলো গ্রহণ করবেন। পক্ষান্তরে যাদের সামনে এখনো সময় ও সুযোগ আছে, আরো কয়েক বছর যাদের ছাত্রজীবন আছে তারা এই উছূল ও মূলনীতি থেকে আরো বেশী কল্যাণ আহরণে সচেষ্ট হবেন।

সব শেষে, তোমরা যারা বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছো তোমাদের কাছে আমার আবেদন, চিরদিনের জন্য তোমরা চলে যেয়ো না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তোমাদের প্রিয় দারুল উলূমকে তোমরা ভূলে যেয়ো না। হৃদয় ও আত্মার বন্ধন যেন অটুট থাকে এবং দারুল উলূমের শিক্ষা ও আদর্শই যেন তোমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

মুহাম্মদী নবুয়ত তোমাকে ডাকছে হে জওয়ান! হও আগুয়ান

১৯৬৬ সালের তেসরা জুলাই, দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার সোলায়মানিয়া মিলনায়তনে তালেবানে ইলমের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নাদাবী (রহ) এর মূল্যবান ভাষণ। তাঁর মূল বক্তব্য ছিলো–

আমাদেরকে আজ স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমরা তালিবে ইলম হবো কি না। না হলে ভদ্রভাবে এ পথ পরিত্যাগ করে চলে যাওয়া উচিত। আর যদি এ পথে চলার সিদ্ধান্ত নেই তাহলে জীবন উৎসর্গ করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

কাজের বিরাট ময়দান আমাদের সামনে পড়ে আছে। বাতিলের বিরুদ্ধে আমাদেরকে আজ সাংস্কৃতিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে এবং জয়ী হতে হবে। আমরা যদি অবিচল থাকি তাহলে অবশ্যই আল্লাহর মদদ আমাদের শামিলে হাল হবে এবং আমরা জয়ী হবো।

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম!

আজ আমি যাবতীয় লৌকিকতা বর্জন করে নিঃসংকোচে কয়েকটি কথা তোমাদের বলতে চাই। আপনজনের সাথে লৌকিকতা ও রাখঢাকের কী প্রয়োজন! পরিবারে ঘরোয়া পরিবেশে ভাইয়ে ভাইয়ে, কিংবা বাপ-বেটায় কথা বলতে কি কোন তাকাল্লুফ ও লৌকিকতার আশ্রয় নেয়? নেয় না। আমিও নেবো না। যা বলার পরিষ্কার ভাষায় বলবো।

দুই শ্রেণীর ছাত্র

আমাদের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা এই যে, দ্বীনী মাদরাসায় দু' ধরনের 'ছাত্র' এসে থাকে। একদল আসে মা-বাবার চাপের মুখে। আমাদের রক্ষণশীল সমাজে পিতা-মাতা ও সন্তানের মাঝে 'বাধ্যবাধকতার' যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের দাবীতে মজবুর হয়ে আসে। সুতরাং এখানে তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক হলো আরোপিত ও চাপিয়ে দেয়া সম্পর্ক। দ্বীনী শিক্ষার উপকারিতা ও সার্থকতা সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা ও অনুভূতি নেই, তবু তারা এসেছে। কেননা মা-বাবার হুকুম মেনে না এসে তাদের উপায় ছিলো না। ফলে এখানে এসে তাদের হৃদয়ে যে কোমল অনুভূতি এবং যে ইতমিনান ও প্রশান্তি হওয়ার কথা তা হয়নি। তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে মা-বাবা দ্বীনী শিক্ষার যে পথ নির্বাচন করেছেন সে জন্য তাদের অন্তরে যে কৃতজ্ঞতা বোধ হওয়ার কথা তা হয়নি, বরং তারা আরো বেশী দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ও অন্তর্দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে পড়েছে। কেন এমন হয়? কী এর কারণ? কোথায় এর উৎস? সে আলোচনায় আমি যাবো না, যাওয়ার প্রয়োজনও নেই। এখন প্রয়োজন সঠিক চিকিৎসার এবং দ্রুত আরোগ্যের।

মাদরাসায় এসে এ ধরনের ছাত্রদের মনে দিন দিন এ অনুভূতি জোরদার হয় যে, তাদের জীবনে এ শিক্ষার কোন সুফল নেই, এ পথের কোন ভবিষ্যত নেই। না জেনে, না বুঝে নিছক সুধারণা বশে এখানে পাঠিয়ে মা-বাবা আমাদের ভবিষ্যত নষ্ট করছেন এবং জীবন বরবাদ করছেন। সময়ের অপচয় ছাড়া এখানে আমাদের আর কিছু হবে না। কী আছে এখানে! কী নেবো এখান থেকে!

দ্বীনী মাদরাসায় এ ধরনের চিন্তার মানুষও থাকতে পারে, আমার কাছে তা

আশ্চর্যের বিষয় নয়। বাস্তবতার জগতে এমন হাজারো বিষয়ের সম্মুখীন আমাদের হতে হয় যা আমরা পসন্দ করি না। এমনকি স্বভাবের দিক থেকে যারা সৎ ও মহৎ ছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে ইলম ও আমলে যথেষ্ট উন্নতি করে আল্লাহর প্রিয় পাত্রও হয়েছেন তাদের মাঝেও এ ধরনের হতাশা ও অস্থিরতা থাকা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। আল্লাহর রহমত হলে একসময় তা কেটে যায় এবং উন্নতির পথে তার অগ্রযাত্রা শুরু হয়। তবে সে জন্য শর্ত হলো জীবন সফরের যারা অভিজ্ঞ মুসাফির তাদের পথ নির্দেশনা গ্রহণ করা। অন্যথায় জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মন যতক্ষণ আশ্বস্ত না হবে এ ধরনের মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ও চিন্তাগত অন্তর্দ্বন্দ্বে প্রতিমুহূর্তে তারা বিপর্যস্ত হতেই থাকবে।

তাদের প্রতি আমার আন্তরিক পরামর্শ এই যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তোমরা পূর্ণ স্বাধীন। এখানে কোনভাবেই যদি দিলের ইতমিনান না হয়, মন যদি আশ্বস্ত না হয়, এখানকার পরিবেশ-পরিমণ্ডল এবং নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধানের সাথে একাত্ম হওয়া এবং এই নিয়ন্ত্রিত সাধনার জীবন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মেনে নেয়া কিছুতেই যদি সম্ভব না হয়। যদি লাগাতার অস্বস্তিই বোধ করো, দিন-রাত যদি পেরেশানই থাকো। এক কথায়, যদি মনে করো যে, এখানে এসে তোমরা ভীষণ সমস্যায় পড়ে গেছো তাহলে আমি অত্যন্ত খোলামেলা ভাবে এবং পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে পরামর্শ দেবো যে, তোমরা একটু সাহসিকতার পরিচয় দাও। নৈতিক সাহস মানুষের জীবনে বড় মূল্যবান উপাদান। এর দ্বারা মানুষ বড় বড় কাজ করেছে, বড় বড় সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে ভবিষ্যত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তুমি পূর্ণ স্বাধীন। তুমি স্পষ্টভাষণের আশ্রয় গ্রহণ করো এবং অভিভাবকদের লিখে জানাও যে, এই পরিবেশে এই শিক্ষায় মন আমাদের আশ্বস্ত নয়, বরং আমাদের অনুভূতি এই যে, সময় নষ্ট হচ্ছে, যিন্দেগী বরবাদ হচ্ছে। আপনারা বড় ভুল ধারণায় আছেন যে, আপনাদের সন্তান বুঝি লেখা-পড়ার মেহনতে এবং দ্বীন শিক্ষার সাধনায় ডুবে আছে। আসল ঘটনা তো এই যে, আমরা এখানে পেরেশানিতে ডুবে আছি। আমাদের মন বসছে না, কোন ফায়দা হচ্ছে না। আমাদেরকে অন্য পথে নিয়ে চলুন। আমাদের জন্য অন্য কিছু নির্বাচন করুন।

মোটকথা, যে কোন কারণেই হোক, যারা মানসিক অস্থিরতা এবং চিন্তার দ্বন্দ্বে ভোগছো তাদের উদ্দেশ্যে এটাই আমার সুস্পষ্ট বক্তব্য। তোমরা একটা সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। ইনশাআল্লাহ, তোমাদের সম্পর্কে আমাদের কোন

অভিযোগ থাকবে না এবং সম্পর্কেরও কোন ব্যত্যয় ঘটবে না, এমনকি আল্লাহ না করুন, আমাদের পক্ষ হতে কোন অকল্যাণ কামনাও হবে না।

খুশী মনে বাড়ীতে যাও, হিম্মত ও সাহস করে মা-বাবার সামনে দাঁড়াও এবং বুঝিয়ে বলো যে, আপনারা আমাকে দ্বীন শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছেন, কিন্তু মন আমার কিছুতেই আশ্বস্ত হচ্ছে না। অনুগ্রহ করে আমার জন্য অন্য কোন পথ নির্বাচন করুন। অন্যথায় আমার নষ্ট ভবিষ্যতের জন্য আপনারাই দায়ী হবেন।

যারা আশ্বস্ত ও সন্তুষ্ট

দ্বিতীয় প্রকার হলো ঐ সকল সৌভাগ্যবান তালিবে ইলম যারা আশ্বস্ত হয়ে এখানে এসেছে, কিংবা এসে আশ্বস্ত হয়েছে। যারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা মেহেরবানি করে তাদেরকে দ্বীনী শিক্ষা লাভের এবং দ্বীনের ছহীহ ইলম ও তত্ত্বজ্ঞান অর্জনের এক সুবর্ণ সুযোগ দান করেছেন। যারা মনে করে যে, এখানকার শিক্ষা ও দীক্ষা থেকে আমরা উপকৃত হতে পারবো। কেননা প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণ এবং সহায়ক পরিবেশ এখানে রয়েছে। যাদের সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা এই যে, এখানে মেহনত-মোজাহাদার মাধ্যমে আমরা এই পরিমাণ ইলমী ও আমলী যোগ্যতা অবশ্যই অর্জন করবো যাতে অন্তত নিজেকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে চিরন্তন কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে পারি। আর বান্দার কাছে আল্লাহর এটাই সর্বপ্রথম দাবী।

قوا انفسكم و اهليكم نارا

'তোমরা নিজেকে এবং আপন পরিজনকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো।'

মূলত প্রত্যেক মানুষ আত্মদায়িত্বশীল।

لا تزر وازرة وزر اخرى

'কোন মানুষ অন্য কারো পাপের দায়িত্ব বহন করবে না।'

এরপর মা-বাবা, পরিবার-পরিজন এবং নিজের এলাকার জন্যও এখান থেকে আমি কল্যাণ আহরণ করবো।

এরপর যদি আল্লাহ হিম্মত ও তাওফীক দান করেন তাহলে পুরো দেশের জন্য, আর আল্লাহ যদি আরো বেশী হিম্মত ও তাওফীক দান করেন তাহলে সমগ্র বিশ্ব-মানবতার জন্য আমরা কল্যাণের ধারক ও বাহক হবো। শুধু এই নয় যে, নিজে আল্লাহর পরিচয় লাভ করে আল্লাহর রাস্তায় চলবো, বরং অন্যকেও আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করবো।

যাদের নিষ্কম্প বিশ্বাস এই যে, দ্বীন শিক্ষার এ পথ হলো নবীর নেয়াবাত ও প্রতিনিধিত্বের পথ। এ এমন মহামূল্যবান সম্পদ যা আল্লাহ তাঁর বিশেষ নির্বাচিত বান্দাদেরই শুধু দান করেন, যাদের থেকে আল্লাহ উম্মতের ইমামাত ও হেদায়াতের খেদমত গ্রহণ করেন।

ইরশাদ হয়েছে–

و جعلناهم أئمة يهدون بامرنا لما صبروا و كانوا بآياتنا يوقنون

আমি তাদেরকে ইমাম বানিয়েছি, যারা আমার আদেশে সত্যপথ প্রদর্শন করে। কেননা তারা ছবর করেছে, আর তারা আমার আয়াতের প্রতি বিশ্বাস রাখতো।

যার অন্তরে এ প্রগাঢ় উপলব্ধি রয়েছে যে, ইমামাত ও হেদায়াতের তাওফীক ও যোগ্যতা যাকে দান করা হয় তার আমলনামায় শুধু নিজের নয়, বরং শত শত ও হাজার হাজারা মানুষের আমলের ছাওয়াব শামিল হয়। এমন কি আল্লাহর শানে করম ও মহাদানশীলতার কাছে কোনই অসম্ভব নয় যে, তিনি লক্ষ লক্ষ ও কোটি কোটি মানুষের ছাওয়াব তার আমলনামায় লিখে দেবেন। যেমন খাজা মুঈনুদ্দীন আজমীরী (রহ), মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহ) এবং শায়খ আব্দুল কাদির জীলানী (রহ) এর আমলনামায় লেখা হয়েছে। যেমন ইমাম আবু হানীফা ও অন্যান্য ইমামের আমলনামায় লেখা হয়েছে। (ইনশাআল্লাহ)

দুনিয়ার প্রায় সব মুসলমান চার ইমামের মাযহাবের উপর আমল করে থাকে। তাহলে হিসাব করে দেখো, তাদের আমলনামায় কত লক্ষ কোটি মানুষের ছাওয়াব লেখা হয়েছে। ইমামগণ যে যুগে ইজতিহাদ করে শরীয়তের মাসায়েল আহরণ করেছেন এবং মানুষ তার উপর আমল করছে তখন থেকে আজকের যুগ পর্যন্ত হিসাব করলেই বুঝতে পারবে যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ) এর আমলনামায় কত লক্ষ কোটি মানুষের আমল এসেছে এবং কোন্ কোন্ খাতে এসেছে! নামায-রোযার খাতে, হজ্জ-যাকাতের খাতে এবং আরো কত শত খাতে!

একটু পরে যে আমরা নামায পড়বো, সবাই নামায পড়বে, তারও ছাওয়াব মুজতাহিদ ইমামগণের আমলনামায় জমা হবে, যাদের ইজতিহাদকৃত মাসআলা অনুসারে নামায পড়া হবে। কোরআন-হাদীছের অকাট্য প্রমাণ দ্বারা এ সত্য সুপ্রমাণিত। সুতরাং সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাহলে তাঁদের আজর-ছাওয়াবের পরিমাণ কত হলো তা কল্পনা করাও কি সম্ভব? পৃথিবীতে

আছেন এমন কোন গণিতবিশারদ, যিনি ইমাম, ফকীহ, মুজতাহিদ ও মাশায়েখগণের ছাওয়াবের পরিমাণ অংক কষে বের করতে পারেন? কারো সাধ্য নেই। কেননা এটা অন্য জগত, এটা উর্ধ্বজগত। এখানে ইউরোপ আমেরিকার সমস্ত যন্ত্রকৌশল অক্ষম, সমস্ত দূরবীক্ষণ যন্ত্র অকার্যকর। এখানে দুনিয়ার সমস্ত বিজ্ঞানী ও গণিত শাস্ত্রবিশারদ অসহায়।

***

মোটকথা, যাদের বিশ্বাস এমন, যাদের চিন্তা-চেতনা এমন তারাই হলো সৌভাগ্যবান তালিবে ইলম। এবং আমি আশা করি যে, তোমরা এই দ্বিতীয় দলেরই অন্তর্ভুক্ত, যারা জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থীর করে দ্বীনী মাদরাসায় এসেছে? মাত্রা ও পরিমাণ যাই হোক তাদের অন্তরের বিশ্বাস এই যে, ইলমের সাধনায় এবং আমলের মোজাহাদায় পূর্ববর্তী ইমামদের কাতারে তো আমরা শামিল হতে পারবো না – কেননা তা চিন্তা করারও দুঃসাহস কারো নেই। – তবে তাঁদের কৃতার্থ সেবক ও অনুগামীদের কাতারে অবশ্যই শামিল হতে পারি। অবশ্য আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ তো এমনই চির বহমান যে, 'তোমার রবের দান কারো জন্য বন্ধ নয়।' و ما كان عطاء ربك محظورا

সুতরাং এ যুগেও তিনি যদি 'সে যুগের' ইমাম পয়দা করে দেন এবং একই কাজ নেন কিংবা একই ছাওয়াব দান করেন তাহলে তাঁর কুদরতের পক্ষে অসম্ভব তো কিছুই নয়!

আজকের নতুন ফিতনা

দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখো, কত বড় বড় ফিতনা আজ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। জাহান্নামের আগুন কেমন দাউ দাউ করে জ্বলছে। সেই আগুনে পুরা ইসলামী জাহান জ্বলে পুড়ে ছারখার হতে চলেছে

ছাহাবা কেরামের ত্যাগ ও কোরবানির ফসলকে বিনষ্ট করার অপচেষ্টা চলছে। বিভিন্ন রকমের ইসলাম ও শরীয়ত বিরোধী এবং ঈমান ও আখলাক বিনাশী, এমনকি ইনসানিয়াত ও মানবতা বিধ্বংসী ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। জড়বাদ, নাস্তিক্যবাদ, জাতীয়তাবাদ, এ ধরনের আরো কত বাদ-মতবাদ আজ নবুয়তে মুহাম্মদীর সামনে হুমকি হয়ে দাঁড়াতে চায়। সে যুগের মুসায়লামাতুল কায্যাব এ যুগে নতুন নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করছে এবং নবুয়তে মুহম্মদীকে চ্যালেঞ্জ করছে।

নবীর রেখে যাওয়া সম্পদের উপর রাহযানদের প্রকাশ্য হামলা চলছে।

নবুয়তের দুর্গে ফাটল সৃষ্টির পাঁয়তারা চলছে। নবুয়তের প্রাণকেন্দ্রে এখন নগ্ন আগ্রাসন শুরু হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা, ও তাঁর অনুগামীরা আজ যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে আমি মনে করি, হয়ত কিছু কালের জন্য ফিকাহর ইজতিহাদ মূলতবী রেখে যুগের নতুন ফিতনার মোকাবেলায় তাঁরা সর্বশক্তি নিয়োগ করতেন।

আমার প্রিয় ভাই, তোমরা বড়ই ভাগ্যবান যে, ফিকাহ্ শাস্ত্র সংকলনের দায়িত্ব তোমাদের উপর আসেনি। মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ আগেই এর ইনতিযাম করেছেন। এ মহাদায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য উম্মতকে আল্লাহ আবু হানীফা, শাফেয়ী, মালিক ও আহমাদ ইবনে হাম্বালের মত ইমাম দান করেছেন। হাদীছ শাস্ত্র সংকলনের জন্য ইমাম বুখারী, মুসলিমসহ মুহাদ্দিছীনের জামাত পয়দা করেছেন, আর তাঁরা অসাধারণ যোগ্যতা ও বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে এ মহাকর্মযজ্ঞ আঞ্জাম দিয়েছেন, যখন মুহূর্ত বিলম্বেরও অবকাশ ছিলো না।

তোমাদের বড় সৌভাগ্য। আল্লাহর রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না। আজ তোমাদের সামনে রয়েছে কাজের নতুন এক ময়দান। ইলহাদ ও নাস্তিকতার সাথে পাঞ্জা লড়ার এবং জড়বাদী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে মোকাবেলার সুযোগ এসেছে তোমাদের সামনে। বিশ্বাস করো, যদি তোমরা তা করতে পারো তাহলে মুহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ মোবারক তোমাদের প্রতি তেমনি খুশী হবেন যেমন খুশী হয়েছেন পূর্ববর্তী ইমামগণের প্রতি।

ইসলামী জাহানের উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি আজ ঐ সকল দ্বীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি নিবদ্ধ যাদের রয়েছে সময়ের ডাক এবং যুগের দাবী বোঝার যোগ্যতা। যে সকল দ্বীনী ইদারার প্রতিষ্ঠাতাপুরুষগণ শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচি এমনভাবে তৈরী করেছেন যেন তাদের শিক্ষার্থীরা আধুনিক যুগের যে কোন নতুন ফিতনা বুঝতে পারে এবং তার সফল মোকাবেলা করতে পারে।

আমার প্রিয় বন্ধুগণ! একটু ভেবে দেখো, তোমাদের সামনে আজ কর্মের কী বিশাল বিস্তৃত ময়দান পড়ে আছে এবং সামান্য মেহনত-মোজাহাদা ও চেষ্টা-সাধনা দ্বারা আল্লাহর কাছে কী অকল্পনীয় প্রতিদানের হকদার তোমরা হতে পারো!

যামানা এখন নতুন খালিদ বিন ওয়ালীদ এবং নতুন আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ-এর অপেক্ষায় রয়েছে। তাঁদের পাক রূহের উপর বর্ষিত হোক আল্লাহর লক্ষ কোটি রহমত। তাঁদের নমুনা তো কেয়ামত পর্যন্ত আর পয়দা হতে পারে

না। কিন্তু আমি শুনতে পাই, তাঁদের পাক রূহ যেন তোমাদের ডেকে ডেকে বলছে–

'তলোয়ারের জিহাদ তো আমরা করেছি, বুকের রক্ত যত প্রয়োজন ঢেলে দিয়েছি। যখনই ডাক এসেছে ছুটে গিয়েছি, ঝাঁপিয়ে পড়েছি। এভাবে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছি। কিন্তু আজ রক্তের জিহাদের যত প্রয়োজন, চিন্তার জিহাদের প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশী। ধারালো তলোয়ারে যত প্রয়োজন শাণিত কলমের প্রয়োজন আরো বেশী। বাতিলের বিরুদ্ধে তোমাদের আজ লড়তে হবে শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ময়দানে এবং চিন্তা, মতবাদ ও দর্শনের জগতে। কেননা নবুয়তে মুহাম্মাদীর উপর আজ তলোয়ারের হামলা যতটা না চলছে তার চেয়ে বেশী চলছে যুক্তি-প্রমাণের হামলা, চিন্তা ও দর্শনের 'মামলা'। সুতরাং নতুন যুগের নতুন জিহাদের জন্য তোমরা একদল মুজাহিদ তৈয়ার হও।'

আমার যে সকল প্রিয় তালেবানে ইলম মনে করে যে, এখানে এই দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা অর্জন করে নতুন যুগের নতুন ফিতনার মোকাবেলায় কিছু করা যেতে পারে তাদের জন্য সৌভাগ্যের দুয়ার খোলা। এখান থেকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তারা পূর্বযুগের শহীদানের কাতারে অবশ্যই শামিল হতে পারে।

যারা মনে করে যে, এটা দাওয়াতের এমন এক ময়দান যা আল্লাহ তাঁর অসীম হিকমত ও প্রজ্ঞার কারণে – যার রায ও রহস্য তিনি ছাড়া কেউ জানে না – এ যুগের দুর্বল মনোবলের লোকদের জন্য নির্বাচন করেছেন যাতে অল্প মেহনতে আমরা অনেক বেশী আজর ও প্রতিদান পেতে পারি।

من أحيى سنتي عند فساد امتى فله اجر مأة شهيد

'আমার উম্মতের ফাসাদের সময় যে আমার সুন্নত যিন্দা করবে তার জন্য রয়েছে একশ শহীদের দরজা।'

তোমরা কি বুঝতে পেরেছো, এখানে সুন্নতের কী অর্থ? একটি সুন্নত যিন্দা করলেও শত শহীদের ছাওয়াব, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি বলতে চাই, 'আমার সুন্নত' বলে নবীজী আপন সত্তার দিকে সুন্নতের যে সম্বন্ধ করেছেন তার অন্তর্নিহিত মর্ম হলো, 'আমার চালচলন, আমার রীতি-নীতি এবং আমার দ্বীন ও শরীয়ত।'

এখন চিন্তা করে দেখো, দ্বীন ও শরীয়তের উপর আজ যে সকল দার্শনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক হামলা চলছে যদি কেউ তার মোকাবেলায় ঢাল হয়ে দাঁড়ায় এবং

জান বাজি রেখে লড়াই করে যায় তাহলে আল্লাহর কাছে তার কী মর্যাদা হতে পারে!

এই যে দ্বীনী মাদরাসা, যাকে তোমরা আজ অবজ্ঞার চোখে দেখছো; এখানকার ভবন ও ইমারতের দুর্দশা, এখানকার সহায় সম্বলহীন অবস্থা এবং এখানকার হাজারো ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা, আল্লাহর কসম তারপরো এগুলোর দাম এজন্যই যে, এখান থেকে এমন এমন মর্দে মুজাহিদ পয়দা হবে যারা বাতিলের বিরুদ্ধে এক নতুন ময়দানে জান বাজি রেখে লড়াই করবে, যারা হিম্মত ও সাহসিকতার সাথে জড়বাদী ও নাস্তিক্যবাদী সকল তৎপরতা এবং ঈমান ও আখলাক বিধ্বংসী সকল ফিতনার মোকাবেলা করবে। বিশ্বাস করো ভাই, সেই জিহাদের শুভ উদ্বোধনের জন্য নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ আজ অস্থির ও বেচয়ন হয়ে আছেন।

এ মজলিসে একজন মানুষও যদি এমন থেকে থাকো যার রয়েছে দেখবার মত চক্ষু, শোনবার মত কান এবং বুঝবার মত হৃদয়। এ মজলিসের একজন মানুষও যদি এ কথা বিশ্বাস করো যে, দ্বীনের সাচ্চা খাদিম হওয়ার জন্যই আমরা এখানে এসেছি এবং আমাদের মা-বাবা আমাদেরকে এখানে পাঠিয়ে শুধু আমাদের উপর নয়, বরং আমাদের পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির উপর বড় ইহসান ও অনুগ্রহ করেছেন, তারা আজ এ মজলিস থেকে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ওঠো যে, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমরা ইলমের সাধনায় ব্যয় করবো। ইলমের এ উদ্যান থেকে আমরা সর্বোত্তম ফল ও ফুল সংগ্রহের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবো। এখানে আমরা কিতাব ও সুন্নাহর গভীর ও বিস্তৃত জ্ঞান অর্জন করবো এবং এমন জীবন যাপন করবো যা একজন দা'ঈয়ে ইসলাম ও আলিমে দ্বীনের শান-উপযোগী।

একাগ্রতা ও নিমগ্নতার প্রয়োজন

ভাই! এর চেয়ে বড় জুলুম আর কী হতে পারে যে, যে দ্বীনী ইদারা ও তার খাদেমগণ দুনিয়ার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করে, লাভ ও মুনাফার সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে এবং যিন্দেগীর সওদাগরির সব কিশতি জ্বালিয়ে এই বন্দরে এসে পড়ে আছেন তাদের সাথে তোমাদের আচরণ এই যে, এক পা এখানে, অন্য পা আল্লাহর দুশমনদের সেখানে! তোমাদের দেহ এধারে, কিন্তু মন পড়ে আছে শত্রু শিবিরে!

বাতিল তাহযীব তামাদ্দুনের শিবির হলো ঐ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আর দ্বীনী তাহযীব তামাদ্দুনের শিবির হলো আমাদের এই সব জীর্ণ-শীর্ণ মাদরাসা।

এ দুই শিবিরে আজ লড়াই চলছে, দুই তাহযীব ও তামাদ্দুনের অস্তিত্বের লড়াই। বলো দেখি, শত্রু শিবিরের সাথে সম্পর্ক রাখার অনুমতি দিতে পারে কেউ! মাদরাসাও তো একটি সৈন্য শিবির! কোন ইজম ও বাদ-মতবাদ, কোন দর্শন ও জীবন-ব্যবস্থা কি অনুমতি দিতে পারে বিপরীত বাদ-মতবাদ ও জীবন-ব্যবস্থার সাথে সখ্যতা গড়ার? রাশিয়ায় থেকে আমেরিকার স্বপ্ন দেখা কিংবা আমেরিকায় বসে রাশিয়ার গুণ গাওয়া, সামাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলো কিংবা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, কেউ তোমাকে এ অনুমতি দেবে না, দিতে পারে না।

দুনিয়ার জীবন যাদের বাধা-বন্ধনহীন। নেশা করো, জুয়া খেলো, নাচ-গান করো কোন বাধা নেই, তারা যদি না পারে তাহলে ইনসাফের সাথে বলো, দ্বীন শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে আমরা তোমাকে কী ভাবে অনুমতি দেবো এখানকার শিক্ষা দিয়ে সেখানকার পরীক্ষা দেয়ার? এটা কেমন আমানতদারি যে, আমরা তো তোমাদের জন্য সময়, শ্রম, মেধা ও সর্বস্ব কোরবান করবো (অবশ্যই তোমাদের প্রতি এটা আমাদের অনুগ্রহ নয়, বরং কর্তব্য) কিন্তু তোমরা তা থেকে অন্যায় ফায়দা গ্রহণ করবে, এটা কোন ধরনের শারাফাত! কোন ধরনের দিয়ানাত!!

যারা দাওয়াত ও হেদায়াতের ময়দানে কাজ করবে তাদের সম্পর্কে তো কোরআনের ঘোষণা হলো–

و امر أهلك بالصلوة و اصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك و العاقبة للتقوى

'আপনি আপনার পরিবার পরিজনকে নামাযের আদেশ করুন এবং নিজেও নামাযের উপর অটল থাকুন। আমরা আপনার কাছে রিযিকের দাবী করি না, বরং আমরাই আপনাকে রিযিক দান করবো।'

আচ্ছা বলুন দেখি, 'আমরাই আপনাকে রিযিক দান করবো' বলার এখানে কী প্রাসঙ্গিকতা ছিলো? 'পরিবার পরিজনকে নামাযের আদেশ করুন এবং নিজেও নামাযের উপর অবিচল থাকুন।' এর পরই বলা হচ্ছে– 'আমরা আপনার কাছে রিযিকের দাবী করি না!' এটা তো জানা কথা যে, আল্লাহ তা'আলা রিযিকের মোহতাজ নন এবং বান্দার কাছে রিযিকের প্রত্যাশী নন। তাহলে কেন এ কথা বলা? আসলে এর অর্থ অতি ব্যাপক। অর্থাৎ আপনার কাছে আমি এ দাবীও করি না যে, আপনার রিযিকের দায়িত্ব আপনি নিজে বহন করবেন, বরং আপনার রিযিকের দায়িত্ব আমার। এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থেকে আমার ইবাদতে আত্মনিয়োগ করুন।

বোঝা গেলো যে, নামাযের ইহতিমাম দ্বারা আল্লাহর দরবারে রিযিকের হকদারি ও প্রাপ্যতা সাব্যস্ত হয়ে যায়, যার অনিবার্য ফল এই যে, যিনি দা'ঈ হবেন, ইবাদতগুজার হবেন ইনশাআল্লাহ রাব্বে কারীম কখনো তাকে অনাহারে রাখবেন না, অসহায় ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় ছেড়ে দেবেন না, বরং সে-ই হবে বহু নিরাশ্রয় মানুষের আশ্রয়। আল্লাহর হাজারো বান্দা তার ওছিলায় রিযিক লাভ করবে। এক সিংহ শিকার করে, আর বনের কত শত প্রাণী তার ওছিলায় উদর পূর্তি করে!

হযরত নিযামুদ্দীন আওলিয়ার দস্তরখান দেখো। আমাদের এ যুগে মাযাহেরে উলূম মাদরাসায় হযরত শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া (রহ) এর দস্তরখান দেখো, আর যে সৌভাগ্যবান লোকেরা হযরত মাদানী (রহ)-এর দস্তরখান দেখেছে তাদের জিজ্ঞাসা করো, আল্লাহর এক সিংহ শিকার করতেন আর তাঁর সমগোত্রীয় কত বান্দা তা থেকে উপকৃত হতেন!

আল্লাহর তো ওয়াদা রয়েছে, তুমি কিছু দিন মেহনত মোজাহাদা করেই দেখো। নিবেদিতপ্রাণ, সাধনামনস্ক ও মেহনতী তালিবে ইলম হও এবং নিজের মাঝে ইখলাছ ও আল্লাহমুখিতার গুণ সৃষ্টি করো, তারপর আল্লাহর কুদরত ও রহমতের তামাশা তুমিও দেখো, দুনিয়াকেও দেখাও।

***

ব্যস ভাই! বোঝার যোগ্যতা যাদের আছে, আল্লাহ যাদের জন্য সৌভাগ্য ও খোশকিসমতির ফায়সালা করেছেন তাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, বরং যথেষ্টরও বেশী। আজ যা কিছু শুনলে তা থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করো এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো; চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত কিংবা থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলে এক শরীফ ইনসানের মত যাও, আর থাকার সিদ্ধান্ত হলে এক শরীফ ইনসানের মত, সাহসী পুরুষের মত এবং ইলমের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এক তালিবে ইলমের মত থাকো। আল্লাহ সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

ইখলাছ ও ইখতিছাছ (বিশেষজ্ঞতা)

১৯৬৭ সালের ২৮শে জানুয়ারী, দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার শিক্ষাবর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নাদাবী (রহ) এর মূল্যবান ভাষণ। তাঁর মূল বক্তব্য ছিলো–

দু'টি জিনিস মানুষকে যোগ্যতা ও পূর্ণতা দান করে এবং যুগ ও সমাজের কাছে তার প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতার স্বীকৃতি আদায় করে। একটি হলো ইখলাছ ও একনিষ্ঠা, অন্যটি হলো কোন বিষয়ের ইখতিছাছ ও বিশেষজ্ঞতা। কিন্তু এদু'টি গুণ আমাদের মাঝে দিন দিন দুর্লভ থেকে দুর্লভতর হয়ে চলেছে। সুতরাং আমরা যদি দ্বীনের জিহাদে এবং জীবনের সংগ্রামে জয়ী হতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে ইখলাছ ও একনিষ্ঠার গুণ অর্জন করতে হবে, সেই সাথে যে কোন বিষয়ে ইখতিছাছ ও বিশেষজ্ঞতা অর্জন করতে হবে।

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম!

আমাদের নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হতে চলেছে। আপনাদের অনেকে দুই তিন বছর, এমনকি সাত আট বছর এখানে তলবে ইলমের মোজাহাদায় এবং জ্ঞান চর্চার সাধনায় নিয়োজিত রয়েছেন। আবার কারো কারো জন্য এটাই হলো শিক্ষা জীবনের প্রথম বর্ষ। তবে কল্যাণজনক এটাই যে, নতুন-পুরাতন সবাই আপনারা নিজেদেরকে নতুন তালিবে ইলম মনে করুন। নতুন ভাবে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করুন। নতুন জাযবা ও প্রেরণা এবং ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করুন। মাদরাসার খোলা ও বন্ধ, শিক্ষা বর্ষের শুরু ও সমাপ্তি, তালিবানে ইলমের আগমন এবং উপদেশমূলক বক্তৃতা ও উদ্বোধনী ভাষণের আয়োজন – এ সবেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন চেতনা ও প্রেরণা সৃষ্টি করা। এটা খুবই কার্যকর ও ফলদায়ক বিষয়।

নতুন-পুরাতন সকল তালিবানে ইলমকে আজ ভাবতে হবে যে, আমরা আমাদের 'জীবন-পুস্তকের' নতুন পাতা শুরু করতে যাচ্ছি। শব্দটি আবার লক্ষ্য করুন; পাঠ্য-পুস্তকের পাতা নয়, জীবন-পুস্তকের পাতা।

প্রকৃতপক্ষে আপনারা চড়াই-উৎরাইপূর্ণ এক দীর্ঘ সফরে রওয়ানা হয়ে পড়েছেন। সুতরাং আপনাদের অবশ্যকর্তব্য হলো, যারা আপনাদের শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক, যারা আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ও কল্যাণকামী তাদের কাছে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রার্থনা করা, সফরের চড়াই-উৎরাই ও বাধা-প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে জেনে নেয়া। এটা আপনাদের প্রাপ্য অধিকার। মানুষ তো সাধারণ কোন সফরে বের হলেও বড়দের উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করে এবং বড়রাও প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে তাকে সাহায্য করেন। মানুষের ভালো-মন্দ ও সফলতা-ব্যর্থতা শুধু লাভ-ক্ষতির অনুভূতির উপর নির্ভর করে। এ অনুভূতি ছাড়া মানবতার কল্যাণের আশা শুধুই দুরাশা। তাই মানুষের হৃদয়ে সদাক্রিয়াশীল লাভ-ক্ষতির এই অনুভূতিকেই মানবতার দরদীগণ, এমনকি আম্বিয়ায়ে কেরামও তাঁদের দাওয়াত ও পায়গামের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। মানুষকে লাভের আশা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং ক্ষতির ভয় দিয়ে নিবৃত্ত করেছেন। দুনিয়ার সমস্ত উন্নতি-অগ্রগতি এই লাভ-ক্ষতির অনুভূতির উপরই নির্ভরশীল। এরই ভিত্তিতে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক অস্তিত্বশীল। ক্রেতার

সাথে বিক্রেতার সম্পর্ক, শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ক, এমনকি পিতার সাথে পুত্রের সম্পর্ক – সবকিছু এই লাভ-ক্ষতির অনুভূতিতেই সীমাবদ্ধ।

এই দ্বীনী মাদরাসার পরিমণ্ডলে আপনাদের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক তাও লাভেরই প্রত্যাশার কারণে। আপনারাও লাভের সন্ধানেই এখানে এসেছেন। মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন ও ঘর-বাড়ীর মায়া ত্যাগ করেছেন।

প্রিয় বন্ধুগণ! শিক্ষাবর্ষ উদ্বোধনের এবং জীবন-গ্রন্থের নতুন পাঠ গ্রহণের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে বলার কথা তো অনেকই আছে, কিন্তু সবকিছু বিশদভাবে আলোচনার এখন অবকাশ নেই। সুতরাং বিশেষভাবে শুধু একটা কথাই শুনুন এবং এই কান দিয়ে নয়, বরং দিলের কান দিয়ে শুনুন। কেননা তাতে আপনাদেরই লাভ। কথা এই যে, এত ত্যাগ স্বীকার করে, এত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে যখন এসেছেন তখন ভালো হওয়ার এবং উন্নত হওয়ার চেষ্টা করুন। জীবনের নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে কামিয়াব ও সফল হওয়ার চেষ্টা করুন। যদি সম্ভব হতো তাহলে কথার পরিবর্তে আমি আমার দিল-কলিজা বের করে আপনাদের সামনে রেখে দিতাম এবং হৃদয়ের আকুতি ও ব্যাকুলতা তুলে ধরতাম। কিন্তু তা সম্ভব নয়, কারণ ভাব প্রকাশের জন্য শব্দকেই আল্লাহ মাধ্যম বানিয়েছেন। স্বয়ং আল্লাহর কালাম কোরআনই এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। তাই হৃদয়ের ভাব ও ভাবনা এবং হৃদয়ের জ্বালা ও যন্ত্রণা শব্দের মাধ্যমেই আমাকে প্রকাশ করতে হবে।

আমাকে যদি তোমরা বলার সুযোগ দাও তাহলে বারবার আমি একথাই বলবো যে, সাধনা ও পরিশ্রম দ্বারা যুগের জন্য, সমাজের জন্য, দ্বীনের জন্য এবং উম্মতের জন্য মূল্যবান থেকে মূল্যবান সম্পদ হওয়ার চেষ্টা করো। বস্তুত উন্নতি ও পূর্ণতা লাভের এই জাযবা ও প্রেরণাই হলো মানুষের স্বভাব ও ফিতরাত। এটা যদি মানুষের মাঝে না থাকে তাহলে তো সে পশুর পর্যায়ে নেমে আসে। আর এটা আছে বলেই মানুষ পশুর নীচতা থেকে ফিরেশতার উচ্চতায় পৌঁছে যায়, এমনকি ফিরেশতাকেও ছাড়িয়ে যায়।

তোমরা হীরকখণ্ড

প্রিয় বন্ধুগণ! মনে করো এক ব্যক্তি গুপ্ত ধন পেয়ে গেলো এবং জহুরীকে তার মূল্য জিজ্ঞাসা করলো। জহুরী দেখে শুনে, পরীক্ষা করে বললো–

এ অতি মূল্যবান হীরা। তবে তিনটি শর্ত। প্রথমতঃ এটাকে দক্ষ হাতে কাটতে হবে এবং পালিশ করে তাতে ঔজ্জ্বল্য আনতে হবে। অন্যথায় এটা মূল্যহীন পাথর ছাড়া কিছুই নয়।

দ্বিতীয়তঃ খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হবে। কেননা এটা এত নাযুক যে, সামান্য অসাবধানতায় তাতে সামান্য আঁচড়ও যদি লাগে তাহলে তা বেকার হয়ে যাবে।

তৃতীয়তঃ একবার যদি আঁচড় লেগে বেকার হয়ে যায় তাহলে কখনো তার সংশোধন ও সংস্কার সম্ভব নয়।

এখন যুক্তি ও বুদ্ধির দাবী এই যে, যার হাতে এই মূল্যবান হীরা এসেছে সে অবশ্যই পূর্ণ সাবধান ও যত্নবান হবে এবং বাজারের সেরা জহুরীকে দিয়ে চূড়ান্ত সতর্কতার সাথে হীরকখণ্ডকে কাটার ও পালিশ করার ব্যবস্থা করবে। এরপর নিলামের বাজারে সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করবে।

প্রিয় বন্ধুগণ!

আমি আল্লাহর ঘরে মসজিদের মিম্বারের পাশে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, তোমাদের হাতে আছে সেই হীরকখণ্ড। তোমাদের প্রত্যেকে তেমন একেকটি হীরকখণ্ডের অধিকারী। আর তা হলো তোমাদের জীবনের সুপ্ত যোগ্যতা। শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা, আনুগত্যের যোগ্যতা এবং উত্তম থেকে উত্তম হওয়ার যোগ্যতা। মানবের এ সকল সুপ্ত যোগ্যতার কারণেই তো ফিরেশতাগণ তাকে ঈর্ষা করেন। এগুলোকে কাজে লাগিয়ে খুব সহজেই তোমরা ঐ স্তরে উপনীত হতে পারো যার সম্পর্কে হাদীছ শরীফে এসেছে–

ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر

'যা কোন চক্ষু অবলোকন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি, এমনকি কোন মানব হৃদয়ে যার চিন্তাও উদিত হয়নি।'

এ সকল যোগ্যতার বদৌলতে তোমরা অলীয়ে কামেল হতে পারো, হতে পারো আল্লাহর প্রিয় বান্দা। যেমন কবি বলেছেন–

نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

'মরদে মুমিনের এক নযরে বদলে যায় তাকদীর।'

তোমরা কী না হতে পারো!

তোমরা তো এমন হতে পারো যে, শুধু তোমাদের শহর নয়, বরং পুরা উম্মত ও মিল্লাতের তাকদীর বদলে যেতে পারে তোমাদের উছিলায়। তোমরা তো হতে পারো এমন পরশপাথর যে, খোদাদ্রোহী নাস্তিকও যদি তোমাদের সংস্পর্শে আসে তাহলে মুহূর্তে সে আল্লাহর অলী হয়ে যাবে। যে লোকালয়ে তোমরা যাবে সেখানে মানবতার বসন্তের বাহার বয়ে যাবে। সেখানকার প্রকৃতি

ও পরিবেশ পাল্টে যাবে। এই পরশ-ক্রিয়া আজও তোমাদের মাঝে সৃষ্টি হতে পারে যদি ভিতরের যোগ্যতাকে জাগ্রত করো এবং পূর্ণরূপে ব্যবহার করো। তোমাদের কল্যাণে আল্লাহ্ জানেন কত বড় বড় জনপদ জান্নাতের পথে আগুয়ান হতে পারে!

কোন সন্দেহ নেই যে, নবুয়ত খতম হয়ে গেছে। কিন্তু তোমরা তো পৃথিবীতে 'আল্লাহর নিদর্শন' হতে পারো, হুজ্জাতুল ইসলাম ও শায়খুল ইসলাম হতে পারো। সবচে' বড় কথা, তোমরা ওয়ারিছে নবী ও নায়েবে রাসূল হতে পারো। তবে শর্ত এই যে, তোমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে; ত্যাগ ও কোরবানির প্রতিজ্ঞা, সাধনা ও মোজাহাদার প্রতিজ্ঞা এবং আত্মশুদ্ধির প্রতিজ্ঞা। কেননা তোমরা তো এসেছো আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ করার জন্য। সুতরাং তোমরা যদি উন্নতি ও পূর্ণতা লাভের এবং কামিয়াবি ও সফলতা অর্জনের ফয়সালা করো তাহলে বিশ্ব-জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু তোমাদের সাহায্য করবে। বিশ্ব-জগতের পুরা গায়বী নেযাম তোমাদের জন্য নিবেদিত হবে। এমনকি সাগরের তলদেশের মাছেরাও তোমাদের জন্য দু'আ করবে। হাদীছ শরীফের বাণী এর প্রমাণ।

আমি তোমাদের কাছে জানতে চাই, মানব সমাজে এমন হতভাগা কে আছে যে নিজের উন্নতি ও সফলতা চায় না! প্রাণহীন পাথরও তো উন্নতির আহবান অস্বীকার করে না। বিশ্ব-জগতের প্রতিটি কণা উন্নতির প্রত্যাশী ও প্রয়াসী। মাটিতে ফেলে দেয়া একটি বীজ উন্নতির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে করে এক সময় পূর্ণ বৃক্ষে পরিণত হয় এবং ফলবতী হয়ে উন্নতির চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হয়।

জগতের উন্নতি জগতেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু প্রিয় বন্ধুগণ! তোমাদের জীবন-সফরের ক্রমোন্নতি মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকবে। অবশেষে দীদারে ইলাহীর মাধ্যমে তোমাদের আত্মিক উচ্চাভিলাষ পরিতৃপ্তি লাভ করবে এবং সেটাই হবে তোমাদের চিরস্থায়ী মঞ্জিল।

তোমাদের প্রথম কর্তব্য এই যে, পরম সম্ভাবনাময় একটি ক্ষুদ্র বীজ মনে করে নিজেকে 'মাটির সাথে' মিশিয়ে দাও এবং হৃদয়ের গভীরে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পোষণ করো যে, উন্নতির সকল স্তর আমাকে অতিক্রম করতে হবে এবং সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়ে দীদারে ইলাহীর সৌভাগ্য লাভ করতে হবে। আমাকে ভালো হতেই হবে। পূর্ণতার স্বাদ আমাকে পেতেই হবে। কবি বড় সুন্দর বলেছেন—

اپنے من میں ڈوب کر پا جاسراغ زندگی
تواگر میرا نہیں بنتا، نہ بن، اپنا تو بن

'আপন হৃদয়-সাগরে ডুব দিয়ে তুমি আত্মসমাহিত হও এবং জীবনের সার্থকতা লাভ করো/ তুমি আমার যদি না হবে না হও, নিজের তো হও। নিজেকে কেন নিজের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করো?'

কবির সুরে সুর মিলিয়ে আমিও বলি–

তোমরা যদি আসাতেযা কেরামের জন্য নিবেদিত না হতে পারো, তোমাদের দরদী ও কল্যাণকামীদের জন্য উৎসর্গিত না হতে পারো, না হও। কিন্তু নিজের উপর তো দয়া করো! নিজের হক তো আদায় করো! নিজের লাভ-ক্ষতি তো বুঝতে চেষ্টা করো!

প্রিয় বন্ধুগণ! আমি তোমাদেরকে বারবার একথাই বলবো যে, উত্তম থেকে উত্তম এবং সুন্দর থেকে সুন্দর হওয়ার চেষ্টা করো। কেননা বিশ্বজগতের সবকিছু সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মানুষকে আল্লাহ সর্বোত্তম ও সর্বসুন্দর হওয়ার জন্যই সৃষ্টি করেছেন এবং তার স্রষ্টা তার কাছে সে দাবীই জানিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে–

هو الذي خلق كل شيء ثم هدى

তিনিই সেই সত্তা যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন।

প্রিয় বন্ধুগণ! আজ এখানে হৃদয়ের কাগজে ঈমানের কালি দিয়ে এই মহাপ্রতিজ্ঞা লিখে নাও, আমাকে উত্তম থেকে উত্তম হতে হবে এবং এজন্য যত ত্যাগ ও কোরবানি, যত সাধনা ও মোজাহাদা প্রয়োজন তা করতে হবে, করতেই হবে। এটা তোমার কাছে আমার দাবী নয়, তোমার কাছে তোমারই আত্মার দাবী। বরং আমি তো বলতে চাই যে, এটা হলো তোমার কাছে তোমার স্রষ্টার দাবী। তুমি ভালো হও, দামী হও, স্মরণীয় হও, বরণীয় হও, তোমার স্রষ্টা এজন্যই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

এই জাযবা ও প্রেরণা যার মাঝে নেই, ইলমের বীজ গ্রহণের ইচ্ছা যার মাঝে নেই সে তালিবে ইলমই নয়। সে হলো অনুর্বর নষ্ট মাটি, বীজ যেখানে তার সমস্ত সম্ভাবনাসহ নষ্ট হয়ে যায়।

কোন অবস্থাতেই আমি একথা মানতে রাজী নই যে, তোমাদের মাঝে ভালো হওয়ার এবং ভালো করার যোগ্যতা নেই। এটা তো মানুষের স্বভাবজাত এক সত্য প্রেরণা, আসমানী শরীয়ত ও আসমানী কিতাব যা অনুমোদন করেছে,

এমনকি উৎসাহিতও করেছে। মানুষের বুলন্দ হিম্মত ও উচ্চ মনোবলের কাছে অসাধ্য কী আছে! খোদায়ী ও নবুয়ত ছাড়া আর কোন স্তরই মানবের সাধ্যাতীত নয়।

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম!

তোমাদের সামনে এখন দুটি রাস্তা রয়েছে। এক তো এই যে, তোমরা এখানে দাখেল হলে এবং লেখা-পড়া করে ফারেগ হয়ে চলে গেলে। ভালো হওয়ার, পূর্ণতা লাভের এবং যোগ্যতা অর্জনের কোন চেষ্টা বা ইচ্ছাই করলে না।

দ্বিতীয় এই যে, এখানকার সুযোগ-সুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে নিজেকে উত্তম থেকে উত্তম রূপে গড়ে তোলার চেষ্টা-সাধনায় নিয়োজিত হলে। ইলমী ও বুদ্ধিবৃত্তিক এবং রূহানী ও আধ্যাত্মিক সর্বক্ষেত্রে পূর্ণতা অর্জন করে নিজের দেশে, নিজের সমাজে ফিরে গেলে।

উভয় পথ তোমাদের জন্য খোলা। তবে উন্নতির পথে এখানে কোন বাধা নেই। এখান থেকে যাওয়ার পর কোন তালিবে ইলমের একথা বলার হক নেই যে, আমি ভালো হতে চেয়েছিলাম, যোগ্যতা অর্জন করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু নদওয়াতে সে সুযোগ ছিলো না।

শুধু নাদওয়া কেন! দেওবন্দ, মাযাহেরুল উলূম কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কেই একথা বলার অবকাশ নেই।

সাধনা ছাড়া কিছু হয় না

ইতিহাস ও জীবনচরিত হলো আমার গবেষণার বিষয়। আমি আমার সুদীর্ঘ অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে বলছি, কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কোন গ্রন্থাগার মানুষ তৈরী করে না, বরং নিজের যোগ্যতা এবং চেষ্টা-সাধনা ও মেহনত-মোজাহাদার মাধ্যমে মানুষ নিজেই গড়ে ওঠে এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আধ্যাত্মিকতার জগতে দেখুন, বড় বড় সাধক পুরুষরূপে যারা জগতব্যাপী খ্যাতি লাভ করেছেন তাদের অভিভাবক ও মুরুব্বী বিশেষ কোন অলী-বুযুর্গ ছিলেন না। পরিবার ও পরিবেশও তেমন অনুকূল ছিলো না। শুধু পিপাসা ও ব্যাকুলতা, চেতনা ও প্রেরণা এবং ত্যাগ ও সাধনা দ্বারা রূহানিয়াত ও আধ্যাত্মিকতার এতো উচ্চ মার্গে তারা উপনীত হয়েছেন। কামিল অলী-বুযুর্গ রূপে উম্মাহর ইতিহাসে স্মরণীয় বরণীয় হয়েছেন। আযরের ঘরে ইবরাহীম পয়দা হওয়ার অসংখ্য উদাহরণ উম্মাহর ইতিহাসে রয়েছে।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (রাহ) এর আব্বা অলী-বুযুর্গ ছিলেন এ

কথা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু নিজের পিপাসা ও ব্যাকুলতার কারণেই তিনি হুজ্জাতুল ইসলাম হতে পেরেছিলেন।

সাইয়েদুনা শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ) এর জীবনী পড়ে দেখো, তাঁর আব্বা না আলিম ছিলেন, না বুযুর্গ। শুধু বলা যায় যে, একজন ভালো মানুষ ছিলেন। মৃত্যুর সময় এক বন্ধুকে অছিয়ত করেছিলেন পুত্রের তালিম তারবিয়াতের ব্যবস্থা করার জন্য। সেটাও তেমন কাজে আসেনি। কিন্তু হযরত জীলানীর পুণ্যবতী আম্মা চরকায় সুতা কেটে জীবন চালিয়ে পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। সেই এতীম বালক আব্দুল কাদির জীলানী এক সময় ইলমী ও রূহানী তরক্কীর এমন উচ্চ স্তরে উপনীত হয়েছিলেন যে, গোটা উম্মাহ তাঁকে ঈর্ষা ও গিবতার নজরে দেখেছে। ছোট্ট বয়সে তার বাগদাদ গমনের কাহিনী তো খুবই প্রসিদ্ধ। তা থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই? কোথায় তাঁর সফলতার রহস্য নিহিত? আর কিছু না, এ শুধু পিপাসা ও সাধনা এবং ত্যাগ ও মেহনতের কারিশমা।

শায়খ আব্দুল কাদির জীলানী (রাহ) এর জীবন, কর্ম ও কীর্তি সম্পর্কে সারা হিন্দুস্তানে নাদওয়াতুল উলামার চেয়ে বেশী গ্রন্থ-সংগ্রহ আর কোন কুতুবখানায় নেই। সব কিতাব আমি দেখেছি, কিন্তু কোথাও খুঁজে পাইনি যে, তাঁর আব্বা আলিম ছিলেন কিংবা গণ্যমান্য কেউ ছিলেন। উন্নতি ও সফলতা মৌরুসি সম্পদ নয়। যেখানেই ত্যাগ ও সাধনা সেখানেই উন্নতি ও সফলতা। আব্দুল কাদির জীলানীর আব্বা ও দাদা ছিলেন সাধারণ কৃষক। কিন্তু শায়খ আব্দুল কাদির জীলানী!

আবারও বলি প্রিয় বন্ধুগণ! চেষ্টা-সাধনা, চেতনা ও প্রেরণা এবং হিম্মত ও উচ্চ মনোবলই সবকিছুর ভিত্তি। কবির ভাষায় এ পথের শ্লোগান হবে–

یا تن رسد به جاناں یا جاں زتن برآید

'হয় প্রিয়তমের সঙ্গে মিলন, কিংবা বিসর্জন তুচ্ছ এ জীবন।'

একটি কবিতা-পংক্তি আমার খুব প্রিয়। প্রায় আমি আবৃত্তি করি। তাতে আমার হৃদয়-মন ভাবে ও অনুভবে আপ্লুত হয়ে ওঠে। ইচ্ছে হয়, কোন সুহস্তলিপিকার দিয়ে লিখিয়ে তা ঝুলিয়ে রাখি। হযরত মুফতি ছদরুদ্দীন আযুরদাহ-এর সেই কবিতা পংক্তি এই–

اے دل تمام نفع ھے سودائے عشق میں

اك جان كا زياں ھے سو ايسا زياں نهيں

'শোন হৃদয় আমার! লাভ যত সে তো ইশক ও প্রেমের সওদাতে, ক্ষতি শুধু এই তুচ্ছ প্রাণের, তা এমন কী ক্ষতি! '

ইশক ও প্রেমের পথে জীবন চলে যাওয়া তেমন কিছু নয়! কোন শক্তি তাঁকে এত বড় কথা বলতে সাহসী করেছে। আসলে কবির হৃদয়ে ছিলো ইশকে ইলাহী ও আল্লাহ-প্রেমের স্ফুলিঙ্গ। তাঁর চিত্ত ছিলো চিরব্যাকুল, চিরঅস্থির। তাই প্রাণদাতার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করা তাঁর জন্য ছিলো সহজ। ইলম সাধনার পথে যদি প্রাণও বিসর্জন দিতে হয় তবে প্রাপ্তির তুলনায় তা অতি তুচ্ছ বিসর্জন।

হযরত মাখদূম বিহারীর ঘটনা পড়ো। দ্বীন শিক্ষার জন্য ঘর ছেড়ে বের হওয়ার পর, মুর্দা মানুষ যেমন দুনিয়া থেকে বে-খবর হয়ে যায় তিনিও তেমনি বে-খবর হয়ে গেলেন। চিঠি-পত্র আসে, আর তিনি তা বাক্সে ফেলে রাখেন। কেননা তিনি ভেবেছিলেন যে, এগুলো তালিম থেকে গাফিল করে, তাই এগুলো থেকেই আমাকে গাফিল হতে হবে।

তিনি তাই করলেন। সব কিছু থেকে গাফিল হয়ে ইলমের সাধনায় মশগুল হলেন। তালিম থেকে ফারিগ হয়ে আবার যখন 'দুনিয়ার জীবনে' ফিরে এলেন তখন একদিন চিঠির বাক্স খুলে বসলেন, কোন চিঠিতে সুখের সংবাদ, তাতে তাঁর মুখে হাসি ফোটে। আবার কোন চিঠিতে শোকের সংবাদ, তাতে তাঁর চোখে পানি আসে। এটা কিন্তু গল্প নয়, সত্য ঘটনা এবং তাঁর মত আরো অনেকের জীবনের ঘটনা। সুতরাং তুমি এমন না হতে পারো, এর সামান্যতমও কেন হতে পারবে না! আর হতে যদি না পারো তাহলে কেন এসেছো এ পথে! এ তো হলো 'ত্যাগের পর ভোগের' পথ!

মুদ্রার আরেক পিঠ দেখো, আব্বা তো বিরাট আলিম, বিরাট অলি-বুযুর্গ, কিন্তু ছাহেবজাদা হলেন 'ফুলবাবু'। না আছে তলব, না আছে তড়প। তাই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ও আনুকূল্য সত্ত্বেও তার ভাগ্যে ইলম থেকে মাহরূমী ছাড়া কিছুই জোটে না। এধরনের উদাহরণ এ যুগেও আছে। বড় বড় আলিম বুযুর্গানের সন্তান, অথচ একেবারে অপদার্থ। এখানে তো কিছু হওয়া যায় মেহনত ও সাধনার পর, ত্যাগ ও কোরবানির পর এবং ইলমের পথে নিজেকে বিলিয়ে ও মিটিয়ে দেয়ার পর–

رنگ لاتی ہے حنا پتھر سے گھس جانے کے بعد

'মেহেদীর রং ধরে পাথরের ঘষায় পিষে যাওয়ার পর'

(ইলমের পথে, রূহানিয়াতের পথে) মানুষ কিছু ত্যাগ না করে কিছু লাভ করতে পারে না। হযরত ইমাম মালিক তো আরো শক্ত কথা বলে গেছেন–

العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك

'ইলম এতো গায়রতওয়ালা যে, তুমি তাকে তোমার সবটুকু না দিলে সে তোমাকে তার সামান্যটুকুও দেবে না।'

বন্ধুগণ! আপনার সামনে দু'টি ছুরত বলা হলো। একদিকে ফাসিক ফাজিরের কিংবা সাধারণ মানুষের সন্তান নিজের চেষ্টা মেহনতে, নিজের পিপাসা ও ব্যাকুলতায় অলিয়ে কামিল এবং যুগের সেরা আলিম হয়ে যায়। অন্যদিকে বড় বড় আলিম ও অলি-বুযুর্গের সন্তান জাহেল-অপদার্থ থেকে যায়। কেননা সাধনা ও মোজাহাদার পথে সে কদম রাখে নি এবং ত্যাগ ও কোরবানির সবক গ্রহণ করেনি।

মনে রেখো বন্ধুগণ! অলস অপদার্থ যারা, তারাই শুধু প্রতিকূল পরিবেশের এবং বৈরী সময়ের অভিযোগের মাঝে আত্মসান্ত্বনা খোঁজে, কিন্তু সেটা হলো আত্মপ্রতারণা।

কোন অখ্যাত অজ্ঞাত মাদরাসায় সাধারণ থেকে সাধারণ উস্তাদের স্নেহ-ছায়ায় থেকেও তুমি হতে পারো আগামী দিনের হুজ্জাতুল ইসলাম ও শায়খুল ইসলাম। আবার মদীনা ইউনিভার্সিটি, কায়ারো ইউনিভার্সিটি, দেওবন্দ, সাহারানপুর ও নাদওয়ার মত বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়েও হতে পারো মাহরূম। সবকিছু নির্ভর করে তোমার ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞার উপর, তোমার সাহস ও মনোবলের উপর এবং তোমার চেতনা ও প্রেরণার উপর।

আজ এই মসজিদে আল্লাহর ঘরে প্রতিজ্ঞা করো যে, আলিম হওয়ার জন্য এবং ভালো মানুষ হওয়ার জন্য যা কিছু করণীয় ইনশাআল্লাহ তা আমরা করবো। যে কোন পরিবেশে এবং যে কোন পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে অবিচল থাকবো।

নিজেদের মূল্য বুঝতে শেখো

তোমাদের যদি বলা হয় যে, ঐ পাহাড়ে হীরার খনি আছে, তাহলে অবশ্যই তোমরা তা লাভ করার জন্য যে কোন কষ্ট স্বীকার করতে তৈরী হয়ে যাবে। পাহাড়ের চূড়ায় চড়ার কষ্টকে কষ্টই মনে হবে না। কিন্তু আমি বলতে চাই, তোমাদের কাছেই রয়েছে এমন মহামূল্যবান হীরা যার দাম সারা বিশ্বের ধনভাণ্ডার আদায় করতে পারবে না। দুনিয়ার সমস্ত সালতানাত একত্র হয়েও তোমাদের খরিদ করতে পারবে না। বড় বড় আকাবিরে উম্মত ও বুযুরগানে দ্বীন বারবার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, আমাদের মূল্য আদায় করার সাধ্য কোন মানুষের নেই, কোন রাজভাণ্ডারের নেই। আমাদের মূল্য আদায় করতে

পারেন একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তোমরাও পূর্ণ আল্লাহ-নির্ভরতার সাথে দাবী করতে পারো যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ আমাকে খরিদ করতে পারে না। ভাই! আমরা তো মন্ত্রীদের সাথে দেখা করাকে খোদ মন্ত্রীদের জন্য গৌরবের বিষয় মনে করি। তোমাদের এই মজলিসে এমন সব ব্যক্তি রয়েছেন যারা 'সময় নেই বলে' স্বয়ং ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে সাক্ষাৎ দিতে অস্বীকার করেছেন।

আমার প্রিয় বন্ধুগণ! তোমরা নিজেদের মূল্য বুঝতে শেখো। তোমাদের ভবিষ্যতের যিম্মাদার তো স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তবে শর্ত এই যে, তোমরা হীরাকে হীরারূপে গ্রহণ করো। পাথর একবার নয়, কয়েকবার ভাঙ্গতে পারে, আবার তৈরী হতে পারে, কাঁচও ভাঙ্গতে পারে, আবার তৈরী হতে পারে। কিন্তু হীরা শুধু একবারই তৈরী হয়। ভেঙ্গে গিয়ে, কিংবা আঁচড় খেয়ে দ্বিতীয়বার তৈরী হতে পারে না।

তোমরা যদি ভালো হতে চাও, নিজেদের গড়ে তুলতে চাও তাহলে কেউ তোমাদের বাধা দিয়ে রাখতে পারে না। আর যদি ভালো হতে না চাও তাহলে আল্লাহর কুদরত ছাড়া কেউ তোমাদের ভালো বানাতে পারবে না। আমি তো বলি যে, তোমরা শুধু খোদা, কিংবা নবী হতে পারো না, আর সব কিছু হতে পারো। কার কল্পনায় ছিলো যে, হিন্দুস্তানে মাওলানা ইলয়াস এবং মাওলানা ইউসুফ (রাহ) এর মত ব্যক্তি পয়দা হবে। কে জানতো যে, এতো বড় বড় আলিম ও বুযুর্গানে দ্বীন এই ভারতভূমিতে জন্মলাভ করবেন? এ ধারা তো এখনো অব্যাহত রয়েছে। তোমরা শুধু একবার প্রতিজ্ঞা করো এবং ত্যাগ ও কোরবানির পথে অগ্রসর হও, দেখবে দুনিয়ার সমস্ত শক্তি তোমাদের অনুগত ও বশীভূত হবে। আজো সেই চিরন্তন বাণী বিদ্যমান রয়েছে–

ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون

শোনো আল্লাহর প্রিয় বান্দা যারা তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

তাহলে তোমাদের চিন্তা কিসের, ভয় ও ভাবনা কিসের? স্বয়ং আল্লাহ যেখানে অভয় দিচ্ছেন! তবে এজন্য দু'টি গুণ অপরিহার্য। প্রথমত ইখলাছ তথা আল্লাহর প্রতি আত্মনিবেদন। দ্বিতীয়ত ইখতিছাছ তথা যে কোন বিষয়ে বিশিষ্টতা ও বিশেষজ্ঞতা অর্জন। এ দু'টি গুণ তোমার উত্তম থেকে উত্তম হওয়ার জন্য যথেষ্ট। সারা দুনিয়ার কথা মিথ্যা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা সত্য।

অবশেষে আমি মাননীয় আসাতিযায়ে কেরামের খেদমতে আরয করবো,

আপনারা এই তালিবানে ইলমের কদর করুন এবং তাদের সাহায্য করুন। এই উম্মতের অসংখ্য হীরকখণ্ড আপনাদের কাছে, আপনাদের আমানতে এসে পড়েছে। এরা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত নেয়ামত ও দওলত। হীরকখণ্ড ফেলে কোথায় কোথায় ঘুরে মরবেন পাথরের সন্ধানে, কোথায় কোথায় অপচয় করবেন নিজেদের আল্লাহ্ প্রদত্ত যোগ্যতা ও প্রতিভার!

কষ্টের শেকায়াত করো না

আমাদের পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের জীবনী পড়ে দেখো, ইলমের জন্য তারা কী পরিমাণ কষ্ট করেছেন! ইতিহাস আমাদেরকে এমন ঘটনাও শুনিয়েছে যে, যখন খাওয়ার মত কিছু জুটেনি তখন তরমুজের খোসা ধুয়ে সিদ্ধ করে খেয়েছেন। নতীজা ও সুফলও তেমনি লাভ করেছেন।

আমি এমন মাদরাসায়ও পড়েছি যেখানে রুটি-তরকারীর মান ছিলো খুবই নিম্ন ও বিস্বাদ, খেতে কষ্ট হতো, গলা দিয়ে নামতো না, কিন্তু আমরা তার পরোয়া করি নি, যা জুটেছে তাতেই তুষ্ট থেকে নিজেদের চেষ্টাতে নিয়োজিত ছিলাম। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি সচেতন ছিলাম। আজ যা কিছু দেখা যায় তা সে সবেরই বরকত।

ভাই, তোমরা মাদরাসার শেকায়াত করো না। ব্যবস্থাপনার অভিযোগ করো না। যতটুকু আরাম ও সুবিধা পেয়েছো তার জন্য শোকর করো, আর যা কিছু কষ্ট ভোগ করছো তার উপর ছবর করো। এটাই ইলম হাছিল হওয়ার পথ। যারা শেকায়াত করে তাদের কিসমতে মাহরূমী ছাড়া আর কিছু নেই।

আমরা স্বীকার করি, এখানের সব কিছু অপর্যাপ্ত, সবকিছু সীমাবদ্ধ। অনাহারে বা অর্ধাহারেও যদি থাকতে হয়, অযু-গোসলের কষ্টও যদি করতে হয় তবু ছবর-শোকরের সাথে থাকো, যদি কিছু পেতে চাও, যদি কিছু হতে চাও।

সব শেষে আমি আবার বলবো, তোমরা ভালো হওয়ার চেষ্টা করো। সর্বোত্তম ইনসান রূপে নিজেকে গড়ে তোলার সাধনা করো। সুখ-সুবিধার পরোয়া করো না। এখানে তোমাদের থাকতে হবে কৃতজ্ঞতার সাথে, কৃতার্থতার সাথে, ছবর ও শোকরের সাথে, তখন সমস্ত জগত তোমাদের অনুগত হবে। বিশ্ব-জাহানের গায়বী নেযাম তোমাদের খেদমতে নিয়োজিত হবে। আল-কোরআনের খোশখবর শোনো—

ان الذين امنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا

'নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করে রাহমান তাদের

প্রতি ভালোবাসা দান করবেন।'

ভালোবাসার অনিবার্য ফল হলো সেবা ও আনুগত্য। তোমরা যখন আল্লাহর প্রিয় হবে তখন তোমাদের কোন প্রয়োজন থাকবে না। তখন তোমরা আসবাবের অনুগত হবে না, আসবাবই তোমাদের অনুগত হবে।

আল্লাহ তোমাদের তাওফীক দান করুন। কেননা তাঁর তাওফীকের উপরই সবকিছু নির্ভর করে।

অধ্যয়ন ঃ গুরুত্ব ও সঠিক পন্থা

দারুল উলূম নাদওয়াতুল ওলামার শায়খুত্তাফসীর মাওলানা মুহাম্মদ উয়াইস নাগরামীর উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বক্তৃতার একটা সিলসিলা শুরু হয়েছিলো ১৯৬৭-এর মে মাসে। এখানে পত্রস্থ বক্তৃতার মাধ্যমে হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নাদাবী (রহ) এই সিলসিলার শুভ উদ্বোধন করেছিলেন।

হযরত মাওলানা তাঁর বক্তৃতায় পাঠ্যবিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও জ্ঞান অর্জন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এবং তার উপায় পন্থাও বলেছেন।

হামদ ও ছালাতের পর হযরত মাওলানা এভাবে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন।

পাঠ্যব্যবস্থার কর্মপরিধি

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যসূচী বা নিছাবে তা'লীমের একটি জটিল বিষয় এই যে, বহুমুখী গুণ ও বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও এই পাঠ্যসূচী জীবনের অন্য সকল প্রয়োজন পূর্ণ করে না। দায়িত্বশীল ও বাস্তববাদী কোন ব্যক্তি একথা বলতে পারেন না যে, আমাদের শিক্ষার পাঠ্যসূচী জীবনের সকল প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীন ও পূর্ণাঙ্গ। এমনকি আমাদের নিছাবে তালীম নিজেও কখনো এ দায় ও দায়িত্ব দাবী করে না।

প্রকৃতপক্ষে নিছাবে তালীম শুধু এমন এক বিশেষ যোগ্যতার নিশ্চয়তা দান করে যা জীবনের পদে পদে শিক্ষার্থীর জন্য পথপ্রদর্শক ও দিকনির্দেশকের ভূমিকা পালন করতে পারে। একটি সফল নিছাবে তালিম তার শিক্ষার্থীকে শুধু যোগ্যতার একটি স্তরে উন্নীত করে যাতে সে গ্রন্থসম্ভার ও জ্ঞানভাণ্ডার থেকে কল্যাণজনক ফল ও সিদ্ধান্ত আহরণ করতে পারে। জীবনের সকল দাবী ও চাহিদা এবং আয়োজন ও প্রয়োজন নিশ্চিত করা নিছাবে তালীমের দায়-দায়িত্ব হতে পারে না। আমাদের কাদীম নিছাবে তালীম ও পুরোনো পাঠ্যসূচী কখনো পূর্ণাঙ্গতা ও সর্বাঙ্গীনতার অবাস্তব দাবী করেনি। যদিও তার গঠনপ্রকৃতির মাঝে 'মালাকা' ও যোগ্যতা সৃষ্টির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে তবু এ দাবী সে কখনো করেনি যে, জীবনের প্রতি পদে ও প্রতি ক্ষেত্রে মানুষকে সে পথনির্দেশ প্রদান করবে।

জ্ঞানরুচিই হলো সমাধান

তা'লীম ও শিক্ষাবিশেষজ্ঞদের সামনে এ প্রশ্ন এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন শিক্ষার্থীকে নিছাব ও পাঠ্যসূচীর বাইরে কী, কী উপাদান সরবরাহ করা যায় যাতে সে তার জীবনের, তার সামাজিক অবস্থানের এবং তার উপর অর্পিত দায়িত্বের দাবী ও চাহিদা পূরণ করতে পারে এবং এই দাবী ও চাহিদা পূরণের সহায়ক পরিবেশ ও পরিমণ্ডলের সাথে সঠিক সংযোগ তৈরী করতে পারে?

এ বিষয়টি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্যই জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ সমস্যার একটি সমাধান তো এই হতে পারে যে, শিক্ষার্থীদের জন্য

কুতুবখানা ও গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা হলো এবং শিক্ষকবৃন্দ ব্যাপক ও সুবিস্তৃত অধ্যয়নের ব্যাপারে ছাত্রদের তত্ত্বাবধান করলেন, যাতে যুগ ও সমাজ থেকে এবং জীবনের চলমান কাফেলা থেকে তারা পিছিয়ে না পড়ে। এভাবে একেকটি কিতাবের পূর্ণাঙ্গ মুতালাআ ও অধ্যয়ন যখন সম্পন্ন হবে তখন জীবনের সাথে অপরিচয় ও দূরত্ব কমে আসবে।

আরেকটি সমাধান এই হতে পারে যে, বিভিন্ন উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের জন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, জ্ঞানী, গুণী ও বিদগ্ধজনদের সান্নিধ্য লাভের ব্যবস্থা করা হলো, যারা ছাত্রদের সামনে জ্ঞানের নতুন নতুন দিগন্ত এবং নতুন নতুন সত্য উপস্থাপন করবেন এবং প্রাচীন জ্ঞান ও শাস্ত্রের পাশাপাশি আধুনিক জ্ঞান ও শাস্ত্রের সাথেও ছাত্রদেরকে পরিচিত করবেন। আমাদের দেশেও এখন এ পদ্ধতির প্রয়োগ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে। আলীগড় মুসলিম বিশ্ব-বিদ্যালয়, জামেয়া মিল্লিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে এ পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে এটা খুবই কল্যাণপ্রসূ ও প্রশংসনীয় বিষয় যে, বিভিন্ন জ্ঞান ও শাস্ত্রের বিশিষ্ট ও বিদগ্ধ ব্যক্তিগণ এখানে এসে নিজেদের ভাষণ ও বক্তৃতা এবং প্রবন্ধ ও গবেষণাপত্রের মাধ্যমে তাদের চিন্তার সারনির্যাস আপনাদের সামনে পেশ করবেন আর আপনারাও তাদের মজলিসে শরীক হয়ে তাদের সান্নিধ্য দ্বারা উপকৃত হবেন। কোন জ্ঞান ও শাস্ত্রের সহজাত রুচি তখনই সৃষ্টি হয় যখন জ্ঞানী ও গুণীদের মজলিসে আসা যাওয়া হয় এবং তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরী হয়। এরপর মানুষ খুব সামান্য জ্ঞান দ্বারাও অনেক বেশী কাজ নিতে পারে। কিন্তু এই স্বভাব-যোগ্যতা ও সহজাত রুচি তখনই তৈরী হবে যখন জ্ঞানী-গুণীদের বিভিন্ন মজলিসে আপনি শরীক হবেন এবং তাদের নিকট-সান্নিধ্য লাভ করবেন। এসব কথার নিগূঢ় রহস্য শুধু তারাই উপলব্ধি করতে পারবেন যারা আল্লামা শিবলী নোমনী ও সৈয়দ সোলায়মান নাদাবী (রহঃ) এর মজলিসে শরীক হয়েছেন।

মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নাদাবী (রহঃ) আল্লামা শিবলীর মজলিসে নিয়মিত শরীক হতেন এবং তাঁর জ্ঞান সরোবর থেকে পিপাসা নিবারণ করতেন, ফলে তিনি এমন অনুভব-অনুভূতি, বোধ ও রুচি এবং মালাকা ও যোগ্যতা লাভ করেছিলেন যা খুব কম মানুষই লাভ করতে পারে।

অনুভব-অনুভূতি বা বোধ ও রুচির অর্থ এই যে, আপনার সামনে কোন কবিতা ও শ্লোক আবৃত্তি করা হলো, আর আপনি না জেনেও বলে দিতে পারলেন

যে, এটা অমুকের কবিতা। তখন বোঝা যাবে যে, আপনি সাহিত্যবোধ ও কাব্যরুচির অধিকারী হয়েছেন। এমন যেন না হয় যে, আপনার সামনে 'আনিস' ও 'দাবীর' কবিতা পড়া হলো, আর আপনি সেটাকে 'গালিব' বা 'যাওক-এর কবিতা ভেবে বসলেন। এই সূক্ষ্ম রুচিবোধ কিন্তু একদিনে হয় না এবং এমনি এমনি হয় না; বিদগ্ধ কবি-সাহিত্যিকদের দীর্ঘ দিনের 'ছোহবত' ও নিকট সান্নিধ্য দ্বারা হয়।

***

আমাদের দ্বীনী মাদরাসার শিক্ষার্থীদের জন্য এটা খুবই আফসোসের বিষয় হবে যে, আজকের এই গতির যুগে আমরা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধারণ পরিচয় থেকেও অজ্ঞ থেকে যাবো, যা সময়ের অপরিহার্য প্রয়োজন। সুতরাং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আসরেও আমাদের অংশ গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও তথ্য আহরণ করা উচিত।

আমি আহলে ইলমের সামান্য কয়েকটি মজলিসই এমন দেখেছি যাকে বলা যায় নির্ভেজাল ইলমী মজলিস। যেখানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু ইলমের আলোচনা হতো। মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নাদাবী, শাহ হালীম আতা এবং আল্লামা ইকবালের মজলিস। অবশ্য আল্লামা ইকবালকে দেখার সুযোগ হয়েছে আমার মাত্র দু'বার। আমি খুবই আনন্দিত হবো যদি এখানে জ্ঞানী-গুণীদের আগমন হয়, আর আপনাদের সামনে তারা তাদের মন উজাড় করে দেন এবং তাদের দীর্ঘ জীবনের সঞ্চিত ইলমের নির্যাস তুলে ধরেন। কিন্তু তারপরও যদি আপনাদের মাঝে কোন পরিবর্তন না আসে এবং জীবনে কোন বিপ্লব সূচিত না হয় তাহলে তা হবে চরম দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।

এখানে যদি ইসলামী জ্ঞান ও শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দাওয়াত দেয়া হয় তাহলে আমার বিবেচনায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিদগ্ধজনদেরও আমন্ত্রণ জানানো উচিত, যারা আপনাদের সামনে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উপর সারগর্ভ ও তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা দান করবেন। একইভাবে কবি-সাহিত্যিক ও ভাষাবিদদেরও আহ্বান জানানো উচিত, যারা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে তাদের দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা আপনাদের সামনে তুলে ধরবেন।

আজকের যুগ হলো সর্ববিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভের এবং কোন এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জনের যুগ। সুতরাং আপনাদেরকে অবশ্যই পর্যাপ্ত পরি মাণে বহুমুখী জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে, যাতে আপনারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের

শিক্ষার্থী তো বটেই, এমনকি শিক্ষকদের সামনেও যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলতে পারেন। কোন রকম দ্বিধা-জড়তা ও হীনমন্যতা যেন আপনাদের দুর্বল করতে না পারে। নাদওয়াতুল উলামার ছাত্রদের সাংস্কৃতিক মজলিস 'আল-ইছলাহ'– এর মূল উদ্দেশ্যও কিন্তু এটাই যে, আপনাদের মাঝে ইলমী যাওক ও জ্ঞানমনস্কতা সৃষ্টি হবে, আপনাদের চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত হবে এবং যুগ ও সমাজের গতিধারা সম্পর্কে আপনারা বা-খবর হবেন।

কিতাব মুতালা'আ ও গ্রন্থ অধ্যয়নের যে কথা আগে আমি বলেছি সে ক্ষেত্রে কিতাব ও গ্রন্থ নির্বাচন অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন্ বিষয় আপনি অধ্যয়ন করবেন এবং ঐ বিষয়ের কোন্ কোন্ কিতাব কোন্ পর্যায়ক্রমে অধ্যয়ন করবেন তা খুব চিন্তাভাবনার সাথে নির্ধারণ করতে হবে, সেই সঙ্গে আহলে ইলমের মজলিস ও ছোহবত থেকে ফায়দা হাছিল করতে হবে। কবি সুন্দর বলেছেন এবং সত্য বলেছেন–

بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر

আসে না তো 'পান-রুচি' পানশালায় না গেলে এবং সাকীর সঙ্গ না পেলে।

তদ্রূপ দ্বীনের যাওক ও সহজাত রুচিবোধও তৈরী হয়, যারা আহলুল্লাহ তাদের মজলিসে বসে এবং তাদের সান্নিধ্যে থেকে।

যাওক বা রুচিবোধ কী? এটা ব্যাখ্যা করে বোঝানো সম্ভব নয়। আল্লাহ যাকে দান করেন সেই শুধু বুঝতে পারে। প্রত্যেক জিনিসের একটি রুচিবোধ আছে এবং তা শুধু 'রুচিবানদের' সান্নিধ্য থেকেই লাভ হয় এবং বেশ কষ্ট-সাধনার পরই লাভ হয়।

পৃথিবীতে আজ মানব-জীবনের স্বভাব রুচিবোধ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। শুচি-শুভ্র ও নির্মল-পবিত্র জীবন যাপনের রুচিবোধ হারিয়ে গেছে, তাই জীবন হয়ে পড়েছে জ্বলন্ত আযাব। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এতো উন্নতি সত্ত্বেও ইউরোপ-আমেরিকা মানবীয় জীবনের সুন্দর ও নির্মল রুচি তৈরী করতে পারে নি। তাই যন্ত্রের এমন সর্বব্যাপী আধিপত্য সত্ত্বেও সেখানে এখনো তারা সত্যিকার মানুষের প্রয়োজন অনুভব করে এবং মানুষকেই প্রধান গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

***

আমার প্রিয় বন্ধুগণ! ভালোভাবে মনে রাখুন, যারা আপনাদের শিক্ষক তাদের দ্বারাই আপনাদের কাজ হবে। এই নিভু নিভু বাতি দিয়েই আপনাদের

জীবন-প্রদীপ প্রজ্বলিত হবে এবং হৃদয় ও মস্তিষ্ক আলোকিত হবে। কিন্তু যদি মনে করেন যে, অন্য কোন উপায়ে, অন্য কোন বাতি থেকে জীবনের এবং হৃদয়ের প্রদীপ প্রজ্বলিত করবেন তাহলে ক্ষতি ও খাছারাই হবে শেষ পরিণতি। কেননা সব আগুন আলো দেয় না, কিছু আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

খুব ভালোভাবে বুঝে নিন, এই আসাতিযা কেরামের মজলিসে বসেই এবং তাদের সান্নিধ্য থেকেই আপনারা দ্বীনের এবং ইলমের বিশুদ্ধ রুচিবোধ ও অনুরাগ অর্জন করতে পারবেন। তবে শর্ত এই যে, আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে এবং কিছুটা হলেও ভক্তি ও একাত্মতার সাথে তাদের সঙ্গ লাভ করতে হবে। মনে রাখবেন স্বার্থপর ও নিঃস্বার্থ এবং ভালো ও মন্দ, এমনকি মানুষ ও অমানুষের মাঝেও পার্থক্য বোঝার জন্য কোথাও কোন নিয়ম ও বিধি-বিধান লেখা নেই। এটা শুধু অনুভব ও রুচিবোধ দ্বারাই জানা যায়।

***

সমস্ত মাদরাসায় এখন একটি ভয়াবহ শূন্যতা বিরাজ করছে। তা এই যে, আসাতিযা ও তালাবা– এ দুইয়ের মাঝে কোন সম্পর্ক নেই, এমনকি ন্যূনতম যোগাযোগও নেই। বরং উভয়ের মাঝে বিরাট ফারাক ও ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। তারা এখন শুধু দরসের ছাত্র এবং দরসের আসাতেযা হয়ে পড়েছেন। এই সম্পর্কহীনতা ও ব্যবধান অবশ্যই দূর করতে হবে। উভয়ের মাঝে আত্মার সম্পর্ক এবং হৃদয়ের বাঁধন সৃষ্টি করতে হবে, মাদারিসের অস্তিত্ব, ইলমের অগ্রগতি এবং তালিবে ইলমের কামিয়াবি এখানেই রয়েছে নিহিত।

আজ প্রয়োজন আরো যোগ্যতার, আরো সাধনার

দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা-এর ছাত্রদের সাংস্কৃতিক সংগঠন جمعية الإصلاح। এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নাদাবী (রহঃ)- এর ভাষণ, যার সারমর্ম এই যে, আজকের পরিবর্তিত সময়ে সমাজকে সঠিক নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনা দিতে হলে তালিবানে ইলমকে আগের চেয়ে অনেক বেশী প্রাজ্ঞতা অর্জন করতে হবে এবং বহুমুখী যোগ্যতার পরিচয় দিতে হবে।

নাহমাদুহূ ওয়া নুছাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বাদ–

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম!

দারুল উলূমের একটি বড় উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, এখানকার শিক্ষা-জীবন শেষ করে বের হওয়া তালিবে ইলম বাইরের দুনিয়ায় যেন অপরিচিত ও অপাংক্তেয় না হয়। তাকে যেন সময় ও সমাজের সাথে 'খাপ না খাওয়া' ভিন্ন যুগের, ভিন্ন জগতের মানুষ ভাবা না হয়।

এমন যেন না হয় যে, দারুল উলূমের ইলমী পরিবেশে কয়েক বছর জীবন ও জগত থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সময় ও সমাজ থেকে বেখবর থেকে হঠাৎ কর্মের ময়দানে হাজির হলো, আর দিশেহারা অবস্থায় পড়ে গেলো, বরং এমন যেন হয় যে, এখানে থাকা অবস্থায়ও নিয়মিতভাবে (এবং নিয়ন্ত্রিতভাবে) বাইরের আলো-বাতাস সে গ্রহণ করতে পারে এবং উন্মুক্ত বাতায়ন পথে ভিতর থেকে বাইরের জগত অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

যামানা এখন বদলে গেছে

দারুল উলূমের যখন প্রতিষ্ঠা, তখন আমাদের দ্বীনী মাদারেসে পঠন-পাঠনের একটি বিশেষ ভাষা ও পরিভাষা প্রচলিত ছিলো এবং চিন্তা-ভাবনা প্রকাশের জন্যও ছিলো আলাদা রীতি ও শৈলী। এটা ছিলো আমাদের প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল। তার ভাষা ও বাক-ধারা এবং চিন্তা-ভাবনা প্রকাশের রীতি ও পদ্ধতি, সবকিছু সে যুগের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত ছিলো। তখন মাদরাসায় পত্র-পত্রিকার তেমন প্রচলন ছিলো না, বরং দোষণীয় বিষয় ছিলো। সেই সময়ে সেই পরিবেশে দারুল উলূমের ছাত্রদের এমন একটি সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করা যার আলাদা পাঠাগার থাকবে, পত্র-পত্রিকার বিভাগ থাকবে, সাপ্তাহিক বক্তৃতা ও রচনা প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান থাকবে এবং এর যাবতীয় আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা, এমনকি সংগঠনের পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব ছাত্রদের হাতে থাকবে– এটা ছিলো অত্যন্ত বাস্তববাদী চিন্তা এবং সময়ের সাহসী পদক্ষেপ।

এখন তো এই 'সাংস্কৃতিক চিন্তা' আমাদের মাদরাসা-জীবনে এমনভাবে

মিশে গেছে যে তাতে 'অভিনবত্ব' কিছু নেই। কিন্তু আজ থেকে সত্তর বছর আগে আঠারো শতকের একেবারে শেষ দিকে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত দারুল উলূমের বিচক্ষণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের 'জমইয়্যাতুল ইছলাহ' প্রতিষ্ঠার এই সাহসী পদক্ষেপ আহলে মাদারেসের জন্য ছিলো চমকে ওঠার মত ঘটনা। সে যুগ যারা দেখেছেন এবং ইলমী মহলের মন-মানস ও চিন্তা-চেতনার সাথে যাদের পরিচয় ছিলো তারাই শুধু আমার কথার গুরুত্ব ও গভীরতা অনুধাবন করতে পারবেন।

সে যুগের সে পরিবেশের বিচারে এটা ছিলো অত্যন্ত কল্যাণপ্রসূ একটি পদক্ষেপ। এবং কোন সন্দেহ নেই যে, আল-ইছলাহ যুগ ও সময়ের জন্য তখন দিশারীর ভূমিকা পালন করেছে, এখনো করে চলেছে। এখানে যারা শিক্ষা লাভ করেছেন, অনুশীলন করেছেন এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন সমাজের কর্মক্ষেত্রে নেমে তারা তা বেশ কাজে লাগিয়েছেন। এখানে তাদের যোগ্যতা ও প্রতিভার এমন পরিচর্যা হয়েছে যে, পরবর্তীতে সময় ও সমাজের সামনে দাঁড়াতে তাদের কোন রকম দ্বিধা-সংকোচের সম্মুখীন হতে হয় নি। সুতরাং আল-ইছলাহ যারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, দারুল উলূমের সেই সুসন্তানদের কীর্তি ও অবদানের যত উচ্চ প্রশংসাই করা হোক এবং তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে যত কৃতজ্ঞতাই নিবেদন করা হোক, তা সামান্য।

***

কিন্তু আমার প্রিয় বন্ধুগণ!

যে কোন কাজের এবং যে কোন পদক্ষেপের মূল্যায়ন হয় সমকালের চাহিদা ও প্রয়োজনের মানদণ্ডে। আল-ইছলাহ-এর প্রতিষ্ঠা যে সময়ের ঘটনা তখনকার জন্য সেটা ছিলো আলিম সমাজের প্রাগ্রসর চিন্তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং নিঃসন্দেহে দারুল উলূম ছিলো এই চিন্তার দিশারী ও পথিকৃত। কিন্তু সামনে এগিয়ে চলাই হলো সময়ের ধর্ম। সময় সদা গতিশীল, মুহূর্তের জন্য তার যাত্রা বিরতি নেই। তাই সময়ের ব্যবধানে চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন হয় এবং চাহিদা ও প্রয়োজনের রূপবদল হয়। সামনে আসে নতুন নতুন সমস্যা ও জিজ্ঞাসা। তৈরী হয় কর্ম ও পরীক্ষার নতুন নতুন ক্ষেত্র এবং উলামায়ে উম্মতকে দাঁড়াতে হয় অন্য রকম কিছু চ্যালেঞ্জের সামনে, যার সফল মোকাবেলার উপর নির্ভর করে ইলম ও আহলে ইলমের অস্তিত্ব। এখন তো সাধারণ মাদরাসায়ও লেখালেখির চর্চা এবং বক্তৃতা-বিতর্কের অনুশীলন হয়, দেয়ালিকা, এমনকি নিয়মিত পত্র-পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। কিন্তু বন্ধুরা! সময় এখন অনেক এগিয়ে

গেছে। পরিবেশ-পরিস্থিতি আমূল পাল্টে গেছে। এখন শুধু পত্র-পত্রিকার পাতায় বিচরণ, বক্তৃতা-বিতর্কে অংশগ্রহণ এবং মুখে বা কলমে চিন্তার সুবিন্যস্ত ও পরিমার্জিত উপস্থাপন যোগ্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়। এগুলো এখন বৈশিষ্ট্যের বিষয় নয়, বরং বিগত যুগের স্মৃতিচিহ্নমাত্র, যা শুধু এজন্য বহাল রাখা হয়েছে যে, হয়ত তা চিন্তার প্রসার এবং যুগের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। নচেৎ বাস্তবতা এই যে, পরিবর্তিত সময়ের বিচারে এসবে কোন চমক বা ঝলক নেই, কীর্তি বা কৃতিত্ব নেই। সময় এখন আরো কিছু চায়, সমাজ এখন অন্য কিছু চায়।

সাধারণ যোগ্যতা যথেষ্ট নয়

একটা যুগ ছিলো যখন চলমান রীতি ও শৈলী অনুসরণ করে একটা কিতাব লিখে ফেলাই ছিলো বড় কামাল। কেননা আলিম সমাজের অবস্থা ছিলো এই যে, মনের চিন্তার গোছালো প্রকাশ ও বিন্যস্ত উপস্থাপনের সামর্থ্যও তাদের ছিলো না। পিছনের অচল ভাষা ও পরিভাষাই ছিলো তাদের চিন্তার বাহন। তাই তখন একজন নাদাবী আলিমের এ অবদানই যথেষ্ট ছিলো যে, তিনি ইসলামী ইতিহাসের কোন বিষয়ে কলম ধরলেন এবং প্রাচীন উৎসগ্রন্থের তথ্য-উপাত্ত নতুন বিন্যাসে ও নব আঙ্গিকে উপস্থাপন করলেন। কিংবা মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন উজ্জ্বল দিক, মুসলিম জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের বহুমুখী অবদান এবং মুসলিম শাসক ও তাদের শাসনকালের সোনালী অধ্যায় সম্পর্কে সাধারণ মানের একটা গবেষণাপত্র পেশ করলেন যাতে চিন্তা-গবেষণার ছাপ না থাকলেও বিন্যাসসৌন্দর্য ও তথ্য প্রাচুর্য রয়েছে, যাতে আধুনিক পাঠকের 'রুচি-বিস্বাদ' এবং অপরিচয়ের অবসাদ দূর হয়ে যায়। সে যুগে যে কোন প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গর্ব ও গৌরবের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিলো।

কিন্তু আমার প্রিয় বন্ধুগণ! এত দিনে সময় ও সমাজ এবং পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে। এখন যদি আমাদের جمعية الإصلاح এর উদ্দেশ্য হয় শুধু মাঝারি মানের কিছু লেখক-গবেষক 'উৎপাদন', যারা সময়ের পরিবর্তন ও প্রবণতা অনুসরণ করে এবং সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের কলমের লেখা ও চিন্তার রেখা অনুধাবন করে তার মোকাবেলায় কিছু বলতে বা লিখতে পারে, তাহলে আমার কাছে শুনুন, চলমান সময়ের জন্য তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। সময়ের দাবী ও চাহিদা এখন অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত।

সময়ের দাবী ও চাহিদা সর্বদা একই মানে ও পরিমাণে স্থির থাকে না,

বরং পরিবেশ-পরিস্থিতি, মানুষের যোগ্যতা ও সামর্থ্য এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের বিচারে চাহিদার মান ও পরিমাণ নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং সে অনুযায়ী উলামায়ে উম্মতের কাছে পথের দিশা ও দিকনির্দেশনা দাবী করে থাকে। সময় এখন কোন দ্বীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে শুধু এ জন্য ছাড়পত্র দিতে প্রস্তুত নয় যে, এখানে উর্দু ভাষার কিছু ভালো লেখক বা বক্তা তৈরী হচ্ছে এবং মাঝারি মানের সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ ও আলিম তৈরী হচ্ছে।

প্রয়োজন আরো বেশী যোগ্যতার ও প্রস্তুতির

শোনো ভাই! মুসলিম সমাজের চিন্তা-জগতে আজ এক ব্যাপক নৈরাজ্য ও নৈরাশ্য ছড়িয়ে পড়ছে। এই উম্মাহ এবং এই দ্বীনের মাঝে যে চিরন্তন যোগ্যতা গচ্ছিত রাখা হয়েছে সেই যোগ্যতা ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে যুবসমাজ এবং আধুনিক শিক্ষিত মহলে ভয়ানক অনাস্থা-অনিশ্চয়তা দানা বেঁধে উঠছে, সর্বোপরি দ্বীনের ধারক-বাহক আলিমদের নতুন প্রজন্মে মারাত্মক হতাশা ও হীনমন্যতা শিকড় গেড়ে বসছে। এগুলো দূর করে যুগ ও সমাজের লাগাম টেনে ধরার জন্য এবং দ্বীন ও শরীয়তকে নয়া যামানার নয়া তুফান থেকে রক্ষা করার জন্য এখন অনেক বেশী প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজন। অনেক বড় ইলমী জিহাদ ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিজয় অর্জনের প্রয়োজন। এখন প্রয়োজন আরো বেশী আত্মনিবেদনের, আত্মবিসর্জনের এবং আরো উর্ধ্বাকাশে উড্ডয়নের।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের পূর্বসূরীগণ অনেক কালজয়ী কীর্তি ও অবদান রেখে গেছেন, বিশেষত আমাদের নাদওয়াতুল উলামার প্রথম কাতারের লেখক-গবেষক ও চিন্তাবিদগণ তাদের সময় ও সমাজকে অনেক কিছু দিয়েছেন এবং নতুন প্রজন্মকে ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে যথেষ্ট আশ্বস্ত করতে পেরেছেন। যে সব সমস্যা ও জিজ্ঞাসা তখন 'জ্বলন্ত' ছিলো সেগুলোর উপর চিন্তা-গবেষণার যে ফসল এবং যে বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান তারা রেখে গেছেন তা সে যুগের জন্য খুবই কার্যকর ও যুগান্তকর ছিলো, কিন্তু সেগুলোর চর্বিত চর্বণ এখন বিশেষ কোন কৃতিত্ব বলে গণ্য হবে না এবং তাতে যুগ ও সমাজের হতাশা দূর হবে না।

অধ্যয়নের ক্ষেত্র-বিস্তৃতি

জ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্র এখন অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। ইলমের যে প্রাচীন ভাণ্ডার ও গুপ্ত সম্পদ পূর্ববর্তী আলিমদের কল্পনায়ও ছিলো

না, আধুনিক প্রকাশনা বিপ্লবের কল্যাণে এবং বৃহৎ প্রকাশনা সংস্থাগুলোর নিরলস প্রচেষ্টায় তা এখন দিনের আলোতে চলে এসেছে। আগে যে সব কিতাবের শুধু নাম শুনেছি এখন তা গ্রন্থাগারের তাকে তাকে শোভা পায়। তাছাড়া চিন্তার পথ ও পন্থা এবং অস্থির চিত্তকে আশ্বস্ত করার উপায়-উপকরণে এত পরিবর্তন ঘটেছে যে, পুরোনো ধারার অনুকরণ এখন কিছুতেই সম্ভব নয়। সে যুগের বহু আলোচনা এখন তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। একটা সময় ছিলো যখন আল্লামা শিবলীর 'আল-জিযয়া ফিল ইসলাম' কে মনে করা হতো মহাআলোড়ন সৃষ্টিকারী কিতাব। 'এক নজরে আওরঙ্গজেব' তো ছিলো রীতিমত বুদ্ধিবৃত্তিক বিজয়। একইভাবে 'আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার' ছিলো ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে দাঁতভাঙ্গা জবাব। কিন্তু এখন তা এতই গুরুত্বহীন যে, এ সম্পর্কে বলার বা লেখার নতুন কিছু নেই এবং যুগ ও সমাজের তাতে তেমন আগ্রহ নেই। এ যুগে কোন কীর্তি ও কর্ম রেখে যেতে হলে এবং প্রতিভা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি পেতে হলে আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান-গবেষণা ও ইলমী সাধনার প্রয়োজন। কেননা সময়ের কাফেলা অনেক পথ পাড়ি দিয়ে চলে গেছে অনেক সামনে।

সময় সহজে স্বীকৃতি দেয় না

পূর্ববর্তীদের রেখে যাওয়া জ্ঞানসম্পদ অবশ্যই শ্রদ্ধার সাথে স্মরণযোগ্য। এর সাথে জড়িয়ে আছে মূল্যবান স্মৃতি এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য। এগুলো এখন আমাদের অস্তিত্বেরই অংশ। কিন্তু সময় বড় নির্দয়। যামানা বড় বে-রহম। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যত বিশাল হোক, প্রতিভার প্রভা যত সমুজ্জ্বল হোক এবং জামাত ও সম্প্রদায় যত ঐতিহ্যবাহী হোক সময় কারো সামনেই মাথা নোয়াতে রাজী নয়। যুগের স্বভাবধর্ম এই যে, যোগ্যতার দাবীতে স্বীকৃতি আদায় না করলে আগে বেড়ে সে কাউকে স্বীকার করে না। কোন কিছুর ধারাবাহিকতা বা প্রাচীনতা সময়ের শ্রদ্ধা লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। সময় এমনই বাস্তববাদী, এমনই শীতল ও নিরপেক্ষ যে, তার হাতে নতুন কিছু তুলে না দিলে এবং তার ঘাড়ে ভারী কোন বোঝা চাপিয়ে না দিলে সে মাথা নোয়াতে চায় না। সময়ের স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করা এত সহজ নয় এবং শুধু ঐতিহ্যের দোহাই যথেষ্ট নয়। সুতরাং সময়ের স্বীকৃতি পেতে হলে, ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করতে হলে এবং আত্মগর্বী সমাজের মন-মগজে যথাযোগ্য স্থান পেতে হলে প্রতিভা ও যোগ্যতার আরো বড় প্রমাণ দিতে হবে এবং ব্যক্তিত্বের উচ্চতা আরো বাড়াতে হবে, যে উচ্চতা ছাড়িয়ে যাবে হিমালয়ের শৃঙ্গকে।

***

আরেকটা কথা আপনাকে মনে রাখতে হবে সমান গুরুত্বের সাথে। তা এই যে, জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি এখন যদিও উৎকর্ষের চরমে পৌঁছে গেছে এবং চিন্তা-গবেষণার বহু নতুন ক্ষেত্র তৈরী হয়ে গেছে, সর্বোপরি তার গুরুত্ব ও ব্যাপকতা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে মানবজাতির জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে বেশ কিছু সমস্যা ও জটিলতারও সৃষ্টি হয়েছে। সময় এখন এমন নতুন মোড় পরিবর্তন করেছে এবং এমন সব উলট-পালট ও বিপ্লব দেখা দিয়েছে যে, শুধু জ্ঞানের ব্যাপ্তি, চিন্তার উচ্চতা, মতবাদের অভিনবত্ব এবং লেখার যাদু এখন সময়ের 'আশীর্বাদ' ও যামানার নেকনযর লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। সেই সঙ্গে এখন প্রয়োজন উন্নত চরিত্রের, দরদী হৃদয়ের এবং অশ্রু ভেজা চোখের।

হয়ত আমার কথা আপনাদের কাছে মনে হবে অবাস্তব। হয়ত বলা হবে যে, আমার বক্তব্যে সময়ের চরিত্রের সঠিক চিত্র নেই। কেননা সাদা চোখে দেখা যায়, এক কালে যে সকল আদর্শ ও মূল্যবোধ আমাদের প্রাণপ্রিয় ছিলো এবং যে সকল নীতি ও বিধান শরীয়তের 'প্রাপ্য' ছিলো আধুনিক যুগ সে সবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আওয়াজ তুলেছে। সুতরাং মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, হৃদয়ের ও চরিত্রের এবং দরদের ও অশ্রুজলের এখন আর তেমন মূল্য নেই।

কিন্তু এ ধারণা ভুল। কেননা সবকিছুর পরও একথা সত্য যে, মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রতি, উন্নত চরিত্রের প্রতি এবং কর্মের শুভ্রতার প্রতি সমাজ ও মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দুর্বল হওয়ার পরিবর্তে দিন দিন বেড়েই চলেছে। যে কোন সংস্কার ও বিপ্লবের পিছনে প্রাণপুরুষ রূপে আপনি এমন কোন না কোন ব্যক্তিকে অবশ্যই দেখতে পাবেন যিনি তার বিপুল সংখ্যক সাথী ও অনুগামীকে আপন ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবিত করেছেন, তাদের চিন্তায়, চেতনায় এবং ভাব ও ভাবনায় পরিবর্তন এনেছেন এবং তাদের মাঝে এক নতুন চিন্তাধারা সৃষ্টি করেছেন। মোটকথা গুণসমৃদ্ধ কোন ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করেই নতুন আদর্শের এবং নতুন বিপ্লবের আবির্ভাব ঘটেছে।

***

যে কোন বিপ্লবের গোড়ায়, যেখান থেকে বিপ্লবের নতুন স্রোতধারা উৎসারিত হয় এবং দেশ ও সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে সেখানে অবশ্যই আপনি একজন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব দেখতে পাবেন, বিশ্বাসের শিকড় যার হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত এবং বিপ্লবের চেতনায় যার মন-মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন। বিশ্বাসের এই গভীরতা এবং চেতনার এই আচ্ছন্নতা তার ব্যক্তিত্বে চৌম্বুক শক্তি ও বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে

লক্ষ লক্ষ মানুষকে দূর থেকে আকৃষ্ট করে কাছে টেনে আনে। শুধু বক্তৃতা ও বাগ্মিতা, শুধু কলমের ধার ও ভার, শুধু চিন্তার চমক ও গবেষণার চটক এবং শুধু মনীষা ও জ্ঞানবৈদগ্ধ দ্বারা যুগ ও সমাজের বুকে নতুন বিপ্লব সৃষ্টি করা যায় না। বিপ্লব তো বড় কথা, সাদামাটা পরিবর্তনও আনা যায় না। সুতরাং নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের এ যুগে আরো বেশী প্রয়োজন উন্নত চরিত্রের, হৃদয় ও আত্মার সুতীব্র দহনের এবং এমন তাপ ও উত্তাপের যা ভিতরে ভিতরে জন্ম দেয় প্রবল এক আগ্নেয়গিরির, যার লাভা উদ্গীরণ সমাজের বিদ্যমান সব জঞ্জাল মুহূর্তে ভস্মীভূত করে এবং লক্ষ কোটি মানুষের হৃদয় একই ভাবে উত্তপ্ত করে। আজ দরকার সেই রকম কিছু মানুষের, কিছু জীবন্ত হৃদয়ের এবং কিছু অশ্রুসিক্ত চোখের। আর সেজন্য সময় ও সামাজ তাকিয়ে আছে আপনাদেরই পানে ব্যাকুল দৃষ্টিতে। কারণ মখমলের গালিচার অভাব নেই, অভাব খেজুর পাতার ছিন্ন চাটাইয়ের।

শুরু থেকে আমি ইতিহাসের ছাত্র, এবং ইতিহাস অধ্যয়নের পরিমাণ আমার অল্প নয়। আমি পূর্ণ দায়িত্বের সাথে বলতে পারি যে, অন্তত ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসের সীমানায় এমন কোন বিপ্লব বা সংস্কার আন্দোলনের অস্তিত্ব নেই, যা শুধু কথার যাদুতে এবং কলমের কারিশমায় সফল হয়েছে।

বর্তমান যুগের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি চিন্তা-দর্শনের দিকে অতি সংক্ষেপে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আল্লামা ইকবাল এই চিন্তা-দর্শন কাওম ও মিল্লাতের সামনে পেশ করেছিলেন। তিনি বলেছেন–

(এ যুগে) যামানার মুজাদ্দিদ তাকেই বলা যাবে যিনি ইসলামী শরীয়তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে এবং জীবনের সঙ্গে তার সংযোগ সাধনে সক্ষম হবেন। সময় ও সমাজকে যিনি এ সত্যের উপর আশ্বস্ত করতে পারবেন যে, ইসলামের আইন ও শরীয়ত এবং নীতি ও বিধান মানব-মস্তিষ্কপ্রসূত সকল আইন ও বিধানের চেয়ে উন্নত এবং প্রাগ্রসর। এটা সময় থেকে এত অগ্রবর্তী যে, সময় কখনো তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। দুনিয়া যতই উন্নতি করুক এবং সময় যতই আগে বাড়ুক ইসলামের শরীয়ত ও জীবনবিধান মানুষের সমাজ ও সভ্যতাকে এখনো পথ দেখাতে পারে এবং সকল যুগজিজ্ঞাসার সন্তোষজনক জবাব দিতে পারে। মানব জীবনে যত রকম সমস্যার উদ্ভব হতে পারে ইসলামী শরীয়তে রয়েছে তার পূর্ণ সমাধান। সবযুগেই তার মাঝে রয়েছে একটি সর্বোত্তম আদর্শ সমাজ গঠনের সর্বোত্তম যোগ্যতা।

এ চিন্তা-দর্শন আল্লামা ইকবাল জাতির সামনে তুলে ধরেছিলেন এবং তাঁর

আজীবন স্বপ্ন ছিলো যে, এসত্য তিনি প্রমাণ করে দেখাবেন। এ প্রসঙ্গে তিনি পত্রযোগে আল্লামা সৈয়দ সোলায়মান নাদাবী (রহঃ) এর সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। ইসলামী জাহানের জ্ঞানজ্যোতিষ্ক, আল্লামা শিবলী নোমানীর সুযোগ্য উত্তরসূরী আল্লামা সৈয়দ সোলায়মান নাদাবী ছাড়া এ কাজের যোগ্য আর কেই বা হতে পারতেন!

এ প্রশ্ন এখনো একইভাবে, বরং আরো জোরালোভাবে উম্মাহর সামনে বিদ্যমান এবং সন্তোষজনক জবাবের জন্য অপেক্ষমাণ। আজকের তালিবানে ইলম যারা, আগামীতে তাদের নামতে হবে ইসলামের আইন ও বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের ইলমী ও বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদে ।

সবচে' ভয়ঙ্কর চিন্তা-যুদ্ধ

একইভাবে বর্তমান যুগে ইসলামী বিশ্বে যে চূড়ান্ত ভাগ্যনির্ধারণী লড়াই শুরু হয়েছে তা হলো ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার লড়াই। এ পর্যন্ত বহু মুসলিম দেশ ও জনপদ পাশ্চাত্য সভ্যতার ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে অধঃপাতের এমন অতলে গিয়ে পৌঁচেছে যা কল্পনা করলেও আমাদের মহান পূর্ববর্তীদের আরাম হারাম হয়ে যেতো। সেই একই ধ্বংসের পথে দ্রুত ধাবমান রয়েছে আরো বহু মুসলিম দেশ, কিন্তু আফসোস, আমাদের গাফলতের সুখনিদ্রার তাতে কোন ব্যাঘাত ঘটে না।

যাদের হাতে মুসলিম বিশ্বের শাসন ক্ষমতা, সেই অভিজাত শ্রেণী এবং বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মুসলমানদের মাঝে এখন এক ভয়াবহ চিন্তানৈতিক দ্বন্দ্ব বিরাজমান। শাসকবর্গ এবং অভিজাত শ্রেণী পাশ্চাত্য সভ্যতাকেই মনে করে উন্নতির চূড়ান্ত স্তর এবং সর্বোন্নত সমাজব্যবস্থা ও জীবন বিধান লাভের সফলতম মানবীয় প্রচেষ্টা, যার পর অন্ধ অনুকরণ ছাড়া আর কোন পথ নেই। তাদের বিশ্বাস এই যে, পাশ্চাত্য জীবন-দর্শন হলো ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার আধুনিক বিকল্প। কেননা আধুনিক বিশ্বে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা তার সকল কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং এখন আর জীবন-মঞ্চে তার ফিরে আসার চিন্তা করাও উচিত নয়। এটাই হলো সেই জ্বলন্ত প্রশ্ন যার লেলিহান শিখা গোটা ইসলামী জাহানে আজ ছড়িয়ে পড়েছে, যার ধ্বংসযজ্ঞ থেকে সমাজের কোন শ্রেণী এবং আধুনিক শিক্ষায় 'শিক্ষিত' কোন মানুষ মুক্ত নয়।

সুতরাং আমি মনে করি, দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার প্রধানতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এই সর্বগ্রাসী অগ্নি-ঝড়ের মোকাবেলায় ময়দানে

নেমে আসা। এটাই হলো আমাদের কাছে মহান পূর্বসূরীদের অবিস্মরণীয় সাধনা ও মোজাহাদা এবং ত্যাগ ও কোরবানির দাবী। এবং এটাই হবে সময়ের সবচেয়ে বড় সংস্কারমূলক কাজ, বরং এটাই হতে পারে নদওয়ার অস্তিত্বের বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। সুতরাং মুসলিম কিংবা অমুসলিম বিশ্বের যেখানে যত নাদাবী ফোযালা রয়েছেন এবং নাদওয়ার চিন্তা ও আদর্শের ধারক বাহক রয়েছেন তাদের কর্তব্য হলো এ প্রশ্নের এমন সন্তোষজনক জবার পেশ করা, যা যুগের অশান্ত চিত্তকে শান্ত করতে পারে। তাদের কর্তব্য হলো পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জীবন-দর্শনের সর্বনাশা স্রোতের মুখে বাধার এমন প্রাচীর গড়ে তোলা, যা ডিঙ্গিয়ে কোন ঢেউ উম্মাহকে আঘাত করতে না পারে। এ লড়াইয়ের জয়-পরাজয়ের মাধ্যমেই ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ভাগ্যের ফায়সালা হতে চলেছে। এবং কমবেশী প্রতিটি ইসলামী দেশ ও মুসলিম জনপদ এ সর্বনাশা ঝড়ঝঞ্ঝায় কবলিত হয়ে পড়েছে।

এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম!

যুগের এ চ্যালেঞ্জ আপনাদের আজ গ্রহণ করতে হবে এবং এ মানদণ্ডেই বর্তমান শিক্ষাজীবনে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে।

এখন আপনাদেরকে মেধা ও যোগ্যতা এবং প্রতিভা ও প্রজ্ঞার প্রমাণ দিতে হবে। সমাজের সামনে ইলমের এমন সমুচ্চ মান উপস্থাপন করতে হবে যা ভাষা ও সাহিত্যের বিচারে, তত্ত্ব ও তথ্যের বিচারে এবং ইসলাম ও অন্যান্য মতবাদের তুলনামূলক অধ্যয়নের বিচারে, মোটকথা সর্ববিচারে যা হবে অনন্য ও অতুলনীয়, যা দেখে সভ্যতাগর্বী যুগ ও সমাজ অবনত মস্তকে বলতে বাধ্য হবে যে, আপনার সিদ্ধান্তের অকাট্যতা স্বীকার না করে উপায় নেই।

পিছনের সেই কথা আমি আবার বলবো এবং বারবার বলবো, নতুন যুগ আপনাদের কাছে বহু নতুন কিছু চায়। আমাদের মহান পূর্বসূরীদের কাছে যা চেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী নাযুক ও সংবেদনশীল বিষয় আপনাদের কাছে চায়। আর যুগের ন্যায্য চাহিদা যারা পুরা করে না তাদের টিকে থাকার কোন অধিকার থাকে না।

সময়ের সেই দাবী ও চাহিদা শুনুন আল্লামা ইকবালের কবিতায়–

نگہ بلند سخن دلنواز، جاں پر سوز

یھی ھے رخت سفر میر کارواں کے لئے

'সুউচ্চ দৃষ্টি, সুমিষ্ট ভাষা, আর হৃদয়ের দহন ও উত্তাপ।

হে কাফেলার রাহ্বার! এ-ই হলো তোমার পাথেয়।'

এখন তো সুমিষ্ট ভাষাও আমাদের দখলে নেই, অথচ ইকবালের দাবী, সুমিষ্ট ভাষাই যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে চাই দৃষ্টির উচ্চতা, যা দুনিয়ার 'দৃশ্যকে' অতিক্রম করে দেখতে পায় আখেরাতের 'অদৃশ্য'কে। আর চাই হৃদয়ের দহন, যা আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্কের (এবং মানুষের হৃদয়-রাজ্যে অধিকার বিস্তারের) একমাত্র মাধ্যম। এছাড়া যা কিছু সবই মরীচিকা, শুধুই মরীচিকা।

যথেচ্ছা অধ্যয়ন মহাক্ষতিকর

যে মহান পূর্বপুরুষদের পরিচয়ে আপনাদের পরিচিতি, যাদের রেখে যাওয়া মীরাছ পেয়ে আজ আপনারা সম্পদশালী, আমি বলি না যে, তাঁরা আসমান থেকে সেতারা নামিয়ে আনার যোগ্যতা দেখিয়েছেন, কিন্তু সমকালের রুচি ও মান অনুযায়ী নিজেদের শান তারা বজায় রেখেছেন। যুগ ও সমাজের চোখে তারা একটা স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন এবং আগামী প্রজন্মের হাতে তা সোপর্দ করেছেন। ঐতিহ্যের এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য আপনাদের অনেক বেশী মেহনত মোজাহাদা করতে হবে, আরো বর্ধিত চেষ্টা-সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। ভাষা ও সাহিত্যের মান উন্নত করুন। বক্তৃতায় জাদুময়তা আনুন এবং লেখায় সম্মোহন সৃষ্টি করুন, বিপুল ও বিস্তৃত অধ্যয়নের মাধ্যমে জ্ঞান-গভীরতা অর্জন করুন। তবে সাবধান! নিজের কাঁচা বুদ্ধি ও অপরিপক্ক চিন্তার উপর ভর করে নয়; যা কিছু করার আসাতেযা কেরামের তত্ত্বাবধানের নিরাপদ ছায়ায় থেকে করুন। বিশেষ করে 'আল-ইছলাহ'-এর মুরুব্বী এবং যে উসতাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক রয়েছে তার নির্দেশনা অনুযায়ী করুন। পঠন ও অধ্যয়ন এত সহজ ও মজাদার জিনিস নয় যে, যখন যা পেলাম তাই লুফে নিলাম, তাই চেখে দেখলাম। কোন নির্বাচন নেই, কোন পর্যায়ক্রম নেই, মাত্রা ও পরিমিতি নেই।

দরদী বন্ধুর সাবধানবাণী মনে রেখো! অধ্যয়ন হলো দোধারী তলোয়ার। সঠিক ব্যবহার না হলে তা সর্বনাশেরও কারণ হতে পারে। এটা ইলমী যিন্দেগীর এক পোলছেরাত, যা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পার হতে হবে এবং আগের যাত্রীদের কাছ থেকে আলো নিতে হবে, নইলে নীচে অতল গহ্বরে পড়ে যাওয়ার আশংকা থেকেই যাবে। তাই আসাতেযা কেরামের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা গ্রহণ করুন। সময় কম, কাজ বেশী এবং অনেক বেশী। পড়ার বিষয়ও দিন দিন বেড়েই চলেছে। ছাপাখানা থেকে বন্যার মত মুদ্রিত 'পদার্থ'

বের হয়ে আসছে। কিন্তু ছাপা কাগজমাত্রই পড়ার যোগ্য নয় এবং যে কোন বই ও পত্রিকা আপনার টেবিলে আসার উপযুক্ত নয়।

আপনাদের এ মাদরাসা হলো ইলমের, আমলের, চিন্তার, চেতনার, আদর্শের এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের 'হারাম' বা পবিত্র ভূমি। এই হারামে এমন কিছুই শুধু প্রবেশের অনুমতি পাবে যা আপনার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি এবং এই মহান শিক্ষাঙ্গনের প্রতিষ্ঠাতাদের ত্যাগ ও কোরবানির সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করে।

বাইরের কোন গলীয নাজাসাত যেমন এর ভিতরে আনা যায় না, তেমনি আপনার টেবিলে এমন কোন বই-পত্রও রাখা যায় না যা গলীয নাজাসাতের চেয়ে বেশী ক্ষতি করে, দুর্গন্ধ ছড়ায় এবং পরিবেশের পবিত্রতা নষ্ট করে।

আপনার পড়ার টেবিল কোন পাবলিক লাইব্রেরীর টেবিল নয়। এটা এক পবিত্র শিক্ষাঙ্গনের টেবিল, এক উচ্চ গবেষণাগারের টেবিল যেখানে আগামী দিনের মানুষ তৈরী হয়, যে মন-মস্তিষ্ক উম্মাহকে পথ দেখাবে তা শোধন করা হয়। এখানে পাঠাগারের আলমারীতে এবং পড়ার টেবিলে এমন কোন বই-পত্রের থাকার অধিকার নেই যার দুর্গন্ধ পরিবেশকে দূষিত করে, যা একবার পড়ার পর মানুষ দিনের পর দিন চিত্তবিক্ষেপের শিকার হয়ে পড়ে এবং যে চিন্তা-চেতনার বুনিয়াদের উপর এই প্রতিষ্ঠান অস্তিত্ব লাভ করেছে তার সাথে বিশ্বস্ততা ভঙ্গ হয়ে যায়।

তবে আমি আপনাদের উপর পূর্ণ আস্থা রেখে বলতে চাই যে, এক্ষেত্রে আমাদের পক্ষ হতে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়মকানুনের প্রহরা আরোপের প্রয়োজন নেই। আপনার বিবেকের প্রহরাই যথেষ্ট। কেননা এ বিশ্বাস তো আপনার থাকা উচিত যে, আমরা আপনার কল্যাণ চাই এবং আমাদের অভিজ্ঞতা আপনার চেয়ে বেশী।

তালিবে ইলমের মর্যাদা ও দায়িত্ব

এ প্রবন্ধ ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে দারুল উলূম দেওবন্দের এক ছাত্র মজলিসে পঠিত হয়েছিলো। তাতে দ্বীনী মাদরাসার প্রকৃত পরিচয় ও মর্যাদা এবং মাদরাসার শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচনা করা হয়েছে এবং এ মর্মে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, তালিবানে ইলমের কাছে বর্তমান যুগের দাবী ও চাহিদা কী? এবং দ্বীনের দাওয়াত ও খেদমত আঞ্জাম দেয়ার জন্য তাদের কী কী প্রস্তুতির প্রয়োজন?

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক এবং যিনি সকল জ্ঞানের আধার। দুরূদ ও সালাম তাঁর পেয়ারা রাসূলের উপর যিনি রাহমাতুল্‌লিল 'আলামীন, যার সিনা থেকে উপৎসারিত হয়েছে উলূমে নবুয়তের ঝরনা-ধারা

رب اشرح لي صدرى و يسرلى امرى و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

(হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার বক্ষ প্রসন্ন করে দিন এবং আমার যাবতীয় বিষয় সহজ করে দিন এবং আমার মুখের জড়তা দূর করে দিন, যেন তারা আমার কথা বোঝে।)

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম!

আপনাদের সাথে আমার আজকের আলোচনার পরিচয়-সূত্র এই যে, আপনারা দ্বীনী মাদরাসার তালিবে ইলম, আর আমি দীর্ঘ দিনের এক খাদিমে ইলম। আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে ইলমের যে মোবারক কাফেলা মসজিদুন্নবীর ছুফফা থেকে যাত্রা করেছে এবং যুগ যুগ ধরে যে সফর অব্যাহত রয়েছে, আমরা সবাই সেই কাফেলার সহযাত্রী ও সফরসঙ্গী। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব এবং সময়ের নাযুকতার দাবী এই যে, কোন রকম দ্বিধা-সংকোচ ছাড়া আমি আমার সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা ও চিন্তাভাবনা এবং আমার সীমিত অধ্যয়ন ও গবেষণার ফলাফল আপনাদের সামনে পেশ করবো এবং আমার জীবন সফরের সবচে' মূল্যবান ও প্রিয় উপহার আপনাদের হাতে তুলে দেবো।

এখানে সমবেত হয়ে এবং আলোচনার সুযোগ দিয়ে আপনারা আমাকে সম্মানিত করেছেন এবং আমার উপর আস্থা প্রকাশ করেছেন। সুতরাং আমার কর্তব্য হবে নিজেকে এই আস্থা ও সম্মাননার যোগ্য প্রমাণিত করা এবং এই সামান্য সময় থেকে সর্বোচ্চ ফসল তুলে আনার চেষ্টা করা। কেননা বড় মূল্যবান ব্যস্ততা থেকে এ সময়টুকু আপনারা বের করেছেন। এটা তো এমন জীবন থেকে কেটে আনা সময়, যার প্রতিটি মুহূর্ত মাস ও বছরের হিসাবে পরিমাপযোগ্য।

মাদরাসার পরিচয় ও মর্যাদা

বন্ধুগণ! সর্বপ্রথম আমাদের জানা দরকার, একটি দ্বীনী মাদরাসার প্রকৃত পরিচয় ও মর্যাদা কী? মাদরাসা হলো এক মহান কর্মশালা, যেখানে মানুষ গড়ার সাধনা হয়, যেখানে দ্বীনের দা'ঈ এবং ইসলামের সিপাহী তৈরী হয়। মাদরাসা হলো ইসলামী বিশ্বের বিদ্যুৎকেন্দ্র, যেখান থেকে ইসলামী জনপদে, বরং সমগ্র মানব বসতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। মাদরাসা হলো মন ও মস্তিষ্ক এবং অন্তর ও অন্তর্দৃষ্টি তৈরীর কারখানা। মাদরাসা হলো গোটা বিশ্বের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ এবং সমগ্র মানব জীবনের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের মহান কেন্দ্র। সমগ্র বিশ্বের উপর মাদরাসার সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়, বিশ্বের কোন সিদ্ধান্ত তার উপর কার্যকর হয় না। মাদরাসার সম্পর্ক বিশেষ কোন যুগ, সমাজ এবং বিশেষ কোন ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নয়, নয় বিশেষ কোন কৃষ্টি ও সভ্যতার সঙ্গে। সুতরাং যুগ ও সমাজের পরিবর্তন, ভাষা ও সংস্কৃতির বিলুপ্তি, কিংবা সভ্যতার প্রাচীনতা মাদরাসার গতি ও ব্যাপ্তিকে কখনো প্রভাবিত করতে পারে না। আমরা যাকে মাদরাসা বলি, একদিকে তার সম্পর্ক হলো সরাসরি মুহাম্মদী নবুয়তের সঙ্গে যা বিশ্বজনীন, সার্বজনীন ও সর্বকালীন। অন্যদিকে তার সম্পর্ক হলো মানুষ ও মানবতার সাথে এবং সেই গতিশীল জীবনের সাথে যা সাগরমুখী নদীর মতই চিরপ্রবাহমান।

মাদরাসা হলো নবুয়তে মুহাম্মাদীর চিরন্তনতা এবং মানবজীবনের গতিশীলতার মিলন মোহনা। সুতরাং আধুনিক ও প্রাচীনের বিতর্ক এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশের সীমাবদ্ধতা এখানে কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

বন্ধুগণ! মাদরাসার পরিচয় প্রসঙ্গে যদি বলা হয় যে, তা বিগত যুগের স্মারক কিংবা ইতিহাসের ধারক তাহলে এর চেয়ে আপত্তিকর ও অপমানজনক বিষয় আর কিছু হতে পারে না। আমি তো এটাকে মাদরাসার 'পরিচয়-সত্তার' বিলুপ্তি সাধন মনে করি। মাদরাসাকে আমি মনে করি সবচে' সুরক্ষিত ও শক্তিশালী কেন্দ্র এবং গতি ও প্রগতির উচ্ছলতায় এবং উদ্যম ও প্রাণচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। এর এক প্রান্তের সংযোগ হলো নবুয়তে মুহাম্মদীর সঙ্গে, অন্য প্রান্তের সংযোগ হলো জীবন ও জগতের সাথে। মাদরাসা একদিকে নবুয়তে মুহাম্মদীর চিরন্তন ঝরনাধারা থেকে 'জলসঞ্চয়' করে, অন্যদিকে জীবনের ফসলভূমিতে 'জলসিঞ্চন' করে। এটা দ্বীনী মাদরাসার সর্বক্ষণের দায় ও দায়িত্ব। মুহূর্তের জন্য যদি সে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা করে তাহলে জীবনের ফসলভূমি শুকিয়ে যাবে, মানুষ ও মানবতা নির্জীব হয়ে পড়বে এবং

জীবন ও জগতের সব কিছুতে স্থবিরতা দেখা দেবে।

মাদরাসার নেই কোন ছুটি

নবুয়তে মুহাম্মদীর ঝরনাধারা যেমন কখনো শুকোবে না তেমনি মানবতার পিপাসাও কখনো দূর হবে না। নবুয়তে মুহাম্মদীর কল্যাণ ও ফায়যানে যেমন কৃপণতা ও দানবিমুখতা নেই তেমনি মানবতার প্রয়োজন ও প্রার্থনারও বিরাম নেই। এদিক থেকে বারবার ধ্বনিত হয় 'আল্লাহ দেন, আমি বিতরণ করি'– এই আশ্বাসবাণী, ওদিক থেকে উচ্চারিত হয় 'দাও, আরো দাও'– চাহিদার কাতর ধ্বনি। দুনিয়াতে মাদরাসার চেয়ে কর্মচঞ্চল ও ব্যস্ত সচল প্রতিষ্ঠান আর কী হতে পারে! জীবনের সমস্যা ও প্রয়োজন অসংখ্য, জীবনের চাহিদা ও পরিবর্তন অসংখ্য, জীবনের বিচ্যুতি ও পদস্খলন অসংখ্য, জীবনের আশা ও উচ্চাশা অসংখ্য এবং জীবনের প্রতারণা ও প্রতারক অসংখ্য। মাদরাসা যখন এমন সমস্যাসংকুল ও প্রয়োজনবহুল জীবনের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেছে তখন তার অবসর যাপনের অবকাশ কোথায়?

দুনিয়াতে যে কোন মানুষ কাজ ছেড়ে আরাম করতে পারে, যে কোন প্রতিষ্ঠান অবসর যাপন করতে পারে। পৃথিবীতে সবার ছুটি ভোগ করার অধিকার আছে, কিন্তু মাদরাসার নেই কোন ছুটি। প্রতিদিন তার কর্মদিন, প্রতিমুহূর্ত তার ব্যস্ততার মুহূর্ত। দুনিয়ার যে কোন মুসাফির চাইতে পারে একটু আরাম, একটু বিশ্রাম, কিন্তু জীবনের সদা চলমান কাফেলায় মাদরাসা নামের যে মুসাফির, তার কপালে নেই কোন আরাম, তাকে চলতে হবে অবিরাম। জীবনের গতি কখনো যদি মুহূর্তের জন্য থেমে যেতো, চাহিদা ও প্রয়োজনের সাময়িক অবসান হতো তাহলে মাদরাসারও সুযোগ ছিলো চলার পথে একটু দম ফেলার, একটু জিরিয়ে নেয়ার। কিন্তু জীবন যেখানে সদা গতিশীল, জীবনের চাহিদা ও প্রয়োজন যেখানে পরিবর্তনশীল সেখানে মাদরাসার কর্মচঞ্চলতায় স্থিরতা ও স্থবিরতার অবকাশ কোথায়? তাকে তো পদে পদে জীবনকে শাসন করতে হবে, জীবনের ভুল-বিচ্যুতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নতুন নতুন সমস্যা ও জিজ্ঞাসার সমাধান দিতে হবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াতে হবে এবং নতুন নতুন ফেতনার সফল মোকাবেলা করতে হবে। মাদরাসা যদি জীবন-কাফেলা থেকে পিছিয়ে পড়ে, কিংবা কোন মঞ্জিলে এসে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে এবং তন্দ্রায় ঢুলে পড়ে তাহলে জীবনকে সঙ্গ দেবে কে? মানবতাকে পথ দেখাবে কে? ঝড়-তুফানের অন্ধকারে নবুয়তের আলো দেখাবে কে? হতাশা ও নিরাশার মুখে পায়গামে মোহাম্মদীর চিরন্তন সান্ত্বনাবাণী শোনাবে কে?

মদরাসা যদি কর্মে অবহেলা ও দায়িত্বে শিথিলতা করে, মাদরাসা যদি জীবনের নেতৃত্ব ত্যাগ করে এবং গতিহীন ও স্থবির হয়ে পড়ে তাহলে তা হবে জীবন ও জগতের সাথে এবং মানুষ ও মানবতার সাথে বিশ্বাসভঙ্গের শামিল, যা দায়িত্বশীল ও কর্তব্য সচেতন কোন মাদারাসা কল্পনাও করতে পারে না।

তালিবানে ইলমের মহান দায়িত্ব

বন্ধুগণ! মাদরাসার তালিবে ইলম হিসাবে আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যেমন অতি মর্যাদাপূর্ণ তেমনি অতি গুরুত্বপূর্ণ। আমি জানি না, দুনিয়ার কোন দল বা সম্প্রদায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য এত ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ এবং এত নাযুক ও সংবেদনশীল কি না। আমার শব্দগুলো আবার চিন্তা করুন, 'আপনার এক প্রান্ত নবুয়তে মুহাম্মদীর সঙ্গে যুক্ত, অন্য প্রান্ত জীবন ও জগত এবং সমাজ ও সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত।' এটাই আপনার দায়িত্ব-নাযুকতার কারণ এবং এটাই আপনার মর্যাদা ও সৌভাগ্যের উৎস। নবুয়তে মুহাম্মদীর সঙ্গে সম্পর্ক ও সম্পৃক্তি যেমন গর্ব ও গৌরবের এবং মর্যাদা ও সৌভাগ্যের বিষয় তেমনি তা অতি নাযুক ও গুরুভার দায়িত্বেরও বিষয়।

আপনার কাছে রয়েছে ঈমান ও বিশ্বাসের এবং হাকীকাত ও হাক্কানিয়াতের সবচে' মূল্যবান সম্পদ। এ পরিচিতি-গৌরব ও সম্পদ-অধিকার অনিবার্য ভাবে কিছু কর্তব্য ও দায়-দায়িত্বও আপনার উপর 'আরোপ' করে। আপনার অন্তরের ঈমান ও বিশ্বাস হবে এমন অটল এবং আপনার হিম্মত ও মনোবল হবে এমন অবিচল যে, দুনিয়ার কোন লোভ ও প্রলোভন ঈমান ও বিশ্বাসের কোন বিন্দু থেকেও আপনাকে টলাতে পারবে না। এই ঈমান ও বিশ্বাসকে রক্ষা করার অন্তহীন জাযবা ও উদ্দীপনা যেন আপনার অন্তরে জাগরূক থাকে। এই অমূল্য সম্পদের গর্বে ও গৌরবে এবং কৃতজ্ঞতায় ও কৃতার্থতায় হৃদয় যেন আপনার উপচে পড়ে। এই ঈমান ও বিশ্বাসের সত্যতা ও চিরন্তনতায় এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্বকালীনতায় আপনার যেন বিন্দুমাত্র সন্দেহ না থাকে। এর বিপরীত সবকিছুকে আপনি যেন নির্দ্বিধায় জাহেলিয়াত এবং জাহেলিয়াতের আবর্জনা বলে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। একদিকে আল্লাহর আহকাম ও বিধান এবং ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শকে আপনি যেমন سمعنا و أطعنا বলে গ্রহণ করবেন তেমনি অন্য দিকে জাহেলিয়াত এবং তার প্রচারকদের উদ্দেশ্যে আপনার উদাত্ত ঘোষণা হবে–

كفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العداوة و البغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده

(আমরা তোমাদের প্রত্যাখ্যান করছি। তোমাদের ও আমাদের মাঝে শুরু হলো চিরস্থায়ী শত্রুতা, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো।)

আপনার অবিচল বিশ্বাস হবে এই যে, ইসলামের পথনির্দেশনা এবং নববী শিক্ষার অনুপ্রেরণার মাঝেই রয়েছে ইহ-পরকালের সফলতা ও শান্তি এবং যামানার নয়া তুফানের মোকাবেলায় সাফীনায়ে মুহাম্মদীতেই রয়েছে নাজাত ও মুক্তি।

আপনার আরো বিশ্বাস হবে এই যে, ব্যক্তি ও জাতির উন্নতি-অগ্রগতি এবং ইজ্জত ও বুলন্দির একমাত্র শর্ত হলো মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ অনুসরণ ও নিঃশর্ত আনুগত্য। যেমন কবি বলেছেন–

محمد عربی کہ آبروئے ہردو سراست

کسے کہ خاك درش نیست خاك بر سراو

'আমাদের সৌভাগ্যের উৎস মুহাম্মদে আরাবী/ লাঞ্ছনা তার ভাগ্যলিপি, যার জুটেনি তাঁর পদধূলি।

নবুয়তের শিক্ষা-দীক্ষাকেই আপনি ইলমের সারনির্যাস এবং সব সত্যের পরম সত্য রূপে গ্রহণ করবেন এবং এর মোকাবেলায় দুনিয়ার সমস্ত শিক্ষা ও দর্শন এবং চিন্তা ও যুক্তিকে আপনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবেন। তাওহীদের হাকীকত ও মর্মকে হৃদয়ের গভীরে পরম যত্নের সঙ্গে আপনি লালন করবেন এবং যাবতীয় শিরক ও প্রতিমাতত্ত্বকে – যত আড়ম্বরপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক ভাষা ও দার্শনিক পরিভাষায় তা উপস্থাপন করা হোক– তুচ্ছ বাগাড়ম্বর বলে আপনি তা উপেক্ষা করবেন এবং زخرف القول (চাকচিক্যপূর্ণ কথার প্রতারণা) বলে উড়িয়ে দেবেন।

সুন্নতের ইত্তেবা হবে আপনার জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য এবং আপনার স্থির বিশ্বাস হবে এই যে, মুহাম্মদী তরীকাই হলো শ্রেষ্ঠ তরীকা এবং বিদ'আত হলো সমস্ত গোমরাহীর গোড়া।

মোটকথা আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, মন-মানস, রুচি ও স্বভাব এবং ইলম ও আমল সর্বক্ষেত্রে আপনি হবেন নবুয়তে মুহাম্মদীর চিরন্তনতা, সার্বজনীনতা ও যুগোপযোগিতার প্রবক্তা এবং তার বাস্তব নমুনা।

তালিবে ইলমের বৈশিষ্ট্য ও ভিন্নতা

প্রিয় বন্ধুগণ! উম্মাহর সাধারণ লোকদের তুলনায় আপনাদের বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা এই যে, এ সকল হাকীকত ও সত্যের উপর অন্যদের সাধারণ ঈমান

এবং মোটা দাগের বিশ্বাসই যথেষ্ট। কিন্তু আপনাদের থাকতে হবে পূর্ণ চিন্তাগত আশ্বস্তি ও চিত্তপ্রসন্নতা। আপনাদের শুধু বিশ্বাসী হওয়া যথেষ্ট নয়, বরং বিশ্বাসের দা'ঈ ও প্রবক্তা হওয়া জরুরী। অন্যদের ঈমান ও বিশ্বাস আত্মমুখী হতে পারে, কিন্তু আপনাদের ঈমান ও বিশ্বাস হবে বিকাশমুখী যা হাজারো লাখো ইনসানকে ঈমান ও বিশ্বাসের বলে বলীয়ান করবে। কিন্তু তা শুধু তখনই সম্ভব যখন আপনার ঈমান ও বিশ্বাস আবেগ ও উদ্দীপনার সীমানা স্পর্শ করবে এবং চিন্তা ও চেতনার কোষে কোষে প্রবেশ করবে। যখন আপনার অবস্থা হবে এই যে–

يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار

'কুফুরিতে ফিরে যাওয়া তার কাছে এমনই ভয়ঙ্কর যেমন জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া'।

নবুয়তের ইলম ও শিক্ষার সাধারণ জ্ঞান অন্যদের জন্য যথেষ্ট হতে পারে, কিন্তু আপনার জন্য প্রয়োজন ইলমে নবুয়তের 'ফায়যান' ও প্রবাহ এবং নববী জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সঙ্গে হৃদয় ও আত্মার মিলন। এক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই অর্জন করতে হবে 'ফানা' ও আত্মবিলীনতার সর্বোচ্চ মাকাম। তা না হলে দাওয়াতি দায়িত্ব পালনের কথা কল্পনাও করা সম্ভব নয়, বরং বাতিলের শতমুখী আন্দোলন ও আলোড়নের এই তুফানি যুগে ইলমে নবুয়তের প্রেম ও প্রজ্ঞা ছাড়া নিজেদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও সম্পদ রক্ষা করাও হবে সুকঠিন।

আত্মিক গুণবৈশিষ্ট্য ও আত্মার আলোকময়তা

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম! একথাও আপনাদের মনে রাখতে হবে যে, নবুয়তে মুহাম্মদী উম্মতের জন্য একদিকে যেমন ইলম ও শিক্ষা এবং আহকাম ও বিধানের অতুলনীয় সম্পদ ভাণ্ডার রেখে গেছে –

فإن الأنبيا لم يورثوا دينارا و لا درهما ، و لكن ورثوا هذا العلم

(নবীগণ দিরহাম-দীনারের মীরাছ রেখে যান নি, রেখে গেছেন ইলমের মীরাছ।)

এবং এই সম্পদভাণ্ডার তাফসীর, হাদীছ, উছূল, ফিকাহ ও ইলমুল কালামের আকারে উম্মতের কাছে এখনো সুসংরক্ষিত রয়েছে। তেমনি অন্য দিকে নবুয়তে মুহাম্মদী কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য, অনুভব ও উপলব্ধি এবং আত্মিক বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার সম্পদও উম্মতের কাছে আমানত রেখে গেছে। ইলমী সম্পদ যেমন প্রজন্ম পরম্পরায় চলে আসছে এবং আল্লাহ তা'আলা উলামায়ে উম্মতের মেহনত ও মোজাহাদার মাধ্যমে তার হেফাযাত ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা

করেছেন তেমনি আত্মিক সম্পদও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে হৃদয় থেকে হৃদয়ে বহমান রূপে চলে আসছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের মাধ্যমে সেগুলোরও হিফাযাত ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন।

কী সেই গুণ ও বৈশিষ্ট? হৃদয় ও আত্মার কী সেই নূর ও আলো?

তার নাম ইয়াকীন ও ইখলাছ, ইশক ও মুহব্বত, তাকওয়া ও তাওয়াক্কুল, দু'আ ও রোনাযারি, আত্মবিলোপ ও আত্মনিবেদন, দুনিয়ার প্রতি মোহমুক্তি ও নিরাসক্তি ইত্যাদি।

নবুয়তে মুহাম্মদী ছিলো ইলম ও আমল, জ্ঞানসাধনা ও আত্মসাধনা তথা যাহির ও বাতিন উভয়ের সম্মিলিত উৎস–

هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم ايته و يزكيهم

و يعلمهم الكتب و الحكمة

তিনি ঐ সত্তা যিনি উম্মী জাতির মাঝে পাঠিয়েছেন তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াত ও বিধান তিলাওয়াত করে শোনান এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করেন।

সুতরাং নবুয়তে মুহাম্মদীর শুধু যাহির গ্রহণ করা এবং বাতিন সম্পর্কে উদাসীন থাকা, শুধু ইলম ও আহকাম চর্চা করা এবং ইহসান ও তাযকিয়া তথা আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন উপেক্ষা করা নায়েবে নবীর শান হতে পারে না। এটা তো হবে খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ মীরাছ বা উত্তরাধিকার। নবুয়তের ওয়ারিছ ও নবীর নায়েব রূপে পৃথিবীতে যুগে যুগে যারা দ্বীন-ঈমানের হেফাযাত করেছেন এবং ইসলামের আমানত আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন তারা নবুয়তের শুধু একাংশের ধারক ও বাহক ছিলেন না, শুধু ইলমের সাধক ও গবেষক ছিলেন না। নবুয়তের উভয় সম্পদেই তারা ছিলেন সমান সম্পদশালী। ইলম ও আমল এবং জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞান এক সাথে ধারণ করেই তারা উম্মতের ইমামাত এবং যামানার 'কিয়াদাত' করেছেন। ফিতনা ও তুফানের মোকাবেলা করেছেন এবং ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর হিফাযাত করেছেন।

এ যুগেও ইসলামের দাওয়াত, উম্মতের হিদায়াত এবং যুগের সংস্কার ও বিপ্লব সাধন নবুয়তে মুহাম্মদীর শুধু প্রথম অংশ দ্বারা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। যে সকল মহান পূর্বপুরুষের সাথে সম্পর্ক ও পরিচয়ের গর্বে আপনারা গর্বিত তাঁরাও ছিলেন নবুয়তে মুহাম্মদীর উভয় বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক। দিনে

তারা কলমের কালি ঝরাতেন, আর রাতে ঝরাতেন চোখের অশ্রু। দিনের আলোতে তাদের ইলম চর্চার মজলিস হতো সজীব ও জীবন্ত, আর রাতের নির্জনতায় আল্লাহর সাথে হতো তাদের মিলন ও প্রেমনিবেদন। সুতরাং যথার্থ 'নিয়াবাত' ও প্রতিনিধিত্ব এবং 'বিরাছাত' ও উত্তরাধিকারের সর্বোচ্চ মাকাম লাভ করতে হলে আপনাদেরও আত্মনিয়োগ করতে হবে সর্বাঙ্গীনতা অর্জনের সাধনায়। জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞানের শুভ মিলন ছাড়া শুধু ইলমের বাহার হবে কাগজি ফুলের বাহার, যাতে না আছে সজীবতা, না আছে সুবাস। দুনিয়ার বাজারে কাগজি ফুলের অভাব নেই। আমি-আপনি তাতে বিশেষ কোন অবদান রাখতে পারবো না। এখানে তো প্রয়োজন নবুয়তের চিরসবুজ উদ্যানের চিরসজীব 'পুষ্পের' যার সুবাসে জাহান হবে সুবাসিত, যার সামনে দুনিয়ার ফুলেরা লজ্জায় মুখ লুকোবে পাতার আড়ালে।

فوقع الحق و بطل ما كانو يعملون

সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং তাদের কারসাজি বাতিল হয়ে গেলো।

মাদরাসার অবক্ষয় ও অধোগতি

আমার কথা খোলা মনে গ্রহণ করুন, আমি তো আপনাদেরই একজন। এটা সমালোচনা নয়, আত্মসমালোচনা। আমি বলতে চাই, মাদরাসা এখন সেই 'পুষ্প'-এর সুবাস থেকে প্রায় বঞ্চিত। আগের সেই নূরানিয়াত নেই। সেই নূরানী মানুষ নেই, যাদের দেখে নিন্দুকেরও যবান সংযত হতো, যাদের ছোহবতে মুরদা দিলও যিন্দা হতো। যে গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা বললাম, মাদরাসার বাসিন্দাদের মাঝে দিন দিন তা অবনতির দিকেই চলেছে। যত তিক্ত হোক স্বীকার করতেই হবে যে, কবি যা বলেছেন সত্য বলেছেন। তাই বুকে পাথর রেখে আমাদের তা শুনতে হবে এবং তা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। কবি বলেছেন–

اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک   نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ

'এখানে আজ নেই জীবনের তরঙ্গ ও প্রেমের জোয়ার, নেই অর্ন্তজ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি।'

ফল এই যে, হাজারো মাদরাসায় এখন আছে লাখো তালিবান, কিন্তু সমাজের অঙ্গনে এবং জীবনের প্রাঙ্গনে তাদের কোন প্রভাব নেই, নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নেই। অথচ আগে সংখ্যা ছিলো কম, ধার ও ভার ছিলো অনেক বেশী।

এক সময় এ দেশেই খাজা মাঈনুদ্দীন আজমীরী কিংবা সৈয়দ আলী

হামদানী কাশ্মীরী (রহঃ) এর মত সহায় সম্বলহীন এক ফকীর আত্মপ্রকাশ করতেন আর সারা দেশ হৃদয়ের তাপে ও উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠতো এবং ঈমান ও ইয়াকীনের নূরে নূরানী হতো। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রঃ) মোঘল হুকুমতে একা এক ইনকিলাব এনেছিলেন। তাঁরই নিরব প্রচেষ্টার বরকতে আকবরের সিংহাসনে আমরা দেখি আওরঙ যেবের মত আলিম, ফাকীহ ও দ্বীনদার বাদশাহকে।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রহঃ) বিশাল বিস্তৃত এই হিন্দুস্তানের গতিধারা বদলে দিয়েছিলেন এবং সমগ্র চিন্তা-ব্যবস্থা ও শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

মাওলানা মোহাম্মদ কাসিম নানুতবী (রহঃ) এক সর্বগ্রাসী হতাশা ও নৈরাশ্যের মাঝে এবং 'পিছু হটা' এক নাযুক সময়ে এত বড় ইসলামী দুর্গ তৈরী করেছেন এবং দ্বীন ও শরীয়তের কংকাল দেহে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছেন। আর এই কিছুদিন আগে হযরত মাওলানা ইলয়াস (রহঃ) ঈমানের মেহনত এবং দ্বীনী দাওয়াতের যে জাযবা ও হিম্মত এবং উদ্যম ও মনোবল মানুষের মাঝে সঞ্চার করেছেন তা এক কথায় বিস্ময়কর। কবির ভাষায়–

جہانے راد گر گوں کر دیك مر و خود آگا ھے

'এক জাহান বদলে দিতেন এক মরদে খোদা।'

এখন মাদরাসা থেকে বের হয়ে আসা আমাদের ওলামা-ফোযালা এই প্রাণ ও প্রেরণা থেকে, এই জাযবা ও চেতনা থেকে এবং এই রূহ ও রূহানিয়াত থেকে প্রায় শূন্যের পর্যায়ে চলে এসেছে। সেই হৃদয়-সম্পদ থেকে আজ তারা বঞ্চিত, সেই 'কলবী হারারাত' ও হৃদয়োত্তাপ থেকে আজ তারা মাহরূম, যা কাওমকে নতুন চিন্তায় ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতো এবং জীবনের পথ ও পন্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে বাধ্য করতো। যুগ ও সময় বড় বাস্তববাদী। এখানে ফাঁক ও ফাঁকির সুযোগ নেই। এখানে শক্তি উচ্চতর শক্তির কাছেই শুধু আত্মসমর্পণ করে। মস্তিষ্ক উন্নততর মস্তিষ্কের সামনেই শুধু অবনত হয় এবং নিরুত্তাপ হৃদয় উত্তপ্ত হৃদয়ের সংস্পর্শেই শুধু বিগলিত হয়।

তিক্ত সত্য এই যে, এখন মাদরাসা ও তার বাসিন্দাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি যেমন স্থবির তেমনি তাদের হৃদয়বৃত্তিও অবনতিশীল। চিন্তা-চেতনা যেমন নির্জীব, তেমনি আত্মিক শক্তিও নিস্তেজ। বক্তা ও বক্তৃতার এবং লেখক ও লেখার অভাব এখনো নেই। দর্শন ও দার্শনিকের এবং চিন্তা ও চিন্তাবিদের কমতি এখনো নেই, কিন্তু কবি জিগার মুরাদাবাদীর ভাষায়–

آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چھرہ پہ یقیں کا نور نہیں

চোখের তারায় প্রেমের ঝিলিক কোথায়? চেহারায় ঈমানের সে নূর কোথায়?

মাদরাসা এক সময় ছিলো জীবন ও জীবনী-শক্তির কেন্দ্র, দ্বীন ও ঈমানের রক্ষা-দুর্গ এবং বড় বড় ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের লালনক্ষেত্র, সময়ের প্রয়োজনে যারা জন্ম দিতেন কল্যাণপ্রসূ বিপ্লবের এবং সংস্কার আন্দোলনের। সেদিনের সেই মাদরাসা আজ হতাশা ও নিরাশায় বিপর্যস্ত, অযোগ্যতার অনুভূতি ও হীনমন্যতাবোধে বিধ্বস্ত।

এখন মাদরাসার সংখ্যা বেড়েছে, ছাত্র ও ছাত্রাবাস অনেক হয়েছে, পাঠ্যবই ও পাঠব্যবস্থা বেশ উন্নত হয়েছে, কুতুবখানার সমৃদ্ধি এবং সুযোগ-সুবিধার বৃদ্ধি যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু অবক্ষয়েরও চূড়ান্ত হয়েছে। হৃদয়ের স্পন্দন যেন থেমে গেছে, আত্মার খোরাক যেন কমে গেছে। দেহ আছে প্রাণ নেই, শব্দ আছে মর্ম নেই, কথা আছে হাকীকত নেই, ছূরত আছে সীরাত নেই, মজলিস আছে ছোহবত নেই। এককথায় সব আছে, কিন্তু কিছুই নেই। তাই কোন দরদী ও সংবেদনশীল মানুষ যখন 'পথ ভুলে' এখানে এই পরিবেশে এসে পড়ে তখন তার শ্বাস রুদ্ধ হয়, দম আটকে যায় এবং সে পালিয়ে বাঁচতে চায়। সাগরের এই নিস্তরঙ্গ চেহারা দেখেই যেন বেদনাভারাক্রান্ত কবি ফরিয়াদ করেছেন–

خدا تجھے کسی طوفاں سے آشنا کر دے

کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیی

تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو

کتاب خواں ھے مگر صاحب کتاب نہیں

'আল্লাহ করুন. ঝড়-তুফানের সাথে হোক তোমার পরিচয়/ কেননা তোমার সমুদ্রে জলরাশি আছে, তরঙ্গবিক্ষোভ নেই/ কিতাবের পাতা থেকে অবসর নেই তোমার/তাই তুমি গ্রন্থপাঠক, গ্রন্থকার নও।'

এখন তো মাদরাসায় বসে সৃষ্টিধর্মী ঝড়-তুফানের পরিচয় প্রার্থনা করতেও বুক কেঁপে ওঠে। কেননা সবখানে সব মাদরাসায় এখন দেখতে পাই ধ্বংসাত্মক ঝড়-তুফানের পূর্বাভাস। এ হলো বাইরের ঝড় তুফান, যা মাদরাসার ভিত কাঁপিয়ে দিতে চায়, এগুলো হচ্ছে লক্ষ্যহীন, চিন্তাহীন ও শিকড়হীন 'আওয়ামী' আন্দোলন যার ধ্বংসাত্মক ঢেউ মাদরাসার চারদেওয়ালের গায়ে এসে আছড়ে পড়ছে। তাতেও আমাদের ছাত্রদের ভূমিকা শুধু অনুকরণপ্রিয় তোতাপাখীর।

এটা বড় দুঃখজনক ও মর্মান্তিক বাস্তবতা যে, যে সমস্ত আলোড়ন ও আন্দোলন, যে সমস্ত শোরগোল ও নৈরাজ্য এবং প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের যে সমস্ত রীতি-নীতি ও কর্মকাণ্ড আজ আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও জাগতিক বিদ্যালয়গুলোতে অচল ও সেকেলে এবং নিষ্ফল ও ক্ষতিকর রূপে পরিত্যক্ত হয়ে চলেছে সেগুলোই এখন আমাদের দ্বীনী মাদরাসার তালিবানে ইলমের কাছে কদর ও সমাদর লাভ করছে। যারা হবে সময়ের নিয়ন্ত্রক ও যামানার ইমাম, যারা হবে সৃজনশীল চিন্তার ধারক, স্বতন্ত্র আদর্শের বাহক এবং স্বকীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী জামাত, তারাই হয়ে পড়েছে ধর্মহীন শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অন্ধ অনুসারী, নীতিহীন ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের পূজারী। এটাই যেন তাদের গর্ব ও গৌরব। তাই কবি বড় দুঃখ করে বলেছেন–

کر سکتے تھے جو اپنے زمانہ کی امامت

وہ کہنہ دماغ اپنے زمانہ کے ھیں پیرو

'অন্ধকারে আলো ছড়াবার এবং যুগের নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা ছিলো যাদের, দেখো হায়! তারাই এখন আঁধারে পথ হারায়, তারাই এখন মাথা দোলায় যুগের ইশারায়।'

আজ আমাদের দ্বীনী মাদরাসায় সবচে' ভয়ংকর ফেতনা ও চিন্তানৈতিক ব্যাধি হলো সর্বব্যাপী এক হীনমন্যতাবোধ, যা ঘুণে ধরা কাঠের মত ভিতরে ভিতরে আমাদের গ্রাস করে চলেছে। আর বলাবাহুল্য যে, কর্মচঞ্চল ও সংগ্রামমুখর এই পৃথিবীতে ঘুণে ধরা কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বেঁচে থাকা ও টিকে থাকা কখনো সম্ভব নয়।

কেন এ হীনমন্যতা, কোথায় আত্মমর্যাদা?

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম!

যুগ ও সমাজের মোকাবেলায় কেন ও কী জন্য আপনাদের এই হীনমন্যতা? অন্যদের হীনমন্যতা হলো মানসিক দুর্বলতা ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধি। কিন্তু আপনাদের হীনমন্যতাবোধের অর্থ হবে দ্বীন ও ঈমানের কমযোরি এবং চিন্তা ও বিশ্বাসের দুর্বলতা। এর অর্থ হবে গায়বী ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি এবং আসমানী নেযাম ও ব্যবস্থার প্রতি আস্থাহীনতা, যার পরিণাম-পরিণতি খুবই গুরুতর ও সুদূরপ্রসারী। নববী ইলমের ধারক ও বাহক যারা, ওয়ারিছে নবী ও নায়েবে রাসূল যারা তাদের মনে যদি বাসা বাঁধে তুচ্ছতা ও হীনমন্যতার অনুভূতি তাহলে এর অর্থ হবে এই যে, নবুয়তের মাকাম ও মর্যাদা তাদের জানা নেই। আল্লাহর

যাত ও ছিফাতের পরিচয় তাদের কাছে নেই। অন্তরে ইয়াকীন ও বিশ্বাসের সম্পদ নেই।

ভাই, আপনারা তো এমন সব ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের উত্তরসূরী যাদের সামনে এসে থেমে যেতো সময়ের গতি, যারা নির্ধারণ করে দিতেন জীবন ও সমাজের রীতি-নীতি, যাদের নূরানিয়াতের সামনে ম্লান হয়ে যেতো সূর্যের দীপ্তি। আপনারা তাদের পদাংক অনুসারী, শেখ সাদীর ভাষায় যারা ছিলেন 'মুকুটহীন সম্রাট'।

যে মহামূল্যবান সম্পদসম্ভার রয়েছে আপনার কাছে পৃথিবীর সব রাজভাণ্ডার তা থেকে বঞ্চিত। আপনার সিনায় রয়েছে ইলমে নবুয়ত ও নূরে নবুয়ত। আপনার চিন্তায়, চেতনায় এবং বিশ্বাসে, ভাবনায় রয়েছে সেই সব মহাসত্য ও চিররহস্য যা বহুদিন হলো মানবতার হাতছাড়া হয়ে গেছে। মানবজাতি আজ অন্ধকারে ডুবে আছে। বিভিন্ন গোলোযোগ-দুর্যোগ ও ফেতনা-ফাসাদে সবাই এখন দিশেহারা।

কিন্তু তালিবানে ইলম! স্থূল দৃষ্টিতে তাদের পরিচয় হলো জীর্ণ দেহ, শীর্ণ বস্ত্র ও রিক্ত হস্ত, কিন্তু অন্তর্চক্ষু মেলে নিজের ভিতরে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন। হৃদয়-রাজ্য আপনার কত শত সম্পদে পরিপূর্ণ। যিন্দা কলব, যিন্দা রূহ, সজীব হৃদয়, সজীব প্রাণ।

এত বড় সত্য আর কোন্ কবি কবে কোন্ কবিতায় এত সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে! শুনুন–

برخود نظر کشا ز تہی دامنی مرنج   درسینہ تو ماہ تمامے نہادہ اند

'শূন্য আঁচল দেখে ক্ষুণ্ন হও কেন তুমি? নিজেকে দেখো একবার, বুকে তোমার লুকিয়ে আছে চাঁদ পূর্ণিমার।'

জেনে রাখুন, মনস্তত্ত্বের স্বীকৃত সত্য এই যে, ইজ্জত ও যিল্লতি এবং তুচ্ছতা ও মর্যাদার সম্পর্ক হলো মানুষের অন্তর্জগতের সঙ্গে। বাইরের জগতের সাথে তার সম্পর্ক খুবই কম। হীনমন্যতা ও তুচ্ছতাবোধ একটি মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার প্রকাশমাত্র। নিজের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে মানুষের মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংশয়-সন্দেহ, দুর্বলতা ও অনাস্থা এবং আত্মপরিচয়ের অভাব – এসবেরই অনিবার্য পরিণতি হলো নিজের তুচ্ছতার অনুভূতি ও হীনমন্যতাবোধ। মানুষ নিজেকে নিজে তুচ্ছ ভাবে, মূল্যহীন মনে করে, তারপর সন্দেহে পড়ে যায় যে, সময় ও সমাজ বুঝি তাকে তুচ্ছ ও মূল্যহীন মনে করছে। অথচ প্রকৃত সত্য এই

যে, নিজের উপর নিজেই সে অবিচার করছে। নিজেই নিজের অবমূল্যায়ন করছে। মনে রাখবেন, নিজেকে যে তুচ্ছ ভাবে, নিজের কাছে নিজের মূল্য যে হারিয়ে ফেলে পৃথিবীর কোন পদ ও সম্পদ তাকে মর্যাদা দিতে পারে না, মূল্যবান বানাতে পারে না। আপন হৃদয়ে যার স্থান নেই, এ জগত সংসারে কোথাও তার স্থান নেই। আপন হৃদয়ের প্রসার ও সংকোচনেই বাইরের জগত সম্প্রসারিত ও সংকোচিত হয়ে থাকে। সুতরাং নিজের হৃদয়কে নিজের জন্য সম্প্রসারিত করুন, জগত নিজেকে মেলে ধরে আপনাকে স্বাগত জানাবে।

মানুষের কর্তব্য হলো আত্মজিজ্ঞাসা করা, নিজেকে নিজে প্রশ্ন করা– নিজের সঙ্গে নিজে সে কী আচরণ করছে? নিজের হৃদয়ে নিজেকে সে কতটা মর্যাদার আসন দিয়েছে? নিজেকে যদি সে রিক্ত ও নিঃস্ব মনে করে, দুনিয়ার বাজারে নিজেকে যদি তুচ্ছ ও মূল্যহীন ভাবতে থাকে তাহলে নিক্তির মাপে ওজন করে অভ্যস্ত এই পৃথিবীর কাছে ইজ্জত ও মর্যাদা আশা করা তার উচিত নয়। জ্ঞানে বিজ্ঞানে এবং আবিষ্কারে উদ্ভাবনে অতি অগ্রসর এই পৃথিবীতে বিশ শতকের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েও যদি আপনি বুঝতে না পারেন তাহলে আমার কিছু বলার নেই। আরব জাহেলিয়াতের দাতা হাতেম তাঈ কিন্তু এ পরম সত্য আমার আপনার শিক্ষার জন্য তার এক কবিতায় রেখে গেছেন–

و نفسك أكرمها فإنك إن تـهن / عليك فلن تلقى من الناس مكرما

'বন্ধু! নিজেকে নিজে মর্যাদা দাও। কেননা তোমার চোখে তুমি তুচ্ছ হলে মানুষের মাহফিলে কোন কদর পাবে না তুমি।

প্রিয় বন্ধুগণ! চাঁদ-সূর্যের অস্তিত্বের মতই আমি বিশ্বাস করি যে, শত শত জাতির কোটি কোটি মানুষের এই পৃথিবীতে আমরা তুচ্ছ নই, নিঃস্ব নই, দুর্বল ও শক্তিহীন নই, অসহায় ও বে-সাহারা নই। কিন্তু সমস্যা এই যে, আমরা আমাদের আত্মপরিচয় ভুলে গেছি। এই আত্মবিস্মৃতিরই পরিণতি হলো আমাদের হীনমন্যতাবোধ।

এ ব্যাধির একমাত্র চিকিৎসা এই যে, আমাদেরকে আত্মসচেতন হতে হবে। নিজেদের অবস্থান ও মর্যাদা অনুধাবন করতে হবে। নিজেদের ভিতরে গচ্ছিত সম্পদের সঠিক খোঁজ নিতে হবে। দুনিয়ার পরিবর্তন আসলে আমাদের দৃষ্টির পরিবর্তন। বাইরের দুনিয়ার সবকিছু আমাদের দৃষ্টির অনুগামী। যেদিন জীবন ও জগত সম্পর্কে এবং নিজেদের সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিতে পরিবর্তন আসবে সেদিন জগত সংসারের সবকিছুতেই পরিবর্তন আসবে। এবং আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখতে পাবো যে, হীনমন্যতাবোধের যে ভয়ঙ্কর অপচ্ছায়া আমাদের

তাড়িয়ে ফিরছিলো তা কর্পুরের মত উবে গেছে। কবি সত্যই বলেছেন–

اور اگر با خبر اپنی شرافت سے ہو تیری سپہ انس و جن، تو ھے امیر جنود

'আপন মর্যাদা সম্পর্কে তুমি সচেতন হও তাহলে দেখবে, জিন-ইনসান হবে তোমার সিপাহী, আর তুমি হবে আমীরে লশকর।'

আমাদের বিগত ও সমসাময়িক ইতিহাসে দেখা যায়, যারা বিশ্বজগতে নিজেদের অবস্থান ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন যে, কী মহামূল্যবান সম্পদ ও মর্যাদাপূর্ণ মাকাম আল্লাহ তাদের দান করেছেন, সারা বিশ্বের সব কিছু তাদের কাছে মনে হয়েছে তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ। ফলে দুনিয়ার কোন সালতানাত কখনো তাদের খরিদ করতে পারে নি। প্রতাপশালী সুলতান ও আমীর-উমরাদের বড় বড় লোভনীয় প্রস্তাব মৃদু হেসে এই বলে তারা ফিরিয়ে দিয়েছেন যে– 'ঈগল তো নীড় বাঁধে সর্বোচ্চ বৃক্ষের শীর্ষ চূড়ায়।'

মানবজাতির ইতিহাস যদিও বারবার আত্মবিস্মৃত ও আত্মবিক্রিত মানুষের কলংকে কলংকিত হয়েছে, তবু তা এই মহামানবদের ব্যক্তিত্ব বিভায় উদ্ভাসিত এবং তাদের আল্লাহ-প্রেম ও আত্মসম্মানবোধের কাহিনীতে গৌরবান্বিত হয়েছে। মানবতার শির তাদেরই কল্যাণে চিরউন্নত রয়েছে যারা কর্মে ও বিশ্বাসে নিজেদের শির উন্নত রেখেছেন।

আত্মমর্যাদাশীলদের দ্বারাই জীবনের গৌরব

আমার প্রিয় বন্ধুগণ! জীবনের স্থিতি ও ধারাবাহিকতার জন্য খাদ্য-বস্ত্র ও উপায়-উপকরণের যেমন প্রয়োজন, এবং মানুষ নিজেই সেগুলোর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, তেমনি মানবজীবনের উন্নতি ও অগ্রগতি এবং মানবতার মর্যাদা ও গৌরব রক্ষার জন্য জড়বাদ ও বস্তুপূজার এই পৃথিবীতে সময়ে সময়ে এমন কিছু মর্দে খোদা ও সাধক পুরুষের উপস্থিতি অপরিহার্য, যারা নববী শান ও ওয়ারিছে নবীর আত্মসম্মান বজায় রাখতে পারেন এবং বস্তুতান্ত্রিক পৃথিবীর মাপ ও পরিমাপ অবজ্ঞাভরে অস্বীকার করতে পারেন এবং বিভিন্ন জনপদের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দুনিয়াদারদের এ আওয়ায দিতে পারেন–

أتمدونن بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون

'আমাকে তোমরা সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে চাও? শোনো, আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তা ঐ সম্পদ থেকে উত্তম যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন, তোমরা বরং তোমাদের সম্পদ নিয়ে মেতে থাকো।'

এ আওয়ায যেদিন বন্ধ হয়ে যাবে, সারা দুনিয়া সেদিন এমন এক

নিলামঘর-এ পরিণত হবে, যেখানে বিবেক ও বিশ্বাস এবং ইলম ও ঈমান কোন না কোন মূল্যে খরিদ করা সম্ভব, যেখানে মানুষ ও মানবতা গরু-ছাগলের মত সস্তা দরে কিংবা চড়া দরে বিক্রি হয়। দুনিয়া সেদিন আর মানুষের বাসোপযোগী থাকবে না এবং মানবতার ইজ্জত বলে কিছুই থাকবে না।

এখন মানবতার সম্ভ্রম রক্ষা করা এবং দ্বীন ও শরীয়তের শান বজায় রাখার দায়িত্ব এককভাবে আপনাদেরই উপর অর্পিত। সময়ের উজান পাড়ি দিয়ে আপনাদেরই এগিয়ে আসতে হবে এ মহান দায়িত্ব পালনের জন্য। ঐ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে তো এটা আশা করা যায় না যারা 'আহার ও বিহার' ছাড়া জীবনের অন্য কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা কখনো দাবীই করেনি। এ আশা ও প্রত্যাশা তো শুধু আপনাদেরই কাছে করা যেতে পারে, যাদের পূর্বপুরুষদের কাতারে রয়েছেন ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) এর মত ইয্যত ও গায়রতের অধিকারী ইমাম, যাদেরকে ভয়-ভীতি এবং লোভ ও প্রলোভনের কোন মূল্যেই খরিদ করতে পারে নি সে যুগের প্রবল প্রতাপান্বিত আব্বাসী হুকুমত।

রয়েছেন ইমাম গায্যালী (রঃ) এর মত সাহসী ও বা-হিম্মত আলিম যিনি দরবারে খেলাফাতের ইঙ্গিত-অনুরোধ সত্ত্বেও বাগদাদের নিযামিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করতে রাজী হননি, যা খেলাফতের পর সর্বোচ্চ ধর্মীয় মর্যাদার বিষয় ছিলো।

রয়েছেন হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রঃ) এর মত প্রাজ্ঞ ও প্রতিজ্ঞ এবং উচ্চ মনোবলের অধিকারী মানুষ যিনি বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সামনে মাথা নত না করে কারাগারের নির্যাতনকে সাদরে বরণ করেছেন।

আপনাদের পূর্বপুরুষদের কাতারে রয়েছেন হযরত মিরযা মাযহার জানেজানাঁ (রহঃ) এর মত ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব, যার নামে দিল্লীর বাদশাহ্ পায়গাম পাঠালেন– 'আল্লাহর দেয়া আমার বিশাল সালতানাত থেকে আপনিও কিছু গ্রহণ করুন।'

আর তিনি জবাব পাঠালেন– আল্লাহ্ তো সারা দুনিয়াকে متاع الدنيا قليل বলেছেন। তা থেকে আপনার ভাগে পড়েছে সামান্য একটি অংশের রাজত্ব। সুতরাং তা এমন কী আর বেশী যে, আমার মত 'ফকীর' তাতে লোভের হাত বাড়াবে!'

একবার তিনি নওয়াব আছেফ জাহ্-এর পেশকৃত বাইশ হাজার রুপিয়ার নযরানা ফেরত দিলে নওয়াব নিবেদন করলেন, 'আপনি গ্রহণ করে অভাবীদের

মাঝে তাকসীম করে দিন।'

কিন্তু তিনি বিনয়ের সাথে বললেন, 'দান বিতরণের আদব-কায়দা আমার জানা নেই। আপনি ফেরার পথে দান করে করে যান, দেখবেন ঘরে যাওয়ার আগে তা শেষ হয়ে গেছে। অন্তত ঘরে গিয়ে তো অবশ্যই শেষ হয়ে যাবে।'

আপনার পূর্বপুরুষদের মাঝে রয়েছেন হযরত শাহ গোলাম আলী দেহলভী-এর মত ব্যক্তিও যিনি নওয়াব মীর খান-এর পক্ষ হতে তাঁর খানকাহ-এর বার্ষিক খরচ নির্বাহের জন্য জায়গীর প্রদানের প্রস্তাব এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন–

ما آبروئے فقر و قناعت نمی بریم ما میرخاں بگوئے کہ روزی مقدر است

'ফকীরী ও অল্পেতুষ্টির ইজ্জত আমি হারাতে পারি না/ মীর খানকে বলে দাও যে, রুযি তো নির্ধারিত তাকদীর।'

আরো আছেন মাওলানা আব্দুররহীম রায়পুরী (রহ) এর মত স্বনামধন্য মুদাররিস, যিনি বেরেলী কলেজের আড়াইশ রুপিয়ার 'বেতন' ফেলে দশ রুপিয়ার 'অযীফা' বেছে নিয়েছিলেন এবং লিল্লাহী তালীমকে অধ্যাপনার সম্মানের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে বলেছিলেন–

'ইলমের খিদমত থেকে যদি বিমুখ হয়ে যাই তাহলে আগামীকাল আল্লাহর কাছে আমি কী জবাব দেবো?'

আপনার পূর্বপুরুষদের মাঝে রয়েছেন দারুল উলূম দেওবন্দের 'বানী' ও প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসিম নানুতবী (রহ)-এর মত মহান ব্যক্তি যিনি দশ রুপিয়ার ভাতা থেকে দুই রুপিয়া এই বলে বাদ দিয়েছিলেন যে, দুই রুপিয়া আমি আম্মার খেদমতে ব্যয় করতাম। তাঁর ইন্তিকালের পর এটা আমার জন্য অতিরিক্ত, যার হিসাবের দায় থেকে কেয়ামতের দিন আমি বাঁচতে চাই।

আপনার নিকট অতীতের পূর্বপুরুষদের মাঝেও রয়েছেন এমন এমন নিবেদিতপ্রাণ মুদাররিস যারা বড় বড় প্রতিষ্ঠানের লোভনীয় প্রস্তাবের মোকাবেলায় মাদরাসার সামান্য অযীফাকে এবং উস্তাদ ও শায়খের ছোহবত ও সান্নিধ্যকে সানন্দে গ্রহণ করেছেন এবং অনটন ও কৃচ্ছতার মাঝেই জীবন কাটিয়েছেন। সুতরাং আরব কবি ফারাযদাকের এই 'আত্মগৌরবী' কবিতা বলার অধিকার অবশ্যই আপনার আছে–

أولئك آبائي فجئني بمثلهم / إذا جمعتنا يا جرير المجامع

'এই স্বনামধন্যরা হলেন আমার পূর্বপুরুষ। হে জারীর! আমাদের জমজমাট মজলিসে তাদের একজনমাত্র তুলনা পেশ করো দেখি!'

বন্ধুগণ! আমার কথায় এমন যেন মনে না করেন যে, সমাজ ও সময়ের পরিবর্তন, জীবনযাত্রার চাহিদা ও প্রয়োজন এবং হিম্মত ও মনোবলের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার অনুভূতি আমার নেই, কিংবা এ যুগে আমি সে যুগের আত্মত্যাগ ও কোরবানি চাই। না, এমনকি নিকট অতীতের নমুনাও আমি আপনাদের কাছে দাবী করি না। তবে এ কথা অবশ্যই বলবো যে, যে পথ ও পন্থা এবং যে জীবন ও চিন্তা আপনারা গ্রহণ করেছেন, নিঃসন্দেহে তা মেহনত ও মোজাহাদা, ত্যাগ ও আত্মত্যাগ এবং কৃচ্ছতা ও অল্পেতুষ্টির দাবীদার। এ পথ উচ্চ মনোবল ও বুলন্দহিম্মতের পথ। জীবনের জন্য যে পথ আপনারা গ্রহণ করেছেন, কিংবা তাকদীরে ইলাহী আপনাদের জন্য নির্বাচন করেছে তা পার্থিব উচ্চাভিলাষ পূরণের এবং জাগতিক উন্নতি সাধনের পথ নয়। এ পথে তো আপনাকে শুনতে হবে সমাজের কটাক্ষ যে–

قد كنت فينا مرجوا قبل هذا

'এর আগে আমাদের নযরে তুমি তো ছিলে ভবিষ্যতের আশা-ভরসা। কিন্তু যে পথ ধরেছো তাতে তো অভাবই নিত্যসঙ্গী তোমার, আর ভবিষ্যত হলো অন্ধকার। অথচ দেখো, অমুকের পুত্র– তোমারই সমবয়সী– কোথায় চলে গেছে, আর তুমি কোথায় পড়ে আছো!'

এধরনের আরো বহু কথা ও কটাক্ষ আপনাকে শুনতে হবে। এ পথে আপনাকে প্রথম যে পাঠ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে তা হলো–

و لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ، ورزق ربك خير و أبقى

'তাদেরকে দুনিয়ার যে চাকচিক্য ভোগ করতে দিয়েছি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে, সেদিকে চোখ তুলে তাকিও না। কেননা তোমার প্রতিপালকের দেয়া রিযিকই উত্তম ও অধিক স্থায়ী।'

কিন্তু এর ফল ও প্রতিফল কী? তাও শুনুন–

و جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا و كانوا بآياتنا يوقنون

'তারা যে ছবর করেছে আর আমার আয়াতকে বিশ্বাস করেছে তাই তাদেরকে আমি পথপ্রদর্শনকারী ইমাম বানিয়েছি।'

এই ঈর্ষণীয় আধ্যাত্মিক স্তর সম্পর্কেই মাওলানা রুমী (রহঃ) বলেছেন—

معده را بگزار سوئے دل خرام　　تاکہ بے پردہ ز حق آید سلام

'উদর চিন্তা ত্যাগ করো, হৃদয়ের পথে যাত্রা করো, পর্দার আড়াল ছেড়ে তোমার কাছে নেমে আসবে আসমানী সালাম।'

বুঝতে শিখুন যামানার নিস্বতা

বন্ধুগণ! জীবন সংগ্রামের পথে হীনমন্যতার যে অনুভূতি আজ আপনাদের যন্ত্রণাদগ্ধ করছে তার একটা কারণ তো এই যে, নিজেদের প্রকৃত অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে আপনারা অবগত নন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য আগেই বলেছি।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, আজকের পৃথিবীর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কেও আপনাদের সঠিক ধারণা নেই। জীবনের গুরুভারে আমাদের সময় ও সমাজ কতটা বিপর্যস্ত ও অসহায় এবং হৃদয় ও আত্মার জগতে কেমন ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত তা আপনাদের জানা নেই। অজ্ঞতার কারণে বাইরের চাকচিক্যে আপনাদের মনমস্তিষ্ক এমনই প্রভাবিত যে, করুণার চোখে না দেখে পৃথিবীকে আপনারা কামনার চোখে দেখছেন। আধুনিক জীবনের বাহ্যরূপ তো দেখেছেন, স্বরূপ দেখেন নি। কাছে থেকে নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখলে পরিষ্কার বুঝতে পারবেন, এই যুগ, এই সমাজ কতটা দেউলিয়া ও হতাশাগ্রস্ত।

সবচেয়ে বড় কথা, সময় ও সমাজ নিজেও তার দেউলিয়াত্ব তীব্রভাবে অনুভব করছে। সওদাগরের সব মুদ্রা জাল প্রমাণিত হয়েছে, শিকারীর সব তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে এবং দূর থেকে দেখা মরুপথের 'জলতরঙ্গ' মরীচিকা সাব্যস্ত হয়েছে। এককথায় সব দর্শন ও মতবাদ এবং জীবন ব্যবস্থা ও সমাজ কাঠামো ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। সব স্বপ্ন আজ দিবা-স্বপ্নে পরিণত হয়েছে।

আপনার কাছে নবুয়তে মুহাম্মদীর যে জ্ঞানভাণ্ডার ও সত্য-সম্পদ রয়েছে নিজের অযোগ্যতা ও স্থূলদৃষ্টির কারণে সমাজের সামনে তা তুলে ধরতে আপনি সংকোচ বোধ করছেন। কারণ আপনার ধারণা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এবং শিল্প ও অর্থনীতির এ বিপ্লবের যুগে উটের যুগের কথা কীভাবে বলা যায়? অথচ বাস্তবতা এই যে, পৃথিবী ও তার মানব সমাজ সেগুলোর জন্যই এখন ব্যাকুল ও সতৃষ্ণ। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে ও শিল্পে, শক্তিতে উন্নত সব জাতি আজ এমন ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের প্রতীক্ষায় আছে যারা তাদেরকে জীবনের নতুন পথ দেখাবে, অনন্ত যাত্রার পাথেয় যোগাবে এবং মুহাম্মদে আরাবীর বাণী ও পায়গাম শোনাবে।

কবির ভাষায়−

همه آهوان صحرا سر خود نهاده بر کف
بامید آں کہ روزے بشکار خواهی آمد

'বিশুষ্ক মরুভূমির প্রতিটি তপ্ত বালুকণা তাকিয়ে আছে মেঘের দিকে, কখন নেমে আসবে বৃষ্টিধারা! শীতল হবে, তৃপ্ত হবে মরু সাহারা!'[১]

আসলম সম্পদ ইলমে নববী

অন্তর্দৃষ্টির অভাবে দ্বীন ও শরীয়তের যে বাণী ও বক্তব্যকে আপনি সাধারণ ভাবছেন, আপনার কাছে যার গুরুত্ব নেই, বড় বড় স্কলার ও বিদগ্ধ পণ্ডিৎকে আমি তা মন্ত্রমুগ্ধের মত শ্রবণ ও গ্রহণ করতে দেখেছি। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সামনে যখনই নবুয়তের শিক্ষা ও দীক্ষার আলোচনা এসেছে পরিষ্কার মনে হয়েছে, বহু উঁচু থেকে অনেক নীচের মানুষকে যেন সম্বোধন করা হচ্ছে এবং নতুন কিছুর সাথে নতুন পরিচয় যেন তারা লাভ করছে। এমন কিছু যা তাদের কান এত দিন শুনে নি, কিন্তু শোনার জন্য উৎকর্ণ ছিলো। দুনিয়ার বাজারে দুনিয়ার পণ্যসম্ভার নিয়ে আপনি হাজির হতে চান, তারপর যদি بضاعتنا ردت إلينا (আমাদের সম্ভার এনেছো আমাদের কাছে) বলে তারা তা ফিরিয়ে দেয় তাহলে কোন্ যুক্তির জোরে আপনি যামানার শীতল আচরণের অভিযোগ করবেন?

জীবনের যন্ত্রণায় দগ্ধ পৃথিবী তো আশা করে যে, আপনি তাকে নবুয়তের বাণী ও পায়গাম এবং তত্ত্ব ও হাকীকত শোনাবেন, নবুয়তের পথ ও পন্থা এবং আহকাম ও বিধান বোঝাবেন। পৃথিবী এখনো নবী ও নবুয়তের সামনে মাথা নত করতে প্রস্তুত। মানুষের মেধা ও প্রতিভা এবং চিন্তা ও চেতনা এখনো তা গ্রহণ করার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত, যেমন ছিলো খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকের পৃথিবীর সীমাবদ্ধ পরিবেশে। আপনার কাছে গ্রীকদের প্রকৃতি বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান ও মহাকাশ বিজ্ঞানের যে ক'টি ছেঁড়া পাতা আছে, তার মোকাবেলায় ইউরোপের কাছে রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তি এবং পরীক্ষা ও নিরীক্ষার বিশাল ভাণ্ডার। সুতরাং এটা বাস্তব সত্য যে, আজকের বিজ্ঞানগর্বী ইউরোপকে গ্রীকদর্শনের তত্ত্ব জটিলতা এবং বুদ্ধিবৃত্তির সূক্ষ্মতা দিয়ে প্রভাবিত করা সম্ভব নয়। কেননা গ্রীক

১। কবিতাটির শাব্দিক তরজমা এই−
মরুভূমির ক্ষুধার্ত প্রাণী বিষণ্ন বদনে বসে আছে উন্মুখ হয়ে/ এ আশায় যে, আজ না হোক কাল কোন না কোন শিকার আসবে নিশ্চয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ শেষ হয়ে গেছে এবং সে তার জীবন ও জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু আম্বিয়া আলাইহিমুস-সালামের যে ইলম ও হাকীকত এবং রূহানিয়াত ও নূরানিয়াত আপনার কাছে রয়েছে ইউরোপ-এশিয়া এখনো তা থেকে বঞ্চিত এবং সে জন্য তৃষ্ণার্ত। আপনার চিন্তা-গবেষণার এবং জ্ঞানচর্চার কিছু না কিছু জবাব আছে তাদের কাছে, কিন্তু নবুয়তের মু'জিযা ও অলৌকিকত্বের কোন জবাব নেই। আপনি আপনার আসল শক্তি ও সম্পদ নিয়ে আগে বাড়ুন এবং পূর্ণ আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে যিন্দেগীর ময়দানে নেমে আসুন। এখানে আপনার কোন প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। আপনার কাছে মানবতার নামে যে দাওয়াত ও পায়গাম আছে, আপনার কাছে ইলম ও হাকীকাতের এবং অন্তর্জ্ঞান ও মা'রিফাতের যে ঝরণাধারা রয়েছে এবং যে মহান সত্তার সঙ্গে আপনার গোলামির সম্পর্ক-সৌভাগ্য রয়েছে তারপর তো আপনি অবশ্যই সগৌরবে বলতে পারেন–

عجب کیا گرمه و پرویں مرے نخچیر هو جائیں
که بر فتراك صاحب دولتے بستم سر خودار
وه دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے
غبار راه کو بخشا فروغ وادی سینا

'আশ্চর্য কী চাঁদ-তারা যদি হয় আমার অনুগত! আমি তো গোলাম তাঁর, যিনি সবার সেরা, যিনি নবীকুল শিরোমণি। পথের ধুলিকণাকে যিনি দান করেছেন সিনাই মরুর বিশালতা।

জীবনের সঙ্গে ইসলামী ইলমের সংযোগ রক্ষায় পূর্ববর্তীদের প্রচেষ্টা

প্রিয় বন্ধুগণ! শুরুতেই আমি বলেছি, আপনাদের সম্পর্কের এক প্রান্ত নবুয়তে মুহাম্মদীর সঙ্গে যুক্ত। এই সংযুক্তির দায় ও দায়িত্ব কী কী? এতক্ষণ আমি সে বিষয়েই বিশদ আলোচনা করেছি।

আমি আরো বলেছি যে, আপনাদের সম্পর্কের অপর প্রান্ত মানব-জীবনের সঙ্গে যুক্ত। এখন আমি আরয করতে চাই, জীবনের সঙ্গে এই সংযুক্তি আপনাদের উপর কী কী দায়-দায়িত্ব অর্পণ করে এবং সে জন্য কী কী প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজন? এবং এ সম্পর্কের হক কী ভাবে আপনারা আদায় করতে পারেন?

বন্ধুগণ! নবুয়তে মুহাম্মদী আমাদেরকে যে ইলম ও মহাজ্ঞান, যে হাকীকত

এবং যে বিধান ও মূলনীতি দান করেছে তাতে তো বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, আর আপনাদের মহান পূর্বসূরীদের তাজদীদী অবদানও এটাই যে, তাঁরা পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিমার্জনের কোন সুযোগ দেন নি, বরং পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় হুবহু তা আমাদের হাতে পৌছে দিয়েছেন।

তবে সেই সাথে এ বাস্তব সত্যও মনে রাখতে হবে যে, আমাদের মহান পূর্বসূরীগণ প্রত্যেক যুগে নুবয়তের ইলমী আমানতকে জীবনের সর্বস্তরে প্রয়োগ করার প্রচেষ্টাও পূর্ণ অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁরা আল্লাহ-প্রদত্ত মেধা ও প্রতিভা এবং শ্রম ও সাধনা দ্বারা নবুয়তের ইলম ও হাকীকত এবং আহকাম ও বিধানের সমগ্র সম্পদসম্ভারকে সচল ও জীবন্ত এবং কার্যকর ও সার্বজনীন জীবন-বিধান বলে প্রমাণ করেছেন এবং এগুলোর এমন পূর্ণাঙ্গ ও জীবনধর্মী ব্যাখ্যা-পর্যালোচনা উপস্থাপন করেছেন যে, সমকালীন প্রজন্মের মন-মস্তিষ্ক ও চিন্তা-চেতনা সহজেই তা আত্মস্থ করতে পেরেছে। নিজেদের সময় ও সমাজ এবং চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরের মাঝে এবং দ্বীন ও শরীয়তের শিক্ষা-দীক্ষা এবং আহকাম ও বিধানের মাঝে কোন দূরত্ব ও পার্থক্য তারা অনুভব করে নি। দ্বীন ও শরীয়তের মৌল উদ্দেশ্য ও প্রত্যক্ষ বিধানের ব্যাপারে আমাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে ছিলো পর্বতের অটলতা এবং ইস্পাতের দৃঢ়তা, কিন্তু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং প্রকাশ ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ছিলো পুষ্পের কমনীয়তা এবং মখমলের কোমলতা। বস্তুত সাইয়েদুনা আলী (রাঃ) এর এই প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী ও হেদায়াতের উপর তাঁদের পূর্ণ আমল ছিলো–

كلموا الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله و رسوله؟

'মানুষের সঙ্গে তাদের চিন্তা ও বুদ্ধির স্তর অনুযায়ী কথা বলো। তোমরা কি চাও যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হোক!'

মোটকথা, যুগের চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্তর অনুযায়ী দ্বীন ও শরীয়তের ব্যাখ্যা উপস্থাপনের দায়িত্ব তারা পালন করেছেন এবং সময়ের প্রয়োজন ও প্রবণতার প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রেখেছেন।

তৃতীয় শতকে খলীফা আল-মামুন ও আল-মু'তাছিমের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের জোয়ার এলো এবং মু'তাযিলা মতবাদ ও চিন্তাধারায় সমকালীন চিন্তা-চেতনা ও মন-মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন হলো। মু'তাজিলাদেরই মনে করা হতো চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির একক প্রতিনিধি এবং ই'তিযাল (মুতাযিলাদের মত ও মতবাদ)ই ছিলো যুগের ফ্যাশন ও মুক্তবুদ্ধির পরিচায়ক।

সেই কঠিন যুগ সন্ধিক্ষণে ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী (রহঃ)

মু'তাযিলাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ইজারাদারির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং তাদের মোকাবেলায় তাদেরই ভাষা ও পরিভাষায় এবং তাদেরই রীতি ও পন্থায় দ্বীন ও শরীয়তের বক্তব্য উপস্থাপন শুরু করেছিলেন। আর যেহেতু পারিভাষিক অভিনবত্ব ও শৈলীগত বৈশিষ্ট্যই ছিলো মু'তাযিলাদের বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব ও চিন্তানৈতিক নেতৃত্বের বুনিয়াদ সেহেতু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলিম জাহানে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক 'তেলেসমাতি' ভেঙ্গে গেলো এবং দ্বীন ও শরীয়তের পরিমণ্ডলে যে সর্বগ্রাসী হীনমন্যতাবোধ ছড়িয়ে পড়ছিলো হঠাৎ তা থেমে গেলো এবং হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে এলো। এ প্রসঙ্গে আল্লামা আবু বকর ছায়রাফী (রহঃ) এর মন্তব্য হলো–

'মু'তাযিলারা বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মোকাবেলায় শায়খ আবুল হাসান আশা'আরীকে পয়দা করলেন, আর তিনি তাঁর অনন্যসাধারণ মেধা ও যুক্তিকুশলতা দ্বারা তাদের থামিয়ে দিলেন।'

এই যুগান্তকারী অবদানের কারণেই আল্লামা আবু বকর ঈসমাঈলী-এর মত বিদগ্ধ গবেষক তাঁকে 'মুজাদ্দিদীনে উম্মতের' কাতারে শামিল করেছেন। ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী (রহঃ) এর পর তাঁর চিন্তাধারার অনুসারী আলিমগণ তাঁর অসমাপ্ত কর্ম-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলেন এবং সেই ধারাবহিকতায় কাযী আবু বকর বাকিল্লানী ও আবু ইসহাক ইসফারাঈনী-এর মত জগদ্বরেণ্য কালামবিশারদ এবং আল্লামা আবু ইসহাক শীরাযী ও ইমামুল হারামাঈন-এর মত স্বনামধন্য শিক্ষাগুরুর আবির্ভাব ঘটলো, যাদের যুগোপযোগী কীর্তি ও কর্মের কল্যাণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইলমী শান ও চিন্তাগত শ্রেষ্ঠত্ব বহাল হলো। কিন্তু ইতিমধ্যে গ্রীকদের জ্ঞানভাণ্ডার আরবীতে ভাষান্তরিত হয়ে গিয়েছিলো এবং বাতেনী সম্প্রদায় ও দার্শনিক সমাজ দর্শন শাস্ত্রের উপর এমন ঐশ্বরিক পবিত্রতা আরোপ করেছিলো যে, মুসলিম সমাজে সেটাই জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির এবং হক ও সত্যের মাপকাঠি হয়ে গেলো।

এদিকে ইলমে কালামের মহল– যারা হবেন সবচেয়ে যুগসচেতন ও জাগ্রতমস্তিষ্ক – তারাই স্থবিরতা ও অনুকরণপ্রিয়তার শিকার হলেন। তাদের অনমনীয় দাবী ছিলো এই যে, আশ'আরী ও মাতুরীদী আকায়েদ দাড়ি-কমাসহ মানতে হবে। অর্থাৎ তাদের ভাষা ও পরিভাষা এবং যুক্তিপ্রয়োগ পদ্ধতিও হুবহু অনুসরণ করতে হবে। অথচ যুগ ও সময়ের দাবী ছিলো নতুন প্রমাণ ও প্রমাণপদ্ধতির এবং নতুন ইজতিহাদ ও চিন্তাশক্তির।

ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী (রহঃ) এর যুগ ছিলো দর্শনশাস্ত্রের শৈশব

যুগ, যখন মুসলিম জাহানে তার সবেমাত্র পরিচয় গড়ে উঠছিলো। কিন্তু পঞ্চম শতক ছিলো দর্শনশাস্ত্রের পূর্ণ যৌবনকাল এবং জীবন ও সমাজের উপর তার নিয়ন্ত্রণ ছিলো নিরঙ্কুশ । তাই তখন প্রয়োজন ছিলো এক নতুন ইলমী ব্যক্তিত্বের, নতুন চিন্তা-চেতনার এবং নতুন ইজতিহাদ ও নতুন ইলমুল কালামের। এজন্য আল্লাহর গায়বী নেযাম ইমাম গায্যালী (রহঃ) কে তৈয়ার করেছিলো। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (রহঃ) তাঁর গবেষণা গ্রন্থে ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস এবং নীতি ও মূলনীতিগুলো নতুন আঙ্গিকে ও নতুন পদ্ধতিতে আলোচনা করলেন এবং সেগুলোর প্রমাণকল্পে এমন যুক্তি ও ভিত্তি উপস্থাপন করলেন যা সে যুগের ধারা ও প্রবণতার বিচারে অধিকতর প্রভাবক ও হৃদয়গ্রাহী ছিলো। তাঁর যুক্তি-অবতারণা ও প্রমাণ-পর্যালোচনার অভিনব রীতি ও পদ্ধতি নতুন প্রজন্মের অন্তরে দ্বীন ও শরীয়তের মর্যাদা এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করেছিলো এবং হাজারো অস্থির চিত্ত ও বিদ্রোহী মস্তিষ্ককে শান্ত ও আশ্বস্ত করেছিলো।

কালামশাস্ত্রীয় মহল যদিও তখন ইমাম গায্যালীর অবদানের যথাযোগ্য মূল্যায়ন করতে পারেনি, বরং ইলমুল কালামের সনাতন চিন্তা-রেখা থেকে সরে আসায় তাঁর সমালোচনাই করেছে এবং ইমাম সাহেবও فيصل التفرقة بين الإسلام و الزندقة নামক কিতাবে তার জবাব দিয়েছেন, কিন্তু অবশেষে ইসলামী জাহানকে তাঁর এ গৌরবময় 'তাজদীদী' অবদান স্বীকার করতে হয়েছে।

ইমাম গায্যালী (রহঃ) যখন দেখলেন যে, দর্শন ও দর্শন-পূজারীদের বক্তব্য খণ্ডনের জন্য সরাসরি মূল উৎস অধ্যয়নের মাধ্যমে দর্শন শাস্ত্রের সুগভীর জ্ঞান অর্জন করা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সমালোচনার যোগ্যতা লাভ করা প্রয়োজন তখন নির্দ্বিধায় তিনি দর্শনচর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন। (আলমুনকিয মিনাদ-দালাল কিতাবে তাঁর বক্তব্য মতে) দীর্ঘ দু' বছর তিনি দার্শনিকদের জ্ঞান-গবেষণা এবং মত ও মতবাদ সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশোনা করেছেন এবং বাতেনী সম্প্রদায়ের আকায়েদ ও বিশ্বাস সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি অর্জন করেছেন। এভাবে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের পর প্রথমে তিনি 'মাকাছিদুল ফালাছিফা' এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে 'তাহাফাতুল ফালাসিফা' গ্রন্থ রচনা করেছেন।

তাহাফাতুল ফালাসিফা কিতাবে তাঁর নতুন অবদান ছিলো এই যে, এতদিন ইসলামের পক্ষ হতে কালামশাস্ত্রীয় আলিমদের বক্তব্য ছিলো শুধু আত্মরক্ষামূলক, যা চিরকাল দুর্বল পন্থা বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। ইমাম গায্যালী (রহঃ) প্রথম বারের মত দর্শনশাস্ত্রের কাঁচমহলে আঘাত হেনেছিলেন

এবং পাশ্চাত্যের দর্শনশাস্ত্রীয় ইতিহাস লেখকদের মন্তব্য মতে একশ বছর পর্যন্ত দর্শনশাস্ত্রের প্রাসাদ গায্‌যালীর হামলায় কম্পমান ছিলো। প্রায় নব্বই বছর পর দার্শনিক সমাজ ইবনে রুশদের 'তাহাফাতুত-তাহাফাহ' এর মাধ্যমে ইমাম গায্‌যালীর কিতাবের জবাব পেশ করেছে।

ইমাম গায্‌যালীর পর প্রয়োজন ছিলো এমন এক ব্যক্তিত্বের যিনি দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তিমূলে আরো সুশৃঙ্খল আঘাত হানবেন এবং অকাট্যভাবে প্রমাণ করবেন যে, দর্শনশাস্ত্রের সমগ্র ব্যবস্থা ও কাঠামো অনুমাননির্ভরতা ও 'যুক্তি-কল্পতা' ছাড়া আর কিছু নয়। এমন কঠিন ও জটিল দায়িত্ব পালনের জন্য যেমন প্রয়োজন ছিলো দর্শনশাস্ত্রের সুগভীর জ্ঞান ও ব্যাপক পড়াশোনার তেমনি প্রয়োজন ছিলো কুশলী ও সমালোচক মস্তিষ্কের এবং সাহসী ও শক্তিশালী কলমের। এ কাজের জন্য শায়খুল ইসলাম আল্লামা হাফেয ইবনে তায়মিয়া আগে বাড়লেন। الرد على المنطقيين সহ বিভিন্ন গ্রন্থে জোরালো যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে তিনি দর্শনশাস্ত্র ও তার পুরো চিন্তাকাঠামোকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করে দিলেন। তাঁর ইজতিহাদী গ্রন্থসমূহ এখনো যুগের চিন্তাকে নতুন খোরাক এবং মানুষের হৃদয়কে নতুন আস্থা ও বিশ্বাস এবং ভাব ও ভাবনাকে নতুন উদ্যম ও সজীবতা দান করে।

এদিকে দর্শন ও ইলমুল কালাম– উভয়ের সম্মিলিত কর্মকাণ্ডে এক ধরনের স্থূল বুদ্ধিবাদিতা ও যুক্তিপ্রবণতা বিস্তার লাভ করলো, যার ফলে ইসলামী জাহানে এ ভুল ধারণা শিকড় গেড়ে বসলো যে, চিন্তাচর্চা ও যুক্তি প্রয়োগই হলো ঈমান ও বিশ্বাস এবং জ্ঞান ও সত্য লাভের একমাত্র পথ। এই ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী কলম-জিহাদের সূচনা করলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর অমর গ্রন্থ 'মছনবী' ছিলো সপ্তম শতাব্দীর চিন্তা ও বুদ্ধির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে হৃদয় ও আত্মার এক অনুপম প্রতিবাদ। বস্তুত মছনবী শুধু ইলমুলকালামের একটি ইজতিহাদি কিতাবই নয়, বরং এক নতুন ইলমুল কালামের এবং হৃদয় ও ভাবধর্মী যুক্তিপ্রয়োগের নতুন বুনিয়াদ। ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস এবং আহকাম ও বিধানের যৌক্তিকতা তুলে ধরার জন্য তিনি নতুন ধারার নতুন নতুন যুক্তি-প্রমাণ এবং নতুন নতুন উদাহরণ পেশ করলেন, যা যুগপৎ হৃদয় ও আত্মাকে এবং চিন্তা ও মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে এবং উভয়ের ভ্রান্তি দূর করে সত্যের গভীরে গিয়ে প্রবেশ করে। মছনবীর প্রভাব ও হৃদয়গ্রাহিতা এখনো বহাল রয়েছে এবং দর্শনপ্রভাবিত মহলের জন্য এখনো তা অব্যর্থ আঘাত রূপে বিবেচিত হয়।

মাওলানা রূমী ও হাফেয ইবনে তায়মিয়ার পর দর্শনশাস্ত্র এক নতুন মোড় নিলো। অর্থাৎ চরিত্র ও নৈতিকতা এবং তাছাউফ ও আধ্যাত্মিকতারও সীমানা ডিঙ্গাতে শুরু করলো এবং রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রেও নাক গলাতে শুরু করলো। দর্শনের এই সীমা লঙ্ঘন ও অন্যায় হস্তক্ষেপ রোধ করার জন্য এখন শুধু ইলাহিয়াতের আলোচনা এবং ইলমুল কালামের চর্চা যথেষ্ট ছিলো না। দর্শনের এই সর্বমুখী আগ্রাসন রোধ করা এমন ব্যক্তির পক্ষেই শুধু সম্ভব ছিলো যিনি গ্রীকদের ঈশ্বরতত্ত্বের পাশাপাশি তাদের নীতিবিজ্ঞান এবং মিসরের নব্য প্লেটোবাদ এবং ভারতবর্ষের যোগবাদ এবং মধ্যযুগের রাজনৈতিক চিন্তাধারা সম্পর্কেও পূর্ণ জ্ঞান ও বিচারক দৃষ্টির অধিকারী হবেন। সেই সঙ্গে দর্শন ও আধ্যাত্মবাদ, নীতিশাস্ত্র ও রাজনীতিশাস্ত্র এবং ইসলামের অর্থনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কেও তার অধ্যয়ন ও জানা-শোনা ব্যাপক ও গভীর হবে। এ পর্যায়ে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রহ)-এর মত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হলো এবং তিনি যথাক্রমে حجة الله البالغة ও إزالة الخفاء-এর মত অমর গ্রন্থ লিখে ইসলামের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ এঁকে দিলেন এবং বুদ্ধিবাদী মহলে ইসলামের ইলমী শান ও জ্ঞান-প্রভাব এবং ইসলামী উলূমের চিরন্তনতা এবং আলিম সমাজের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

১৮৫৭ খৃস্টাব্দে ইংরেজ সরকারের নিরংকুশ আধিপত্য বিস্তারের পর নতুন নতুন ফিতনা মাথাচাড়া দিলো। খৃস্টান মিশনারী ও ধর্মপ্রচারকরা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে হামলা শুরু করলো এবং ইসলামী উম্মাহর আলিম সমাজকে মোকাবেলার 'দাওয়াত' দিলো। এর সফল মোকবেলার জন্য বাইবেলীয় সুসমাচারগুলোর গ্রন্থনার ইতিহাস ও ব্যাখ্যা-ভাষ্য এবং ইসলাম ও খৃস্টধর্মের বিরোধ সম্পর্কে সরাসরি অধ্যয়ন ও গবেষণার প্রয়োজন ছিলো। এ ক্ষেত্রেও আলেম সমাজেরই এক বিরল ব্যক্তিত্ব ময়দানে এলেন এবং إظهار الحق এর মত কালজয়ী কিতাব লিখে খৃস্টধর্ম প্রচারের মুখে বাধার প্রাচীর তুলে দিলেন। পরে একই উদ্দেশ্যে তিনি إزالة الأوهام নামে আরেকটি কিতাব লিখেছিলেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিতাব দু'টিকে ইসলামী জাহানে অতুলনীয় মনে করা হয়। খৃস্টান ধর্মপ্রচারকদের কাছে এখনো তা লা-জওয়াব হয়ে আছে।

অন্য দিকে ভারতের আর্য সমাজ উপনিবেশবাদী বৃটিশ সরকারের প্ররোচনায় ইসলামের ঈমান ও আকীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ শুরু করলো এবং বিশ্বজগতের আদিত্ব-অনাদিত্ব, আল্লাহর যাত ও ছিফাত, আল্লাহর কালাম, মৃত্যুপরবর্তী জীবন, কেবলা নির্ধারণ এবং হায়াতুন্নবী-এর উপর যুক্তিগত প্রশ্ন

উত্থাপন শুরু করলো। তাদের প্রশ্নখণ্ডনের জন্য কালাম শাস্ত্রের সনাতন যুক্তি-প্রমাণ যেমন পূর্ণ কার্যকর ছিলো না, তেমনি প্রাচীন যুক্তি-উপাত্ত ও উপাস্থাপন শৈলীও ফলদায়ক ছিলো না। বস্তুত এটা ছিলো এক নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা, যার মোকাবেলার জন্য হযরত মাওলানা কাসিম নানুতবী (রহঃ) নতুন এক ইলমুল কালামের গোড়াপত্তন করলেন। তিনি সহজ-সরল ভাষায় দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ সাধারণ উদাহরণ এবং সর্বসাধারণের বোধগম্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা কঠিন ও জটিল ইলমী ও বুদ্ধিগত বিষয়ের সমাধান উপস্থাপন করলেন। তাঁর রচিত 'তাকরীরে দিল পাযীর' 'হুজ্জাতুল ইসলাম' 'আবেহায়াত' ও 'কিবলানোমা কিতাবগুলো অসাধারণ মেধা, বিশুদ্ধ বোধ ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচায়ক।

অন্যদিকে উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে পাঞ্জাবে কাদিয়ানি ফিতনা মাথাচাড়া দিলো। এটা ছিলো নবুয়তে মুহাম্মদীর বিরুদ্ধে একটি সুপরিকল্পিত বিদ্রোহ এবং ইসলামের সমগ্র আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা কাঠামোকে 'ডিনামাইট' করে (আল্লাহ না করুন) তার ধ্বংসাবশেষের উপর নয়া নবুয়ত প্রতিষ্ঠার অপপ্রয়াস। এই ভয়ঙ্কর ফেতনার মোকাবেলার জন্য কতিপয় দূরদর্শী ও মুখলিছ আলিমে দ্বীন ময়দানে এলেন। তাঁদের মাঝে নাদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী এবং মাওলানা সৈয়দ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) এর নাম ও কীর্তি ছিলো সবচেয়ে উজ্জ্বল।

জীবনকে সঙ্গ দান এবং যুগের চাহিদা পূরণ

প্রিয় বন্ধুগণ! এত বিশদ বিবরণ পেশ করার উদ্দেশ্য এই যে, আপনারা যেন বুঝতে পারেন যে, ওলামায়ে উম্মতের চিন্তা-চেতনা, মেধা-মস্তিষ্ক এবং তাঁদের খিদমতি জাযবা কখনো কোন নির্দিষ্ট গণ্ডীতে স্থির থাকে নি এবং কখনো তাঁরা চিন্তা-বন্ধাত্বের শিকার হননি, বরং সব সময় তাঁরা ইলমের চলমান কাফেলায় আগুয়ান ছিলেন। সময় ও সমাজের স্পন্দিত শিরা থেকে তাঁদের হাত কখনো সরে যায় নি, বরং বিজ্ঞ চিকিৎসকের মত তার স্পন্দন ও গতি-প্রকৃতি তাঁরা অনুধাবন করেছেন। জীবনের স্বভাব পরিবর্তন এবং সময়ের আবর্তন-বিবর্তন সম্পর্কে কখনো তাঁরা বে-খবর হননি, বরং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেছেন। ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর খিদমত ও রাহবারির জন্য সময়ের দাবী হিসাবে যখন যে পথ ও পন্থাকে এবং যে কর্মপদ্ধতিকে তাঁরা কার্যকর ও কল্যাণকর মনে করেছেন নিঃসংকোচে তা গ্রহণ করেছেন। তাঁরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর প্রতি, বিশেষ কোন চিন্তা ও পন্থা এবং

নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁদের কোন দায়বদ্ধতা ছিলো না।

মিসরে ও ভারতবর্ষে যখন সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং ইতিহাস ও সাহিত্যের পথে ইসলামের উপর হামলা শুরু হলো। বিদ্বেষী পশ্চিমা লেখক ও প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদদের পক্ষ হতে ইসলামী ইতিহাসের প্রামাণ্য যুগ ও যুগনায়কদের সমালোচনা শুরু হলো এবং ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শকে বিকৃত ও কালিমালিপ্ত করার অপচেষ্টা শুরু হলো তখন সমসাময়িক আলিম সমাজ থেকেই স্বনামধন্য লেখক-সাহিত্যিক ও কলম-মুজাহিদগণ ময়দানে এসেছেন এবং তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক দস্যুতার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উম্মাহকে তাঁরা এমন কালজয়ী গ্রন্থসম্ভার উপহার দিয়েছেন যা শুধু ইসলামিয়াতের ক্ষেত্রেই নয়, বরং উর্দু সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ছিলো অনন্য। আলিম সমাজ তাঁদের যুগোপযোগি চিন্তা-গবেষণা ও সাহিত্য-সাধনা দ্বারা আধুনিক শিক্ষিত সমাজকে হৃদয় ও চিন্তার জগতে এমনভাবে আশ্বস্ত করেছেন যে, ইসলাম ও ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে তাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব যেমন দূর হলো তেমনি ইসলামের প্রতি তাদের আনুগত্যও সুদৃঢ় হলো। উদাহরণ স্বরূপ মাওলানা শিবলী নোমানী (রহ) এর আলফারূক, কুতুবখানা ইসকান্দারিয়া ও আল-জিযয়া ফিল ইসলাম ছিলো এ বিষয়ে সফল সাহিত্যকর্ম।

পাঠ্যব্যবস্থার ক্রমপরিবর্তন

স্বয়ং আপনাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও নিছাবে তালীমও সাক্ষ্য দেয় যে, ওলামায়ে ইসলাম সময়ের বৈধ প্রয়োজন মেনে নিতে এবং কল্যাণপ্রসূ কোন পথ ও পন্থা গ্রহণ করতে কখনো দ্বিধা-সংকোচ করেননি। আমাদের আজকের এই নিছাবে তালীম যুগে যুগে বিভিন্ন পরিবর্তনের এবং বিভিন্ন ইলমী ও বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা-প্রবণতার প্রতিনিধিত্ব করছে। প্রত্যেক যুগে তাতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জন হয়ে এসেছে। শুধু এই শেষ একশ বছর হলো এমন একটা সময় যখন নিছাব-কাঠামোতে কম থেকে কম পরিবর্তন এসেছে। অথচ রাজনৈতিক ও চিন্তানৈতিক বিভিন্ন মৌলিক পরিবর্তনের কারণে এ সময়কালই ছিলো প্রয়োজনীয় সংস্কারের বেশী হকদার।

দ্বীনের প্রতিনিধিত্বের জন্য বহুমুখী যোগ্যতার প্রয়োজন

প্রিয় বন্ধুগণ! বিপ্লব ও প্রতি-বিপ্লবের এ যুগে দ্বীন ও শরীয়তের সার্থক প্রতিনিধিত্ব এবং ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাখ্যা উপস্থাপন এবং সময় ও সমাজের সামনে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি ও বহুমুখী যোগ্যতার

প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে যে, আপনারা হলেন ইসলামের সিপাহী। এখানে আপনারা আগামী দিনের জীবন-যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। কোন ফৌজি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য সব চেয়ে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক বিষয় হচ্ছে আধুনিক ও প্রাচীন অস্ত্র কিংবা একেলে ও সেকেলে সমর কৌশল সম্পর্কে বিতর্কের অবতারণা। যোদ্ধা ও সিপাহীর কাছে কোন অস্ত্রই নতুন বা পুরাতন নয়। সে শুধু জানতে চায়, এখন রণাঙ্গনে কোন্ অস্ত্র এবং কোন্ সমর কৌশল অধিক কার্যকর?

কোন বিশেষ অস্ত্র বা সমর কৌশলের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অবকাশ তার নেই। তাকে তো প্রয়োজনীয় সব অস্ত্রই হাতে নিতে হবে এবং পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপযোগী সব রণকৌশলই গ্রহণ করতে হবে। আরব কবি অনেক আগেই বলে গেছেন–

كل امرئ إلى / يوم الهياج بما استعدا

'যোদ্ধা তো যুদ্ধ-দিনের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণে সচেষ্ট হয়।'

***

প্রিয় বন্ধুগণ! তালেবানে ইলম এবং ওয়ারিছে নবী হিসাবে যামানার নতুন নতুন ফেতনা সম্পর্কে আপনাদের অবশ্যই অবগত থাকতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, অজ্ঞতার চেয়ে অপরিপক্কতা অনেক বেশী ক্ষতিকর। বর্তমানে আমাদের মাদরাসাগুলোতে নিছক ফ্যাশন হিসাবে কিছু কিছু আন্দোলন ও বাদ-মতবাদের আলোচনা হয়, কিন্তু সে সম্পর্কে তথ্য-অবগতি খুবই সামান্য, সুগভীর অধ্যয়ন ও বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা তো অনেক পরের কথা। কোন বাতিল মতবাদ ও চিন্তাধারা সম্পর্কে এমনকি মৌলিক জ্ঞানও আমাদের নেই। অথচ সময়ের দাবী হলো শাস্ত্রীয় বিশেষজ্ঞ ও বিদগ্ধ ব্যক্তিদের পূর্ণ তত্ত্বাবধানে ও দিকনির্দেশনায় প্রচলিত চিন্তাধারা ও বাদ-মতবাদ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করা এবং সেগুলোর মোকাবেলায় ইসলামী ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। সন্দেহ নেই যে, এ কাজ অতি কঠিন, তবে অতি প্রয়োজনীয়। সুতরাং মাদরাসার প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত ভাবে আমাদেরকে এ পথে অগ্রসর হতে হবে। সময়ের দাবীকে তো অস্বীকার করা যাবে না, যায় না। তাই প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে না হলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে অপরিকল্পিত ভাবেই তা হতে থাকবে, যা কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশী বয়ে আনবে।

আধুনিক অধ্যয়নের সমস্যা ও নাযুকতা

সম্প্রতি আমাদের মাদরাসা-মহলে আধুনিক গবেষণা ও অধ্যয়নের চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে বটে, কিন্তু আফসোসের সঙ্গেই আমাকে বলতে হচ্ছে যে, তাতে গভীরতা ও চিন্তামনস্কতার ছাপ নেই এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের নির্দেশনা নেই। আমি আধুনিক চিন্তা-গবেষণা ও অধ্যয়নের উদার প্রবক্তা। কিন্তু আমি পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই যে, এটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এক্ষেত্রে সঠিক নির্বাচন, পর্যায়ক্রম নির্ধারণ এবং যোগ্য মুরুব্বী ও প্রথপ্রদর্শকের সার্বক্ষণিক সঙ্গ অপরিহার্য। তারও আগে জরুরী হলো চিন্তা-চেতনা এবং বোধ ও বুদ্ধির এই পরিমাণ পরিপক্কতা অর্জন করা যাতে গবেষণা ও অধ্যয়ন থেকে পূর্ণ ফায়দা গ্রহণ এবং প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের সঠিক বিন্যাস ও নির্ভুল ব্যবহার সম্ভব হয়। আসাতাযা কেরামের সঠিক শিক্ষা ও নিবিড় সান্নিধ্য দ্বারা চিন্তা-চেতনা এবং বোধ ও বুদ্ধি পরিপক্ক হলেই শুধু অধ্যয়নকৃত বিষয় থেকে সঠিক কাজ নেয়া এবং তথ্য-উপাত্তের কাঁচামাল থেকে কার্যকর সামগ্রী উৎপন্ন করা এবং ইতিহাস, সাহিত্য ও সাধারণ জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব হবে। এমনকি ধর্ম-সম্পর্কহীন বিষয়ও দ্বীনী ও দাওয়াতী ক্ষেত্রে অনেক সময় এমন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে যা নির্ভেজাল দ্বীনী বিষয়েও কল্পনা করা যায় না। তখন কোরআনের ভাষায়–

من بين فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربين

(গোবর ও রক্তের মধ্য হতে পানকারীদের জন্য সুপেয় খাঁটি দুধ বের করে আনা)-এর বাস্তব প্রকাশ ঘটবে।

পক্ষান্তরে গভীরতা ও পরিপক্কতার বিষয়টি যদি বিবেচনায় রাখা না হয়, চিন্তা-চেতনায় ও মন-মস্তিষ্কে দ্বীন ও ঈমানের বুনিয়াদ যদি সুদৃঢ় না হয় বরং চিন্তা যদি হয় বক্র এবং রুচি যদি হয় অসুস্থ তাহলে কবির ভাষায়–

هر چه گیرد و علتی علت شود

'যা কিছু গ্রহণ করবে রোগ নিরাময়ের জন্য, তাই হবে নতুন রোগের কারণ'

দেশের ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক

এখানে আমি দু'টি বাস্তব সত্যের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথম কথা এই যে, কোন দেশে, কোন সমাজে দ্বীনের খেদমত ও দাওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য এবং গণজীবনে পূর্ণ প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য সে দেশের ভাষা ও সাহিত্যে পূর্ণ পারদর্শী ও পরিচ্ছন্ন রুচির অধিকারী হওয়া এবং জীবন্ত ভাষায় ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনায় বক্তব্য উপস্থাপনের যোগ্যতা অর্জন করা অপরিহার্য। মুখের ভাষা যদি হয় মর্মস্পর্শী এবং কলমের গতি যদি হয় সাবলীল

তখন দ্বীনের দাওয়াত হয় অধিকতর কার্যকর ও ক্রিয়াশীল। এটা এমনই এক মনস্তাত্ত্বিক সত্য ও সাচ্চা হাকীকত যে, যুগে যুগে নবী-রাসূলকেও সর্বোত্তম ভাষা দান করা হয়েছে, যাতে স্বজাতিকে তিনি পূর্ণ আস্থার সাথে সম্বোধন করতে পারেন এবং তাঁর বক্তব্য যেন জাতির মন-মস্তিষ্কে ও হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করতে পারে। তাই কোরআনুল কারীমে বলা হয়েছে–

إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون .

'এই কিতাবকে আমি আরবী ভাষার কোরআন রূপে নাযিল করেছি যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো।'

কোথাও বা বলা হয়েছে– بلسان عربي مبين 'সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় নাযিল করেছি।' আবার ইরশাদ হয়েছে–

و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه

'কোন রাসূলকে আমি তার কাওমের ভাষা ছাড়া প্রেরণ করিনি।'

বিদগ্ধ ব্যক্তিগণ জানেন 'লিসানুল কাওম' বা 'কাওমের ভাষা' দ্বারা শুধু এতটুকু উদ্দেশ্য নয় যে, তিনি তাদের কথা বোঝেন এবং তারাও তাঁর কথা বোঝে, বরং উদ্দেশ্য এই যে, তিনি তাঁর যুগের ভাষা ও সাহিত্যের সর্বোচ্চ মানে উত্তীর্ণ হবেন, বরং সবাইকে ছাড়িয়ে যাবেন। এ ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায় এখান থেকে যে, আলোচ্য আয়াতে এর পরই বলা হয়েছে ليبين لهم – 'যেন তিনি তাদের জন্য বয়ান করতে পারেন।' আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন– أنا أفصح العرب 'আমি আরবের সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী।'

আপনারা জানেন, ইসলামী উম্মাহর তাজদীদ ও সংস্কারের ইতিহাসে এ পর্যন্ত যারা অবিস্মরণীয় কীর্তি ও কর্ম এবং বড় বড় খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং মুসলিম সমাজের মন-মানস ও চিন্তা-চেতনায় গভীর প্রভাব সৃষ্টি করেছেন সাধারণত তাঁরা ভাষা ও সাহিত্যের এবং মুখ ও কলমের প্রবল শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁদের কথায় ও লেখায় ছিলো উন্নত সাহিত্য-রুচি ও অলংকার সৌন্দর্যের অপূর্ব প্রকাশ।

হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ) এর মাওয়ায়েয ও নীতি-বক্তৃতাগুলো আজও জাদু-বাগ্মিতা ও আবেদনময়তার জীবন্ত নমুনা রূপে স্বীকৃত। তদ্রূপ মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহঃ) এর মাকতুবাত সাহিত্যের গতি ও শক্তি এবং সাবলীলতা ও স্বতঃস্ফূর্ততার বিচারে সে যুগের 'রাজসাহিত্যিক'

আবুল ফযল ও ফায়যীর কলম-কুশলতা ও সাহিত্যমান থেকে বহু উচ্চস্তরে সমাসীন। তদ্রূপ শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রহঃ) এর অমর গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' হচ্ছে আরবী সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভাষার এমন অনন্য সুন্দর নিদর্শন যে, মুকাদ্দামা ইবনে খালদুনের পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে তার চেয়ে উত্তম কিছু আমাদের নযরে পড়ে না। শাহ ছাহেবের ফারসী রচনায়ও যথেষ্ট সৌন্দর্য ও সাবলীলতা রয়েছে। ইযালাতুল খিফা কিতাবের কোন কোন অংশ তো ফারসী সাহিত্যের উজ্জ্বল নমুনা রূপে পেশ করা হয়।

এটা তখনকার কথা যখন আরবী ও ফারসী ছিলো উপমহাদেশে মুসলিম-বুদ্ধিবৃত্তির স্বীকৃত ভাষা। পরবর্তীতে যখন উর্দু ভাষার প্রচলন হলো এবং তা সাধারণ মানুষের প্রধান ভাষার মর্যাদা লাভ করলো তখন খোদ দেহলবী-পরিবারের সন্তানগণই উর্দুকে 'কলমের ভাষা' রূপে গ্রহণ করলেন। শাহ আব্দুল কাদের (রহঃ)-এর কোরআন তরজমা দিল্লীর টাকশালী উর্দুর সুন্দরতম নমুনা রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং প্রামাণ্যতা, সাহিত্যগুণ ও অলংকার সৌন্দর্যের কারণে উর্দু ভাষার ক্লাসিক সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। তদ্রূপ মাওলানা নানুতবী (রহঃ)-এর উর্দু রচনা এমন সরল, সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত যে, জটিলতম ও সূক্ষ্মতম ইলমী ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা সাধারণ পাঠকের রুচিবোধেও গুরুভার মনে হয় না।

পাক-ভারত উপমহাদেশের ভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব সুদীর্ঘকাল আলেম সমাজের হাতেই ছিলো এবং তাঁরাই এদেশের সাহিত্য-নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেছেন। খাজা আলতাফ হোসায়ন হালী, মৌলবী নযীর আহমদ দেহলবী এবং মাওলানা শিবলী নোমানীকে অতি সঙ্গত কারণেই উর্দু ভাষার নির্মাতাদের কাতারে শামিল করা উচিত। উর্দু ভাষার উলামায়ে কেরাম তাদের সূক্ষ্মরুচি, স্বভাব-বিশুদ্ধতা, রসবোধ ও রচনাকুশলতার এমন অনন্য সাধারণ নমুনা রেখে গেছেন যা উর্দু সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ রূপে গণ্য হয়। মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শিরওয়ানীর রচনাসমগ্র এবং নাযিমে নাদওয়াতুল উলামা মাওলানা সৈয়দ আব্দুল হাই (রহঃ) বিরচিত 'তাযকিরায়ে গুলে রা'না' এবং 'ইয়াদে আইয়াম' হচ্ছে উর্দু গদ্যসাহিত্যের এমন অপূর্ব নমুনা যাতে ইতিহাসের গম্ভীরতা, সাহিত্যের কুশলতা ও অলংকারের বর্ণিলতার ঈর্ষণীয় সমাবেশ ঘটেছে। সর্বোপরি প্রাতস্মরণীয় মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নদবী (রহঃ) তো উর্দুসাহিত্যকে জ্ঞানগবেষণা ও সাহিত্য রচনা দ্বারা চিরঋণী করে গেছেন। তাঁর গ্রন্থাবলী এখন যেমন, তেমনি আগামী বহুদিন ভাষা ও সাহিত্যের এবং চিন্তা ও

গবেষণার মানদণ্ড বলে গণ্য হবে। তদ্রূপ মাওলানা আবুল কালাম আযাদের রচনাবলীও উর্দু-ভাষাকে নতুন শক্তি ও গতি এবং নতুন ভঙ্গি ও শৈলী দান করেছে। তার সম্পাদিত আল-হেলাল-এর 'সিহরে হালাল' ও ভাষা-যাদু তো সমগ্র ভারতবর্ষকে বিমুগ্ধ করে রেখেছিলো। এমনকি সাহিত্য ও সংবাদপত্র জগতে এখনো তার নিজস্ব অবস্থান ও মর্যাদা রয়েছে।

আলেম সমাজের এই জাগ্রত চেতনা এবং সময় ও সমাজমনস্কতার সুফল এই ছিলো যে, তাঁদের বিরুদ্ধে কখনো জাতিনির্মাণের মহান কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্নতার এবং সমাজের গতি ও প্রবণতা সম্পর্কে অজ্ঞতার অভিযোগ উত্থাপন করা সম্ভব হয়নি। আলেমগণ স্বদেশে কখনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হয়ে থাকার চেষ্টা করেননি এবং কোন কোন দেশের আলিমদের মত যামানার কাফেলা থেকে পিছিয়ে পড়েননি। দ্বীনের দাওয়াত, উম্মাহর খিদমত এবং সমাজকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে সে ভাষাই তাঁরা ব্যবহার করেছেন যা তখনকার সমাজে সুপ্রচলিত ছিলো এবং সাহিত্যিক মহলে যার কদর ও সমাদর ছিলো।

ওলামায়ে কেরামের এ ঐতিহ্য আমাদেরও ধরে রাখতে হবে এবং এ মহান উত্তরাধিকার যে কোন মূল্যে সংরক্ষণ করতে হবে। আজকের যুগেও যদি আমরা দ্বীনের যথার্থ খিদমত আঞ্জাম দিতে চাই এবং বিশিষ্ট-সাধারণ সর্বমহলে আমাদের চিন্তা-বিশ্বাস ও বক্তব্য পৌঁছাতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই যুগের ভাষায় কথা বলতে হবে এবং যুগের ভাষায় লিখতে হবে। এটা ভাবগাম্ভীর্যের বিপরীত যেমন নয় তেমনি পূর্বসূরীদের রীতি-নীতিরও পরিপন্থী নয়, বরং এটাই দ্বীনী প্রজ্ঞার দাবী।

আরবী ভাষার গুরুত্ব

দ্বিতীয় বিষয় এই যে, সব সময়ের মত এখনো আরবী ভাষা জীবন্ত ও গতিশীল ভাষা। আরব বিশ্বে আরবী ভাষা এখন তার পূর্ণ জোয়ার ও যৌবনকাল অতিক্রম করছে এবং চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে। বিশ্ব-সভায় আরবী ভাষা এখন আইন ও সংবিধান, জ্ঞান ও দর্শন, সাহিত্য ও সংবাদপত্র এবং রচনা ও গবেষণার ভাষা রূপে সর্বোচ্চ মর্যাদায় সমাসীন।

আমাদের মাদরাসা-মহলে এ ভুল ধারণা শিকড় গেড়ে বসেছে যে, প্রাচীন আরবী ভাষা এখন হাদীছ, তাফসীর ও ফেকাহর পরিমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ, এর বাইরে তার বিচরণ নেই। পক্ষান্তরে আধুনিক আরবী নামে নতুন এক ভাষা আত্মপ্রকাশ করেছে যার সাথে দ্বীন ও ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। এই মারাত্মক ভুল ধারণার শিকার হয়ে আলিম ও তালিবে ইলম সমাজ আরবী ভাষা চর্চার

প্রতি নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু আমার উপর যদি আপনারা আস্থা রাখতে পারেন তাহলে আমি পূর্ণ দায়িত্ব সচেতনতার সাথে বলতে চাই যে, তথাকথিত আধুনিক আরবীর কোথাও কোন অস্তিত্ব নেই। আরব বিশ্বে লেখক সাহিত্যিকদের কলমে এবং জ্ঞানী-গুণীদের মজলিসে যে ভাষা ব্যবহৃত হয় তা কোরআন হাদীছ এবং জাহেলিয়াত ও ইসলামী যুগের ভাষার নিকট থেকে নিকটতর ভাষা। এমনকি আধুনিক যুগের দাবী ও প্রয়োজন পূরণের জন্যও তারা আরবী ভাষার প্রাচীন ভাণ্ডার ও কোরআন-হাদীছ থেকেই শব্দ সংগ্রহ করেছেন। এ বিষয়ে তারা যে অনন্য সাধারণ খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তা যেমন বিস্ময়কর তেমনি প্রশংসাযোগ্য। মিসরে নেপোলিয়নের হামলার পর আরবী ভাষার উপর পশ্চিমা ভাষার যে প্রবল আগ্রাসন শুরু হয়েছিলো আলেম সমাজ শুধু যে তার সফল মোকাবেলা করেছেন তাই নয়, বরং অনুপ্রবেশকারী সমস্ত শব্দকে তারা ঝেটিয়ে বিদায় করেছেন এবং সেগুলোর স্থানে খাঁটি আববী শব্দের ব্যবহার নিশ্চিত করেছেন।

আরব বিশ্বে ভাষা ও সাহিত্যের মান এখন এত উন্নত এবং সংবাদপ্রত্র ও প্রকাশনা বিপ্লবের সুবাদে ভাষার সমৃদ্ধ ভাণ্ডার এত সার্বজনীন যে, আরবীতে কলম ধরার জন্য এখন বিরাট প্রস্তুতি ও চর্চা সাধনার প্রয়োজন। আমাদের মাদরাসা-মহলে আরবী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার যে অবস্থা তাতে আরব দেশে আরবদের মাঝে দ্বীনী ও দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করা এক কথায় অসম্ভব। সুতরাং যদি আরব জাহানে দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দিতে হয় এবং ভারতবর্ষের ইলমী খিদমত ও দাওয়াতী মিহনত আরবদের সামনে তুলে ধরতে হয়, সর্বোপরি যদি আরব বিশ্বের সাথে আমাদের দ্বীনী রাবেতা ও ধর্মীয় বন্ধন জোরদার করতে হয় তাহলে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের পরিপূর্ণ ও পরিপক্ক জ্ঞান ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। আর সে জন্য ব্যাপক উদ্যোগ আয়োজনের প্রয়োজন।

বিশেষত বর্তমান যুগে পাক-ভারত উপমহাদেশ এবং এখানকার উলামা সমাজ আরব জাহান থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। কেননা বিশ্ব রাজনীতিতে আরব জাহান ও মধ্যপ্রাচ্যের ভূমিকা এখন বেশ জোরদার এবং দিন দিন তা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তাছাড়া পিছনে যেমন, তেমনি এখন এবং তেমনি ভবিষ্যতেও আরব বিশ্বই হবে ইসলামী জাহানের প্রাণ-কেন্দ্র এবং আরব জাতিই হবে মুসলিম উম্মাহর প্রত্যাশিত নবজাগরণের উৎস। সুতরাং পাক-ভারত উপমহাদেশের আলেম সমাজ যদি আরব জাহানের সঙ্গে দ্বীনী, ইলমী ও কলবী সম্পর্ক জোরদার করার চেষ্টায় ব্রতী না হয় তবে তা তাদের ভবিষ্যতের জন্য

যেমন শুভ হবে না, তেমনি এদেশ ও আরব দেশ কারো জন্য কল্যাণকর হবে না। অতএব এদিকেও আমাদের বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন। ভাষা ও সাহিত্য হলো জীবন্ত ও গতিশীল বিষয়। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কিছু সময়ের জন্যও যদি তা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে এবং চলমান কাফেলা থেকে পিছিয়ে পড়ে তাহলে দীর্ঘদিন তার ক্ষতি ও মাশুল আদায় করতে হয়।

ছহীহ আকীদার হেফাযত

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আমি আপনাদের প্রচুর সময় নিয়েছি। কিন্তু 'বহুদিন পরে পেয়েছি বন্ধুর দেখা, আর খুলে গেছে মনের দুয়ার' তাই কথা দীর্ঘ হওয়াই স্বাভাবিক। এখন বিদায়ের আগে শেষ কথা বলতে চাই, যা শেষে বলা হলেও গুরুত্বে কোন অংশেই কম নয়। আমাদের মহান পূর্ববর্তীদের সবচেয়ে গৌরবময় কীর্তি ও অবদান এই যে, সর্বশক্তি দিয়ে তারা মুসলিম উম্মাহর দ্বীনী জাযবা ও গায়রাত এবং জাতীয় চেতনা ও স্বকীয়তার পূর্ণ হেফাযত ও সংরক্ষণ করেছেন। এ বিষয়ে কখনো তাঁরা সময়ের কোন ফেতনার সামনে আত্মসমর্পণ করেননি। সমাজের কোন বিদ'আত ও রসম-রেওয়াজের সাথে আপোশ করেননি এবং জাহেলিয়াতের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা কোন চিন্তাধারার প্রতি বিন্দুমাত্র শিথিলতা প্রদর্শন করেননি। আপনাদের মহান পূর্বসূরীদের মাঝে বিগত হয়েছেন হযরত মাওলানা শাহ মোহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ ও মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী (রহঃ)-এর মত 'পর্বত-অটল' ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব. যারা ছিলেন দ্বীন ও শরীয়তের অতন্দ্র প্রহরী। তাঁরা জীবনের সবকিছু ত্যাগ করেছেন, সবকিছু বরদাশত করেছেন, কিন্তু সমাজের শরীয়ত বিরোধী কোন আচরণ ও উচ্চারণ বরদাশত করেননি, বিদ'আত ও জাহেলিয়াত যে নামে এবং যে রূপেই মাথা তুলেছে তার সাথে কোন আপোশ করেননি।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের পর এ দেশে যখন পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং লা-দ্বীনী মতবাদ ও চিন্তাধারার তুফান-সায়লাব শুরু হলো তখন তাঁরা পাহাড়ের মত নিজেদের অবস্থানে অটল ছিলেন এবং তার সামনে 'সদ্দে সিকান্দারি'র মত প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। শরীয়তের 'ছোট-বড়' প্রতিটি বিষয়ে তাঁরা এতই দূরদর্শী ও সংবেদনশীল ছিলেন যে, মুসলিম সমাজে শিকড় গেড়ে বসা কোন বিদ'আতী আচার আচরণ ও চিন্তা-বিশ্বাসকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বৈধতার সনদ প্রদান করেননি, বরং দ্বীন ও শরীয়তের সদাজাগ্রত প্রহরী ও তত্ত্বাবধায়কের কঠিন দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। কোন বিদ'আত ও বিচ্যুতি তাঁদের সতর্ক সন্ধানী দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে যেতে পারেনি।

সমাজের নিন্দা-সমালোচনা, আওয়ামের গালি-গঞ্জনা এবং ধর্মব্যবসায়ীদের 'কাফের ফতোয়া' সবকিছু তাঁরা মুখ বুজে সহ্য করেছেন, কিন্তু নীতি ও অবস্থান ত্যাগ করেননি। ফলে সচেতন ও চিন্তাশীল শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ মুসলমান আজ যাবতীয় বিদ'আত থেকে মুক্ত ও নিরাপদ রয়েছে এবং সাধারণ মুসলমানদের জীবনে এখনো কোন বিদ'আত স্বীকৃতি ও বৈধতা লাভ করতে পারে নি। দ্বীন ও শরীয়তের হেফাযাতকারী এই মর্দে মুমিনদের কবরকে আল্লাহ সুশীতল ও শান্তিময় করুন এবং উম্মতের পক্ষ হতে সর্বোত্তম জাযা দান করুন। তাঁদেরই জন্য তো কবি জানিয়েছেন এই মিনতি–

آسماں ان کی لحد پر شبنم افشانی کرے
سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

'আকাশ যেন তাদের সমাধিতে শিশির বর্ষণ করে/ আর সবুজ গালিচা যেন এ ঘরকে সযত্নে ছায়া দান করে।'

তাঁদের ঈমানী প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি এবং দ্বীনী সমঝ ও জ্ঞান-গভীরতার মূল্য এখন আমাদের বুঝে আসে যে, কত সুচারু রূপে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا

মুমিনদের মাঝে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা সত্য করে দেখিয়েছে, তাদের একদল তো (শাহাদাত বরণ করে) জীবনায়ু পূর্ণ করেছে, আর এক দল (শাহাদাতের) অপেক্ষায় রয়েছে। (পূর্ববর্তীদের শাহাদাতের কারণে) তারা (তাদের আচরণে) কোন পরিবর্তন আনেনি।

তাই আপনাদের খিদমতে আমার আকুল আবেদন, মহান পূর্বপুরুষদের গচ্ছিত মহামূল্যবান আমানত আপনারা রক্ষা করুন। 'প্রাণ-প্রাচীর' সৃষ্টি করে এই 'দ্বীন-বাগিচা' তাঁরা রক্ষা করেছেন এবং খুন পসিনা দিয়ে তার সজীবতা ও বাহার অক্ষুণ্ন রেখেছেন এবং যিন্দেগী ও জোয়ানি কোরবান করে আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, দ্বীন-বাগিচার রক্ষা ও পরিচর্যা কীভাবে করতে হয়। কবির ভাষায়–

آغشتہ ایم ہر سر خارے بخون دل   قانون باغبانئ صحرا نوشتہ ایم

'বুকের রক্ত সিঞ্চন করে বাগিচার প্রতিটি বৃক্ষ সজীব রেখেছি এবং মরুভূমির মরুদ্যান রক্ষার উপায় লিখে দিয়েছি। আমাদের বিদায় বেলা বন্ধু,

এবার তোমাদের পালা।'

সুতরাং এই পাক আমানতকে আমাদের সিনার সঙ্গে লাগিয়ে রাখতে হবে এবং এই 'দ্বীন-সম্পদকে' জীবন-সম্পদের চেয়ে মূল্যবান মনে করতে হবে। কিন্তু আপনাদের প্রতি আমার ব্যথিত হৃদয়ের অনুযোগ এই যে, দিন দিন আপনারা কিন্তু তা থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। আপনাদের মহান পূর্বপুরুষদের শ্রেষ্ঠ মেধা, প্রতিভা ও যোগ্যতা যে সম্পদের হেফাযাতে ব্যয় হয়েছে এবং যে কারণে সময় ও সমাজের কাছে তাঁরা – এবং সম্পর্কের সুবাদে আপনারাও – অপ্রিয়পাত্র হয়েছেন সেই সম্পদ এখন আপনাদের হাতছাড়া হতে চলেছে। এমনকি বাস্তব অবস্থা তো এই যে, আপনাদের অনেকেই মহান পূর্ববর্তীদের কর্ম ও কীর্তি সম্পর্কেও অবগত নন। আপনাদের কয়জন আজ শাহ্ ইসমাঈল শহীদকে জানেন ও চেনেন? কিংবা তাঁর 'ছিরাতে মুসতাকীম' ও 'তাকবিয়াতুল ঈমান' পড়েছেন? আপনাদের কয়জন তাওহীদ ও সুন্নতের ছহী হাকীকত জানেন ও বোঝেন, কিংবা বলতে পারেন যে, জাহেলী যুগের লোকদের ঈমান বিল্লাহ-এর হাকীকত কী ছিলো এবং কী কারণে কোরআন তাদেরকে মুশরিক বলেছে? তাওহীদের স্তর কী কী? শিরকের প্রকাশক্ষেত্র কী কী? বিদ'আতের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা কী? এবং বিদ'আতের ক্ষতি ও খাতরা কী কী? এ সকল বিষয়ে আপনাদের পূর্ণ ইলমী ও আমলী প্রস্তুতি দরকার। এ বিষয়ে আপনাদের জ্ঞান ও অর্ন্তজ্ঞান সাধারণের স্তর থেকে অনেক বেশী বিশিষ্ট হওয়া দরকার। কিন্তু আমার আশংকা এই যে, আপনাদের অনেকেই এ সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা থেকেও বঞ্চিত।

নতুন যুগের নতুন ফিতনা

একই সঙ্গে আরেকটি বাস্তব সত্য এই যে, নতুন যুগ এখন নতুন ফেতনা নিয়ে সামনে আসছে। জাহেলিয়াত নতুন নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করছে। আগে ছিলো বিদ'আতের মু'আমালা, কিন্তু এখন শুরু হয়েছে প্রকাশ্য মূর্তি পূজার মোকাবেলা। আগে ছিলো সর্বেশ্বরবাদের শ্লোগান, কিন্ত এখন শুরু হয়েছে একধর্মবাদের জিগির। শুরু হয়েছে জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদসহ বিভিন্ন বাদ-মতবাদের নতুন নতুন ধর্ম। এগুলো এখন আমাদের ধর্মীয় চেতনা, আমাদের দ্বীনী গায়রত এবং আমাদের তাওহীদী আকীদাকে চ্যালেঞ্জ করছে। এখন দেখার বিষয় এই যে, এক সময় যারা সামান্য বিদ'আত ও রসম-রেওয়াজকে ছাড় দিতে প্রস্তুত ছিলো না, তাদের উত্তরাধিকারীরা এই সব শিরক ও কুফুরীকে কীভাবে বরদাশত করে এবং এগুলোর মোকাবেলায় তাদের

নীতি ও অবস্থান কেমন হয়? আমরা তো আমাদের মহান পূর্ববর্তীদের দ্বীনী হিম্মত ও সাহসিকতা, দ্বীনী গায়রত ও চেতনার কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার ক'রি এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সাক্ষ্য দেই যে, বাতিলের সামনে তাঁরা মাথা নত করেন নি, এখন দেখার বিষয় এই যে, আমাদের সম্পর্কে আমাদের পরবর্তীরা কী সাক্ষ্য দেবে? এবং ইতিহাসের পাতায় আমরা কী স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছি?

***

প্রীয় বন্ধুগণ! আসমানী তাকদীরের ফায়সালা আমাদের জন্য যে যুগ ও সময় নির্বাচন করেছে তার দায়-দায়িত্ব বিগত সময়ের তুলনায় অনেক বেশী। তবে আল্লাহর দরবারে তার প্রতিদান ও সম্মানও অনেক বেশী। ঝুঁকি ও ক্ষতির ভয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া এবং সময়ের প্রতিকূলতার কাছে পরাজয় স্বীকার করা সাহসী পুরুষের কাজ নয়, কাপুরুষের কাজ। আপনাদেরকে অবশ্যই সাহসের পরিচয় দিতে হবে এবং এগিয়ে আসতে হবে আগামী দিনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য। আপনাদের হাতে এখনো যতটুকু সময় আছে সেটাকে প্রস্তুতির কাজে ব্যয় করুন। সময়ের গুরুতরতা এবং দায়িত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করুন এবং নিজেকে মূল্যবান ও ফলবান রূপে তৈয়ার করুন, যাতে আগামী দিনে কর্মের ময়দানে উম্মতের সৌভাগ্য নির্মাণে গৌরবময় আবদান রাখা সম্ভব হয়। কবির ভাষায়–

غافل منشیں، نہ وقت بازیست   وقت ہزاست و کارسازیست

গাফেল হয়ো না, সময় কারো জন্য বসে থাকে না।

আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও তার জবাব

আলোচ্য প্রবন্ধ ১২ই আগস্ট ১৯৭২ সালে দারুল উলূম দেওবন্দের এক ছাত্র মজলিসে পঠিত হয়েছিলো। তাতে দ্বীনী মাদরাসার প্রকৃত পরিচয় ও মর্যাদা এবং মাদরাসার শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচনা করা হয়েছে এবং এ মর্মে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, তালিবানে ইলমের কাছে বর্তমান যুগের দাবী ও চাহিদা কী এবং দ্বীনের দাওয়াত ও খেদমত আঞ্জাম দেয়ার জন্য তাদের কী কী প্রস্তুতির প্রয়োজন।

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد

আমার প্রাণপ্রিয় তালিবানে ইলম!

আজ আমি আমার মনের কিছু চিন্তা ও ভাবনা আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই। আমি জানি, দারুল উলূম দেওবন্দের তালিবানে ইলমের খিদমতে বক্তব্য পেশ করা যেমন বড় আনন্দ ও গৌরবের বিষয় তেমনি বিরাট দায় ও দায়িত্বেরও বিষয়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আধুনিক বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন দ্বীনী মাদরাসা ও ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রসমাবেশে বক্তব্য রাখার সুযোগ আমার হয়েছে, কিন্তু আমি নিঃসংকোচে স্বীকার করি যে, দারুল উলূম দেওবন্দের বিষয়টি আমার কাছে অন্য রকম। এখানে আপনাদের সামনে কিছু বলতে আমি অত্যন্ত গুরু দায়িত্বভার অনুভব করি। তবু আপনারা আমার প্রতি যে আস্থা ও মর্যাদা প্রকাশ করেছেন আমি তার কদর করি এবং আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করি।

একসময় এ মহান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমি এক আদনা তালিবে ইলম হিসাবে হাযির হতাম এবং নিজেকে বড় খোশনাছীব ও সৌভাগ্যবান মনে করতাম, আর এখন সেই আমি এখানে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তব্য পেশ করার সৌভাগ্য লাভ করছি। ইলমের জন্য নিবেদিত এবং তালিবানের ইলমের প্রতি দরদী এই মহান বিদ্যাভূমি হয়ত আমার স্মৃতি এখনো ভুলে যায় নি। শায়খুল ইসলাম মাওলানা হোসায়ন আহমদ মদনী (রাহঃ) এর খিদমতে কৃতার্থ তালিবে ইলম রূপে হাঁটু গেড়ে বসার তাওফীক আল্লাহ আমাকে দান করেছিলেন। নিজের জন্য এটাকে আমি বিরাট সৌভাগ্য মনে করি এবং এই ওছিলায় আল্লাহর কাছে বড় কিছু প্রাপ্তির আশা রাখি।

এ সৌভাগ্যের জন্য যথার্থই আমি অশেষ গৌরব অনুভব করতে পারি, তবে দারুল উলূম দেওবন্দের সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্কের ইতিহাস আরো দীর্ঘ ও প্রাচীন। কয়েক পুরুষ থেকেই এ মহান বিদ্যাভূমির সঙ্গে আমার সম্পর্কের ধারা চলে আসছে। হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ ও মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রাহঃ) এর যে জিহাদী কাফেলা এই পুণ্যভূমি অতিক্রম করেছে তাঁদের চোখের পানিতে

এ মাটি অবশ্যই সিক্ত হয়েছিলো এবং তাঁদের দোয়া-যিকিরে এখানকার আকাশ-বাতাস অবশ্যই গুঞ্জরিত হয়েছিলো। আমার ধমনীতে সেই রক্তের প্রবাগ রয়েছে।

যাই হোক, পরম সৌভাগ্য ও গুরু দায়িত্ব উভয়েরই পূর্ণ অনুভূতি আমার রয়েছে। তবে নিজেকে আমি আপনাদের থেকে পৃথক মনে করি না। কেননা আগে যেমন ছিলাম, তেমনি এখনো আমি তালিবে ইলম আছি এবং তালিবে ইলম হিসাবেই জীবনের শেষ নিঃশ্বাস আমি ত্যাগ করতে চাই। ইলম ও তালিবানে ইলমের সাথেই আমার জীবনকে জুড়ে দেয়া হয়েছে এবং আমার হৃদয় ও আত্মার একান্ত কামনা এই যে, এ সম্পর্ক যেন চিরঅটুট থাকে। নবুয়তের পাক যবানে মদীনার আনছারদের শানে যে বাণী উচ্চারিত হয়েছিলো তা অনুকরণ করে আমি আপনাদের বলতে পারি–

المحيا محياكم و الممات مماتكم

আমার জীবন তোমাদের মাঝে, আমার মরণও তোমাদেরই মাঝে।

আল্লাহ্ যেন আমার এ দু'আ ও তামান্না পূর্ণ করেন। আমীন।

দারুল উলূম দেওবন্দের মূল প্রেরণা – দ্বীনী আত্মচেতনা

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম! আপনারা দারুল উলূম দেওবন্দের সৌভাগ্যবান শিক্ষার্থী। আপনাদের কাছে আমি জানতে চাই, কোন্ সে মহান উদ্দেশ্যে আপনাদের এ বিদ্যাঙ্গনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিলো? কী এর মূল বৈশিষ্ট্য? আপনাদের কাছে এ প্রশ্নের বিভিন্ন যুক্তিসঙ্গত ও দলীলসম্মত জবাব অবশ্যই আছে। যদি বলেন, ইলমের প্রচার প্রসার হচ্ছে এর বুনিয়াদি উদ্দেশ্য, তাহলে কে তা অস্বীকার করতে পারে? যদি বলেন, ইখলাছ ও লিল্লাহিয়াত হলো এর বৈশিষ্ট্য তহলে কে তা রদ করতে পারে? কিংবা যদি বলেন, ইহয়ায়ে সুন্নত ও রদ্দে বিদ'আত এবং এক নতুন ও স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে হাদীছ ও উলূমে হাদীছের খিদমত ছিলো এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তাহলেও ভিন্নমত প্রকাশের অবকাশ নেই। এগুলো সবই ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করার এবং গর্ব ও গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করার বিষয়। কিন্তু কথা এই যে, এ সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে পাক-ভারত উপমহাদেশের অন্যান্য দ্বীনী মাদরাসা ও শিক্ষাকেন্দ্রও সমান শরীকদার। অবদান ও মর্যাদার পার্থক্য অবশ্যই থাকবে, তবে সাধরণভাবে এসকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্যই দ্বীনী মাদরাসাগুলোর বুনিয়াদ রাখা হয়েছে। এগুলোই হচ্ছে দ্বীনী মাদরাসার আসল হাকীকত ও

মিল্লাতের ভাগ্যকে হাজার বছরও পিছিয়ে দিতে পারতো, যার ক্ষতিপূরণ হয়ত আর কখনো সম্ভব হতো না।

মাওলানা নানুতবী (রাহঃ) এর আসল বৈশিষ্ট্য

হযরত মাওলানা মোহম্মদ কাসিম নানুতবী (রাহঃ) এবং তাঁর স্বনামধন্য সহকর্মী হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী (রাহঃ) ও অন্যান্যদের মাঝে যে জাযবা ও চেতনা সক্রিয় ছিলো তা হলো ইসলামের প্রতি তাঁদের প্রবল গায়রত ও আত্মমর্যাদাবোধ। এই প্রবল ইসলামী জাযবা ও দ্বীনী গায়রতে উদ্বুদ্ধ হয়েই তাঁরা তখন সময়ের দাবী হিসাবে দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

দ্বীনী উলূমের ক্ষেত্রে মাওলানা নানুতবী (রাহঃ) ইজতিহাদের সুউচ্চ মার্গে সমাসীন ছিলেন। ইলমে কালাম ও মারেফাত তত্ত্বে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে যে অপরিসীম প্রজ্ঞা ও রহস্যজ্ঞান দান করেছিলেন তার জীবন্ত প্রমাণ আপনি দেখতে পাবেন 'আবেহায়াত' 'তাকরীরে দিলপাযীর' ও 'হুজ্জাতুল ইসলাম' গ্রন্থে। কিন্তু আমি মনে করি, তাঁর ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বে-ইনতিহা দ্বীনী গায়রত ও সুতীক্ষ্ণ মর্যাদাবোধ দান করেছিলেন। তাঁর মাঝে ছিলো এক ব্যাকুল আত্মা ও যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয়। তাই সময়ের পরিবর্তন দেখে অস্থির হয়ে তিনি ভাবছিলেন, হিন্দুস্তানের যমীনে ইসলামের খিদমতে যুগে যুগে আমাদের আকাবিরীনের সর্বোত্তম মেধা ও প্রতিভা ব্যয় হয়েছে। ইলমের ময়দানে তাঁরা এমন অসংখ্য কর্ম ও কীর্তি রেখে গেছেন যার নমুনা ইসলামী জাহানের অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। জ্ঞানের চর্চা ও সাধনায় শুধু অংশগ্রহণই নয়, অবিস্মরণীয় অবদানও তাঁরা রেখেছেন এবং 'ইসলামী গ্রন্থাগারে' এমন সব মহামূল্যবান গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন যার তুলনা ইসলামের জ্ঞান-সাধনা ও বুদ্ধিবৃত্তির সুদীর্ঘ ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না।

হিন্দুস্তানই ছিলো মুসলিম উম্মাহর মেধা ও প্রতিভা এবং ইজতিহাদি যোগ্যতা ও কর্মস্পৃহার প্রকাশ ও বিকাশের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র।

গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক এ বিশাল বিস্তৃত ভূমিকে এত সহজেই কি পশ্চিমা সভ্যতার লীলাভূমি হতে দেয়া যায়? মুসলমানদের নতুন প্রজন্ম– যাদের পূর্বপুরুষদের কোরবানীর উছিলায় মানুষ ইসলামের নেয়ামত এবং ইলমের দৌলত লাভ করেছে, শত ঝড়-ঝঞ্ঝা ও তুফানের মুখেও ইসলামের বাতিকে যারা আগলে রেখেছেন এবং বাতিলের মোকাবেলায় দ্বীনের

দুর্গ রক্ষা করেছেন তাঁদেরই পবিত্র রক্তের উত্তরাধিকারীরা আজ দ্বীন ও শরীয়ত এবং ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন ত্যাগ করে চলে যাবে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী শিক্ষা ও সভ্যতার দখলে, যারা শুধু নামে ও জাতীয়তায় হবে মুসলমান, কিন্তু বিশ্বাসে ও চিন্তা-চেতনায় হবে পশ্চিমা সভ্যতার সন্তান?

এটা ছিলো এক জ্বলন্ত প্রশ্ন যা মাওলানা কাসেম নানুতবী (রাহঃ) এর সামনে জীবন-মরণ সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিলো। এ শুধু একটি মাদরাসা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রশ্ন ছিলো না। আমি মনে করি, কেউ যদি ভাবে যে, শুধু কিতাব পড়া ও ইলম চর্চা করার মারকায হিসাবে দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তাহলে তা হবে 'পরিচয়সত্তার বিলুপ্তি সাধন'- এর অপরাধ। দারুল উলূম দেওবন্দের 'প্রাণপুরুষ'দের সাথে এর চেয়ে বড় বে-ইনছাফি আর কিছুই হতে পারে না। এধরনের স্থূল ভাবনা যারা ভাবে তাদের উচিত ঐসকল বুযুর্গানে দ্বীনের রূহের সামনে শরমিন্দা হওয়া। শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রাহঃ) এধরনের কথা শুনে বিস্ময়ে বেদনায় বিমূঢ় হয়ে যেতেন, আর বলতেন, 'আমি দেওবন্দের প্রথম ছাত্র, আর দেওবন্দের পরিচয় তোমরা আমার চেয়ে বেশী জানো! এ তো ইসলামের এক দুর্গ, দা'ঈয়ানে দ্বীন ও মুজাহিদীনে ইসলামের প্রশিক্ষণকেন্দ্র। আরো পরিষ্কার ভাষায়, দারুল উলূম দেওবন্দ হলো মোঘল সালতানাতের নিভে যাওয়া প্রদীপের বিকল্প এবং সর্বোত্তম বিকল্প।'

মোটকথা, মাওলানা কাসিম নানুতবী (রাহঃ) এর সামনে এটাই ছিলো আসল 'মাসআলা' যে, হিন্দুস্তানের পুণ্যভূমিকে আমরা কি বিনা যুদ্ধে পশ্চিমা হানাদারদের হাতে ছেড়ে দেবো? অস্ত্রের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সভ্যতার যুদ্ধেও কি পরাজয় স্বীকার করে নেবো? আমাদের কলিজার টুকরোগুলো– যাদের আমরা কলিজার রক্ত দিয়ে লালন পালন করেছি, যাদের শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে ওলামায়ে দ্বীন, আউলিয়ায়ে উম্মত ও মুজাহিদীনে ইসলামের পবিত্র রক্তধারা তারা শিক্ষা লাভ করবে ইংরেজদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং গড়ে ওঠবে পশ্চিমা সভ্যতার দূষিত পরিবেশে? তারপর বেরিয়ে আসবে ইসলাম ও 'ইসলামিয়াতের' শত্রু হয়ে? এসব কিছু ঘটবে আমাদের চোখের সামনে, আর আমরা বসে থাকবো নিরব দর্শক হয়ে? না, তা হতে পারে না।

মোটকথা, জোশ-জাযবা এবং চিন্তা-চেতনার দরিয়ায় মৌজের তোলপাড় হলো এবং এই মরদে মুজাহিদ ইংরেজ হানাদারদের ছুঁড়ে দেয়া চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। তাঁর শিরায় বহমান 'ছিদ্দীকী খুন' যেন আওয়ায তুলল–

أينقص الدين و أنا حي

আমার জান থাকবে আর দ্বীনের নোকছান হবে?

বস্তুত এই একটিমাত্র বাক্যই ছিলো মাওলানা নানুতবীর ঈমানী জোশ ও জাযবার প্রতিচ্ছবি, যা আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে হযরত ছিদ্দীকে আকবারের পাক যবানে পৃথিবী একবার শুনেছিলো এবং যা ইতিহাসের গতিধারা এবং সময়ের মোড় পরিবর্তন করে দিয়েছিলো। এটা শুধু তিন শব্দের বাক্য নয়, এ তো একটি যুগের শিরোনাম এবং একটি ইতিহাসের সারনির্যাস। আমি মনে করি, হযরত ছিদ্দীকে আকবারের জীবন-চরিত নাও যদি লেখা হতো, এই একটি বাক্যই হতে পারতো তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত। এটা ছিলো এক ইলহামী বাক্য যা আল্লাহ তা'আলা হযরত ছিদ্দীকে আকবারের যবান থেকে বের করেছিলেন। আহত সিংহের ক্রুদ্ধ হুঙ্কারে বনভূমি কেঁপে ওঠে, কিন্তু এই ছিদ্দীকী হুঙ্কারে ছিলো তার চেয়ে বেশী শৌর্য-বীর্য এবং তাপ ও প্রতাপ। আমি মনে করি, এই ইলহামী জাযবা ও গায়রাতই ছিলো আকাবিরীনে দেওবান্দের চালিকাশক্তি যা আল্লাহ হযরত ছিদ্দীকে আকবারের কলবে এবং যুগে যুগে খাদেমানে ইসলামের দিলে দান করেছেন।

তাঁদের উদ্দেশ্য কখনোই এটা ছিলো না যে, দারুল উলূম হবে আরবী ভাষা ও শাস্ত্রচর্চার একটি কেন্দ্র। এ জন্য তো মিসরের আল-আযহার, তিউনিসিয়ার জামেয়া যায়তূনিয়া, মরক্কোর জামেয়া কারাঈন এবং খোদ হিন্দুস্তানের বড় বড় মাদরাসা বেশ শানশওকাতের সঙ্গেই বিদ্যমান ছিলো। সুতরাং শুধু পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্যে এগুলোর সমতুল্য কোন মাদরাসা কায়েম করা- তাও এমন নিঃসম্বল ও লাচার অবস্থায়- নিশ্চয় কোন বিজ্ঞতাপ্রসূত পদক্ষেপ হতো না।

সম্পর্ক রক্ষার চিরন্তন প্রতিশ্রুতি

মূলত এই দ্বীনী গায়রাত ও জাযবা এবং এই চেতনা ও মর্যাদাবোধই মাওলানা কাসিম নানুতবী (রাহঃ) কে অস্থির ও বে-চয়ন করে রেখেছিলো। এবং একারণেই জাগতিক উপায়-উপকরণ ও সহায় সম্বলের মর্মান্তিক দৈন্য সত্ত্বেও তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ নামে ছোট্ট একটি মাদরাসা কায়েম করেছিলেন এবং এই গরীব মাদরাসা অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ে এবং প্রায় অননুভূতভাবে তার সুদূরপ্রসারী কাজের সূচনা করেছিলো। সম্ভবত সে যুগের বড় বড় দূরদর্শী লোকদেরও চিন্তা-অনুভব বিষয়টি আঁচ করতে পারেনি। কিন্তু এর

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো অনেক বিরাট। অর্থাৎ হিন্দুস্তানের 'বেদখল' ভূমিতে ইসলামী তাহযীব্-তামাদ্দুন, ইসলামী সমাজ ও জীবনযাত্রা এবং দ্বীন ও শরীয়তের ইলম ও আমল রক্ষার অপরাজেয় এক দুর্গ গড়ে তোলা এবং এর শিক্ষা ও মর্মবাণীকে বর্তমানের সীমানা অতিক্রম করে 'ভবিষ্যতপ্রসারী' করা–

و جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون (الزخرف)

নিজের ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য তাকে এক চিরন্তন বাণী রূপে রেখে গেলেন যাতে তারা আল্লাহর পথে ফিরে আসতে পারে।

তাঁর সমস্ত চেষ্টা-সাধনার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, হিন্দুস্তান ও হিন্দুস্তানী মুসলমানদের রিশতা ও সম্পর্ক যেন মিল্লাতে ইবরাহীমী ও শরীয়তে মোহাম্মদীর সঙ্গে চিরঅটুট থাকে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারা যেন আখেরি নবীর রেখে যাওয়া শরীয়ত ও জীবন-বিধানের প্রতি পূর্ণ অনুগত থাকে এবং দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের সময় যেন মিল্লাতে ইবরাহীমী ও দ্বীনে মোহাম্মদীর প্রতি ওয়াফাদার ও বিশ্বস্ত থেকে বিদায় নিতে পারে। এ যেন সেই ওছিয়ত ও প্রতিশ্রুতিরই বাস্তবায়ন, যার উল্লেখ কোরআন শরীফে এভাবে এসেছে–

ووصى بها إبرهيم بنيه و يعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا و أنتم مسلمون (البقرة)

আর ইবরাহীম তার পুত্রদের এ কথারই অছিয়ত করেছিলেন এবং ইয়াকুবও (তার পুত্রদের একথাই বলেছিলেন) হে আমার পুত্রগণ! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকেই পছন্দ করেছেন, সুতরাং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।

নয়া যামানা, নয়া ফেতনা

প্রিয় তালিবানে ইলম! আপনাদের এ মহান শিক্ষাঙ্গনের ভিত্তি ছিলো দ্বীনী গায়রাত ও মর্যাদাবোধের উপর এবং যুগের চ্যালেঞ্জ ও যামানার ফেতনা মোকাবেলা করার উপর। তবে আপনাদের সামনে এখন নতুন যুগের নতুন চ্যালেঞ্জ এবং নয়া যামানার নয়া ফেতনা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, আর আপনারা তা উপেক্ষা করতে বা এড়িয়ে যেতে পারেন না। কমপক্ষে দারুল উলূম দেওবন্দ এবং দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার জন্য যুগের চ্যালেঞ্জ এবং যামানার ফেতনা থেকে চোখ বুজে থাকার কোন বৈধতা নেই। কেননা যুগের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের বলিষ্ঠ প্রতিজ্ঞার উপরই এ দুই বিদ্যাপিঠের ভিত্তি রাখা হয়েছিলো। সে

যুগের ফিতনা ছিলো পশ্চিমা সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থা এবং নীতি ও নৈতিকতাহীন ইংরেজী শিক্ষাব সর্বগ্রাসী আগ্রাসন।

কিন্তু ফিতনা ও ফাসাদ কখনো যুগের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে না এবং একই ফিতনা একই রূপে বহাল থাকে না, বরং নতুন নতুন রূপ ধারণ করে এবং নতুন নতুন ফিতনা সামনে আসে এবং তা মুসলিম উম্মাহর সামনে নতুন নতুন বিপদ ও দুর্যোগ ডেকে আনে। অতীতের জাহেলিয়াত নতুন রূপে নতুন অস্ত্রে বলীয়ান হয়ে ময়দানে আসে। আল্লামা ইকবাল ঠিকই বলেছেন–

اگر چہ پیر ہے مومن   جواں ہیں لات و منات

মুমিন যদিও বুড়ো আজ, নওজোয়ান এখনো 'লাত-মানাত'

এটা বড় বিপজ্জনক যে, জাহেলিয়াতের 'লাত-মানাত' তো নতুন তেজে তেজীয়ান, নতুন বলে বলীয়ান এবং আগ্রাসী শক্তিতে আগুয়ান, অথচ 'ওয়ারিছে নবী' পরিচয় যাদের তারা আজ নির্জীব ও হতোদ্যম। তাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে হতাশা, হীনমন্যতা ও পরাজয়ের মানসিকতা। তাগুতি শক্তিগুলো যেখানে নতুন উদ্যমে, নতুন সাজে, নতুন কৌশলে এবং নতুন শ্লোগানে মাঠ তোলপাড় করছে সেখানে উম্মতের পাহারাদার যারা তারা গাফলতের ঘুমে বিভোর হয়ে আছে। কিংবা শক্তি-সাহস হারিয়ে যিন্দেগীর ময়দান ছেড়ে দিয়েছে। 'লাত-মানাত' যেখানে লম্ফে-ঝম্ফে, হুঙ্কারে-ঝঙ্কারে যুদ্ধের আহ্বান জানাচ্ছে সেখানে উলূমে নবুয়তের আমানতদার যারা তারা নিরাপদ আশ্রয়ে দিন গুজরানের কথা ভাবছে। এ কেমন দিন আমাদের তুমি দেখালে হে আল্লাহ!

নতুন যুগের সবচে' বড় ফিতনা

প্রিয় বন্ধুগণ! এ যুগের আসল ফিতনা ও চ্যালেঞ্জ কী? তা এই যে, ইসলামকে তার নিজস্ব তাহযীব-তামাদ্দুন, নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতি, নিজস্ব শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য ও কৃষ্টি থেকে – এক কথায় ইসলামকে তার সমগ্র উত্তারিধাকার সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন করার ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে, যাতে অন্যান্য ধর্ম ও ধর্মসম্প্রদায়ের মত ইসলাম ও মুসলিম জাতিও কতিপয় ইবাদত ও আচার-অনুষ্ঠানের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। বিয়ে-শাদী ও দাফন-জানাযার রুসূমাত নিয়েই তুষ্ট থাকে। এভাবে ইসলাম যেন নিছক আচার-প্রথার ধর্মে পরিণত হয় এবং চিরদিনের জন্য মুসলমান যেন ভুলে যায় যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান।

জানি না আগামীকাল কী হবে, তবে অনুমান করি যে, সম্ভবত এ পর্যায়

এখনো অনেক দূরে, যখন হিন্দুস্তানী মুসলমানকে বলা হবে যে, নামাজ-রোযা চলবে না, কিংবা এই এই আকীদা-বিশ্বাস রাখা যাবে না। কিন্তু এ পর্যায় অবশ্যই এসে গেছে যে, ইঙ্গিতে ইশারায় – এবং কখনো কখনো পরিষ্কার ভাষায়– বলা হচ্ছে যে, মুসলমানেরা যেন স্বেচ্ছায় তাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি পরিত্যাগ করে এবং ঐসব বিষয় এড়িয়ে চলে যা তাদের মাঝে স্বতন্ত্র জাতিসত্তার এবং পৃথক সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের অনুভূতি সৃষ্টি করে। তারা নিজেরাই যেন ঘোষণা দেয় যে, বৃহত্তর ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাইরে তারা স্বতন্ত্র কোন শিক্ষা ও সভ্যতার ধারক নয়। সর্বোপরি তারা নিজেরাই যেন ইসলামের পারিবারিক আইন সংশোধনের দাবী উত্থাপন করে এবং অম্লান বদনে সর্বভারতীয় অভিন্ন পারিবারিক আইন মেনে নেয় এবং 'জাতীয় প্রয়োজন' অজুহাতে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্রগুলোকে ভারতীয় সরকারের ব্যবস্থাপনায় দিয়ে নিজেরা সেগুলোর 'ভবিষ্যত-ভাবনা' থেকে সরে দাঁড়ায়, যাতে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সর্বজাতীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের উপযোগী অভিন্ন ছাঁচে ঢেলে সাজানো যায়।

আমি মনে করি, ভারত সরকার ইসলামের প্রতিপক্ষ নয় এবং মুসলমানদের বিতাড়নেও আগ্রহী নয়। ভারত সরকার তো বরং রীতিমত গর্ব করে যে, ভারতভূমিতেই ইসলামী বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুসলিম জনগোষ্ঠীর অধিবাস। তারা আরামে আয়েশে এবং সুখে শান্তিতে এখানে বসবাস করুক এবং উত্তরোত্তর উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করুক, তাতে ভারত সরকারের কোন আপত্তি নেই। কেননা আভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতির পরিমণ্ডলে 'ইসলাম ও মুসলিম' শব্দদু'টি বিরাট সম্পদ। সুতরাং এটা ভারত সরকারের মাথাব্যথার কারণ নয়। আসল মাথাব্যথা ও গাত্রদাহের কারণ হলো মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র জাতিসত্তাবোধ। তাই আজ আকার-ইঙ্গিত ছেড়ে সোজা 'হিন্দি ভাষায়' বলা হচ্ছে, হিন্দুস্তানে থাকতে হলে মুসলমানদের সর্বভারতীয় অভিন্ন স্রোতধারায় মিশে যেতে হবে, যার সরল অর্থ হলো, মুসলিম জাতি হিসাবে নিজেদের সমস্ত স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা বিসর্জন দেওয়া।

এখনকার দাবী এ নয় যে, ইসলাম ত্যাগ করে হিন্দু হয়ে যাও, বরং দাবী এই যে, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করো। মুসলমান থাকো, কেউ বাধা দেবে না, কিন্তু 'মুসলিম পরিচয়' বরদাশত করা হবে না।

এই যে সময়ে সময়ে জ্বলে ওঠা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, এটা রোগের সাময়িক প্রকোপ ও হিস্ট্রিয়ামাত্র যা স্থায়ীভাবে থাকে না, থাকবে না। দেখতেই পাচ্ছেন,

দিন দিন এর মাত্রা ও ভয়াবহতা কমে আসছে। আমার ভবিষ্যদ্বাণী এই যে, দিনে দিনে তা আরো কমে যাবে। সুতরাং আমার মতে আসল সমস্যা এটা নয়। দাঙ্গায় আমাদের রক্তক্ষয় ও সম্ভ্রমহানি যত বেদনাদায়কই হোক এবং প্রত্যক্ষ ধর্মত্যাগের ঘটনা যত লজ্জাজনকই হোক তা অস্তিত্বের বিপদ নয়। অস্তিত্বের বিপদ হলো ভারতীয় মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক ধর্মত্যাগ এবং জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও পরিচয় স্বকীয়তার বিলোপ। আর এই বিপদ ও খাতরা অনুভব করার জন্য খুব বেশী অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন নেই। এ তো আজকের দেয়ালের লিখন, যা আল্লাহর দেয়া চোখ দিয়ে যে কেউ পড়তে পারে। সাধারণ বুদ্ধি আছে এমন কারোই এখন আর বুঝতে বাকি নেই যে, আজ আলীগড়ের পালা এসেছে তো কাল আসতে পারে দারুল উলূম দেওবন্দ ও নদওয়াতুল উলামার পালা। আলীগড়ের প্রশ্ন এখন আমাদের জন্য সময়ের অগ্নিপরীক্ষা। আমাদের ভাবিষ্যতের আলো-অন্ধকার নির্ভর করছে এর উপর যে, আলীগড়ের প্রশ্নে আমরা কতটুকু জীবন্ততা ও জাগৃতির পরিচয় দিতে পারি এবং কতটুকু গায়রাত ও আত্মমর্যাদাবোধের প্রমাণ পেশ করতে পারি।

বিদ'আত ঃ আমাদের দায়িত্ব

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম! আপনাদের পূর্বপুরুষ তো ছিলেন তাঁরা, শরীয়তের কোন ক্ষেত্রে কোন প্রকার বিদ'আতের সাথে যারা সামান্যতম সমঝোতা বরদাশত করেননি। ধর্মের নামে কত রসম-রেওয়াজ ও প্রথা-সংস্কার আজ মুসলমানদের জীবনে অনুপ্রবেশ করেছে এবং দ্বীনের শি'আর ও বৈশিষ্ট্য রূপে শিকড় গেড়ে বসেছে, কিন্তু যে 'মাসলাক' ও মত-বিশ্বাস এবং যে 'মাকতাবে ফিকির' ও 'চিন্তা-পরিবারের' সাথে আপনাদের সম্পর্ক তার আলিমগণ সবসময় সেগুলোর বিরোধিতা করেছেন এবং ভিত্তিহীন বিদ'আত রূপে সেগুলোকে চিহ্নিত করেছেন।

দ্বীনের প্রশ্নে এই অনমনীয় ও নিরাপোশ অবস্থানের কারণে সমাজ জীবনে তাঁদেরকে অনেক চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। তাঁদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়েছে, মসজিদ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। দুনিয়াদার আলিমরা তাঁদের কাফের পর্যন্ত বলেছে। বহু জাগতিক ফায়দা ও সুযোগ-সুবিধা তাঁদের ত্যাগ করতে হয়েছে। কিন্তু বিদ'আতের প্রশ্নে তাঁরা সামান্যতম নমনীয়তা ও সমঝোতার পথ গ্রহণ করেন নি। আমারও সম্পর্ক সেই চিন্তাশিবিরের সঙ্গে, শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে যারা আপোশহীন লড়াই জারি রেখেছেন। আমি তো বরং সেই ঐতিহ্যবাহী খান্দানেরই এক নগণ্য সন্তান, বিদ'আতের বিরুদ্ধে

লড়াইয়ে যাদের ছিলো অগ্রণী ভূমিকা এবং এক্ষেত্রে যাদের অনুভূতি ছিলো অতি সংবেদনশীল। আমার নসবী, রূহানী ও যিহনী সম্পর্ক হলো হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ এবং হযরত মাওলানা শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ) এর সঙ্গে, যারা এই ভারতভূমিতে তাওহীদ ও সুন্নতের পুনরুজ্জীবন-আন্দোলনের পতাকা বহন করেছেন এবং এ পথেই জান কোরবান করেছেন। আমার স্পষ্টভাষণ যদি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হয় তাহলে আমি বলতে চাই যে, শিরক ও বিদ'আতবিরোধী এই চিন্তা-চেতনা সেই শহীদী কাফেলা থেকেই আপনাদের শিবিরে এসেছে। সুতরাং বিদ'আতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এ সুদীর্ঘ ইতিহাস আমার প্রাণপ্রিয় সম্পদ। এ সমগ্র উত্তরাধিকার সম্পদ আমি আমার বুকে ধারণ করতে চাই এবং আমার চোখের মণিতে সংরক্ষণ করতে চাই। এ বিষয়ে আমার কোন দ্বিধা-সংকোচ নেই, বরং এজন্য আমি গর্বিত ও গৌরবান্বিত। আমার দিন-রাতের কলম চালনা এবং আমার সারা জীবনের কর্ম-সাধনা এই মহান উত্তরাধিকার সম্পদের পুনরুদ্ধার, হিফাযত ও সংরক্ষণ এবং প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। কবির ভাষায়–

میں کہ مری نوامیں ہے آتش رفتہ کا سراغ

میری تمام سر گذشت کھوئے ہوؤں کی جستجو

'আমার আহাজারিতে পাবে তুমি সেই নিভে যাওয়া আগুনের ধোঁয়া, আমার গোটা জীবন-সফর কেটেছে সেই 'হারিয়ে যাওয়ার' সন্ধানে।'

আমার কমযোর হাতের এই ক্ষুদ্র কলম এখনো সেই মহানপুরুষদের দাওয়াত ও কোরবানির দাস্তান লিখে চলেছে এবং হাজার হাজার পাতা কালির কালো হরফে সাজিয়ে চলেছে। সুতরাং দাওয়াতি কলমের আদনা খাদিম হিসাবেও আমার দ্বীনী দায়িত্ব হলো আপনাদের চিন্তা ও কর্মের 'ইহতিসাব' ও নেগরানি এবং তদন্ত ও পর্যবেক্ষণ করা।

আপনারা সেই মহান পূর্বপুরুষদের উত্তরসূরী যারা দ্বীন ও শরীয়তের সামান্যতম অঙ্গহানি এবং মুসলমানদের বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি কখনো বরদাশত করেননি। অথচ আমাদের সামনে আজ প্রশ্ন শুধু বিদ'আতের নয় এবং শুধু 'ইংরেজী শিক্ষা' ও তার ফলাফলের নয়, বরং একদিকে আজ প্রশ্ন হলো মূর্তিপূজা ও প্রতিমাবাদী চিন্তার মত প্রকাশ্য শিরকের এবং হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির মোকাবেলা করার, অন্যদিকে প্রশ্ন হলো ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতার সর্বগ্রাসী সায়লাব রোধ করার। আমাদের কাছে আজ সময়ের দাবী হলো এমন এক কাওম হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা যাদের প্রেম ও সম্পর্ক এবং

ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা নিবেদিত হবে এই 'ভারতভূমির' সাথে যার মাটিতে তৈরী হয়েছে এবং যার আলো-বাতাসে পরিপুষ্ট হয়েছে আমাদের দেহসত্তা। দ্বীন ও শরীয়তের 'শাবিস্তান' রূপে এই ভারতভূমিকে রক্ষার জন্যই আমাদের বাঁচতে হবে এবং মরতে হবে। আজকের চ্যালেঞ্জ ও বিপদ-ঝুঁকি অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে আমি মনে করি অনেক বেশী সঙ্গীন ও গুরুতর। এবং এ বিপদ-ঝুঁকির সামনে বুক পেতে দাঁড়ানোর জন্য অনেক বেশী হিম্মত ও সাহসিকতা, ঈমান ও অবিচলতা এবং ত্যাগ ও কোরবানির প্রয়োজন।

আজকের বিপ্লব ও তার গতি

বিগত যুগে বিপ্লব আসতো বড় ধীর গতিতে। সময় ছিলো যেমন ধীরগামী বিপ্লবেরও ছিলো তেমনি অলস গতি। তখন ছিলো গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ীর যুগ, তাই বিপ্লবেরও ছিলো শম্বুকগতি। তারপর শুরু হলো রেলগাড়ী ও হাওয়াই জাহাজের যুগ, তখন যুগের বিপ্লবও লাভ করলো নতুন গতি। এ যুগের বিপ্লব 'আকাশমাধ্যম' ব্যবহার করে ধেয়ে আসছে বিদ্যুৎ গতিতে। চোখের পলকে পৌঁছে যাচ্ছে ঘরে ঘরে, মানুষের অন্তরের অলিতে গলিতে।

এখন সরকার ও গণতন্ত্রের ব্যাপক ক্ষমতার যুগ। আমাদের উপর চলছে পার্লামেন্টের শাসন এবং পার্লামেন্টের রয়েছে আইন প্রণয়নের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। তদুপরি সরকারের এখতিয়ার ও কর্মপরিধি এখন প্রতিরক্ষা, শান্তিরক্ষা ও রাজস্ব সংগ্রহের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। সরকারের নিয়ন্ত্রণ এখন জীবনের সর্বক্ষেত্রে এবং শিক্ষা-দীক্ষার সকল পর্যায়ে। ঘরের ও বাইরের এবং দেহের ও মনের কোন কিছু এখন সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত নয়। সকালে পার্লামেন্টে আইন তৈরী হলো, বিকেলে সারা দেশে তা কার্যকর হয়ে গেলো। এই যে এখন আমরা এখানে বসে আছি, হতে পারে যে, এখন পার্লামেন্টের অধিবেশন চলছে এবং এমন কোন আইন তৈরী হচ্ছে যা গুরুতর কোন পরিবর্তন নিয়ে আসবে আমাদের জীবনে।

আপনারা জানেন, অতীত যুগের সরকারগুলো মানুষের ব্যক্তিজীবনের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতো না। পারিবারিক আইন ও ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে তার কোন আগ্রহ ছিলো না। স্বাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে তার কোন মাথাব্যথা ছিলো না। শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন চিন্তাধারা ও মতবিশ্বাসের প্রতি তার কোন আনুগত্য ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা ছিলো না। কিন্তু পৃথিবীর দিন-রাত এখন বদলে গেছে। আপনাদের বুঝতে হবে যে, কিসের উপর এখন আপনারা বসে আছেন, পায়ের তলার মাটি কতটা শক্ত, কতটা নরম? যুগের ঝড়ো বিপ্লব

আজ আপনাদের কোন্ পরিস্থিতির সামনে এনে ফেলেছে?

মাদরাসার এই সীমাবদ্ধ পরিবেশে আপনারা বেশ নিশ্চিন্ত আছেন। কেননা চারদিকে শুধু নূরানী চেহারা দেখতে পাচ্ছেন। এদিকে দারুল হাদিছ, ওদিকে দারুত-তাফসীর। কানে আসছে কা-লাল্লাহ, কা-লার-রাসূলের রূহ ঠাণ্ডা করা আওয়ায। এদিকে মসজিদের রূহানী পরিবেশ, ওদিকে কুতুবখানার ইলমী সুবাস। কিন্তু আগামীকাল যখন আপনি এখান থেকে বের হবেন– এবং আগামীকাল মানে শিক্ষাসমাপ্তির আগামীকাল নয়, বরং ছুটির আগামীকাল। ছুটিতে যখন আপনি মাদরাসা ছেড়ে বাড়ীতে যাবেন এবং সমাজের পরিবেশে পা রাখবেন তখন দুনিয়ার অনেক বদলে যাওয়া রূপ দেখতে পাবেন। মনে হবে আশা ও প্রত্যাশার অনেক আলো নিভে গেছে এবং হতাশা ও নৈরাশ্যের অন্ধকার আরো ব্যাপক ও গভীর হয়েছে।

আমি জানি না আপনাদের আগামী ছুটি পর্যন্ত এ দেশে এই সমাজে কী কী পরিবর্তন এসে যাবে এবং কোন্ কোন্ পরিস্থিতি সামনে এসে দাঁড়াবে। আপনারা যদি সমাজের গতিবিধির উপর কড়া দৃষ্টি না রাখেন, চারপাশের দুনিয়া সম্পর্কে সচেতন না থাকেন তাহলে নিজেরাই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং দেশ ও দুনিয়া থেকে বেগানা হয়ে যাবেন।

ভিতরের বিপদ

এতক্ষণ তো আমি বাইরের বিপদ ও আশংকার কথা আলোচনা করলাম, কিন্তু আরো বড় বিপদ ও খাতরার কথা এই যে, খোদ মুসলমানদের মধ্যে এমন একটি সুবিধাভোগী দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে যারা অমুসলিম সম্প্রদায়ের চেয়েও এককাঠি আগে বেড়ে আছে। অনেকটা যেন 'বাদী ঠাণ্ডা সাক্ষী গরম'– অবস্থা। ওরা যদি কোন কথা বলে আকারে ইঙ্গিতে, চাপা আওয়াযে, এরা তা বলে বেড়ায় জোরগলায়, চড়া আওয়াযে। মুসলমানদেরই একদল এখন এই দাবীতে সোচ্চার যে, আমাদের আজ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল স্রোতধারায় মিশে যেতে হবে। সকল স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য পরিহার করতে হবে। এমনকি চীনের মুসলমানদের মত আরবী ও ইসলামী নামের পরিচয়ও ত্যাগ করতে হবে।

এককথায় হিন্দুস্তানে যদি আমাদের থাকতে হয় তাহলে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য প্রকাশক সবকিছু আমাদের বিসর্জন দিতে হবে। মসজিদ-মন্দিরের পার্থক্য মুছে ফেলতে হবে। যে ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনা এখন হিন্দুস্তানের নেতৃত্বে বিরাজমান তা এমন সবকিছুতেই ভীষণ গাত্রদাহ বোধ করে যা ইসলামী

বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা জাগ্রত করে।

ইসলামের বৈশিষ্ট্য, সুনির্দিষ্টতা

কিন্তু আমাদের দ্বীন হলো ইসলাম, যার প্রতিটি সীমা-রেখা সুস্পষ্ট এবং যাবতীয় আকীদা-বিশ্বাস ও আমল-ইবাদাত অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। 'সর্বজাতিগ্রাসী' রূপে পরিচিত এই ভারতভূমিতে ইসালাম যে আজো পর্যন্ত তার স্বকীয় সত্তায় বহাল রয়েছে তার রহস্য এখানেই নিহিত যে, আর্য ধর্মগুলোর মত তা সর্বানুগামী ও সুনির্দিষ্টতাবিমুখ নয়। এবং তাতে সেই কোমলতা ও নমনীয়তা নেই যা সর্বেশ্বরবাদ ও একধর্মবাদ-এর দর্শন প্রসব করেছে। আমাদের এখানে ঈমান ও কুফুর, শিরক ও তাওহীদ, হেদায়াত ও গোমরাহি এবং হালাল ও হারামের মাঝে সুস্পষ্ট সীমারেখা রয়েছে।

فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها

'যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে সে তো এমন এক মযবুত রজ্জু আকড়ে ধরলো যা কখনো ছিন্ন হতে পারে না।'

ধর্মের একত্ব নয়, সত্যের একত্ব

ইসলাম সকল ধর্মের একত্বে বিশ্বাস করে না, বরং সত্যের একত্বে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ সকল ধর্ম এক ও অভিন্ন নয়, বরং সত্য এক ও অভিন্ন। সুতরাং যে কোন একটি ধর্ম সত্য, অন্য সব ধর্ম মিথ্যা। আলকোরআনের পরিষ্কার ঘোষণা এই যে–

فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون (يونس،٣٢)

'সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর গোমরাহি ছাড়া আর থাকে কী? সুতরাং তোমরা কোথায় ঘুরে মরছো?'

ইসলামের রয়েছে একটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট 'নেযামে আকীদা' ও বিশ্বাস-ব্যবস্থা। রয়েছে স্বতন্ত্র সভ্যতা এবং পূর্ণাঙ্গ বিধান ও সমাজব্যবস্থা। এ প্রসঙ্গে ইসলামের ধর্মগ্রন্থের পরিষ্কার ঘোষণা এই যে–

اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে সম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের জন্য ইসলামকেই দ্বীনরূপে মনোনীত করেছি।

এখানে কেউ না নিজেকে প্রতারণা করতে পারে, না অন্যকে। এখানে

সবকিছু দিনের আলোতে সমুজ্জ্বল। ليلها كنهارها এখানে রাত দিনের মতই শুভ্র সুন্দর।

দু'জন অন্তর্দর্শী মহান পুরুষ

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম! দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসিম নানুতবী (রহ) এবং নদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মদ আলী মূঙ্গেরী (রহ) কী বেদনায় ছটফট করছিলেন? একজন এখানে, অন্যজন ওখানে কিসের অস্থিরতায় বিনিদ্র রজনী যাপন করছিলেন? তাঁদের উভয়ের চিন্তা-চেতনায় এবং হৃদয়ের দরদ-ব্যথায় আমি তো কোন পার্থক্য দেখতে পাই না। উভয়ের মাঝে একই ঈমানী 'ফিরাসাত' ও অন্তর্দৃষ্টি কাজ করছিলো। তাঁরা উভয়েই ছিলেন– اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله (মুমিনের ঈমানী ফিরাসাতকে ভয় করো, কেননা মুমিন আল্লাহর নূর দ্বারা অবলোকন করেন)– এই নববী বাণীর বাস্তব নমুনা।

একই লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে এবং অভিন্ন আবেগ ও জাযবায় তাঁদের উভয়ের জীবন নিবেদিত ছিলো। উভয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিছাব ও শিক্ষা পদ্ধতি অবশ্যই ভিন্ন ছিলো, কিন্তু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো অভিন্ন। নিছাব তাদের লক্ষ্য ছিলো না, উপলক্ষ ছিলো। নিছাবের ইখতিলাফ ও ভিন্নতা মৌলিক বিষয় ছিলো না, গৌণ বিষয় ছিলো।

মাওলানা মুহাম্মদ আলী মূঙ্গেরী (রহ) এবং তাঁর সহকর্মীদের রচনাসম্ভার পড়ে দেখুন, তাঁদের দূরদৃষ্টি এসব খুঁটিনাটি মতপার্থক্য থেকে অনেক উর্ধ্বে ছিলো। কেউ যদি মনে করে যে, তাঁরা শুধু আরবী সাহিত্যকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য, কিংবা নিছক আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ভিন্নভাবে নাদওয়াতুল উলামার আন্দোলন শুরু করেছিলেন তাহলে তাঁদের মহান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এর চেয়ে বড় বে-ইনছাফী আর কিছুই হতে পারে না।

আসলে উভয়ের উদ্দেশ্য ছিলো সমকালের ফেতনা ও তার সায়লাবের মোকাবেলা করা। সে জন্য একজন এখানে দ্বীনের একটি মযবূত দুর্গ গড়ে তুলেছেন, অন্যজন সেখানে অন্য একটি দুর্গ গড়ে তুলেছেন। উভয়েই নিজ নিজ যুগের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন এবং পরিবর্তিত সময়ের আলোকে দ্বীনের মুহাফিয ও রক্ষক, দাওয়াতে হকের মুজাহিদ ও 'জানেছার' এবং শরীয়তের 'তারজুমান' ও ভাষ্যকার হওয়ার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উভয়কে উচ্চ থেকে উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করুন এবং তাঁদের সকল সঙ্গী ও সহকর্মীদের উত্তম বিনিময় দান করুন এবং আমাদেরকে তাঁদের

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বোঝার এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম! ইসলামের ইতিহাসে তাজদীদ ও সংস্কার আন্দোলনের যে গৌরবময় সুদীর্ঘ অতীত রয়েছে তা আগাগোড়া ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের হিম্মত ও মনোবল এবং ত্যাগ ও কোরবানির সোনালী ফসল ছাড়া আর কিছু নয়। সাধারণভাবে এটাকে জাতি ও মিল্লাতের ইতিহাস বলা হয় এবং তা অসত্যও নয়। কিন্তু কার্যত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটা হলো ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের যোগ্যতা ও প্রতিভা, মেহনত ও মোজাহাদা এবং ত্যাগ ও কোরবানিরই ফসল।

যখনই ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জীবন-মরণের এবং অস্তিত্বের টানাপড়েনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, যখনই কোন দিক থেকে বাতিলের কোন হুঙ্কার এসেছে তখনই কোন না কোন মরদে মুজাহিদ সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। এধরনের নাযুক সংকটকালে কখনো কোন সভা ও সম্মেলন আহ্বান করা হয়নি। মশওয়ারা-মজলিস ডাকা হয় নি। বরং ঈমান ও ইয়াকীনের বলে বলীয়ান কোন কর্মবীর কর্মের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তেন এবং গোটা পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ বদলে দিতেন। হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয এবং হযরত হাসান বছরী (রহ) থেকে শুরু করে হিন্দুস্তানের শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্- পরিবার পর্যন্ত সমগ্র ইতিহাস এবং দ্বীনী, ইলমী ও দাওয়াতী মারকাযের প্রাণপুরুষদের জীবন-চরিত একই সত্য প্রমাণ করে।

আলফেছানী ও শাহ্ দেহলবীর অবদান

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ) এবং ব্যক্তিত্বের বিশালতা ও গভীরতা অনুভব করার যোগ্যতা আমাদের সবার নেই। দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল কিছু বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর সম্পর্কে বলেছেন–

کارزلف تست مشك افشانی اما عاشقاں

مصلحت را تہمتے برآھوئے چیں بستہ اند

'হিন্দুস্তানে তিনি ছিলেন কাওম ও মিল্লাতের অতন্দ্র প্রহরী। যথাসময়ে আল্লাহ্ যাকে করেছিলেন হুঁশিয়ার।'

বস্তুত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ) এর মেহনত ও মোজাহাদা এবং ত্যাগ

ও কোরবানিরই ফলে শেষ পর্যন্ত দ্বীনে হিজাযী ও মুহাম্মদে আরবীর সঙ্গে হিন্দুস্তানের বন্ধন ছিন্ন হতে পারেনি, বরং আকীদা ও বিশ্বাস এবং তাহযীব ও সংস্কৃতির দিক থেকে হিন্দুত্বের গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়ে শরীয়তে মোহাম্মদীর আমানত শরীয়তে মুহাম্মদীরই হাতে মাহফুয ও নিরাপদ হয়েছিলো। তাঁরই নিরব আন্দোলন এবং নির্জন রাতের অশ্রুপাত আকবরের দ্বীনে ইলাহীর ফেতনা দাফন করেছিলো এবং তার সিংহাসনে বাদশাহ আওরাঙ্গ যেবের মত দ্বীনী গায়রত ও প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন এক যিন্দা পীরকে বসিয়েছিলো।

পরবর্তীতে হিন্দুস্তানে দ্বীনের তাজদীদ ও পুনরুজ্জীবনের যা কিছু কাজ হয়েছে তা হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ) এবং তঁর খানদানের কীর্তি ও অবদান ছাড়া আর কিছু নয়। দেওবন্দ বলুন কিংবা সাহারানপুর, দিল্লী বলুন কিংবা লৌখনো, আমরা সকলে ওয়ালিউল্লাহ-খান্দানেরই দস্তরখানের নেয়ামত ভোগী। দারুল উলূম দেওবন্দ, মাযাহেরুল উলূম সাহারানপুর, নাদওয়াতুল উলামা লৌখনো এবং কোরআন ও সুন্নাহর যত শিক্ষাঙ্গন হিন্দুস্তানে রয়েছে সব একই চেরাগ থেকে রওশন হয়েছে, একই প্রদীপ থেকে প্রজ্বলিত হয়েছে। সবগুলোর 'বংশলতিকা' শাহ দেহলবী এবং তাঁর সুযোগ্য সন্তান ও ভাবসন্তানদের পর্যন্ত গিয়েই শেষ হয়েছে। কবির ভাষায়–

یک چراغیست دریں خانہ کہ ازپر توآں

ہر کجامی نگری انجمنے ساختہ اند

'একটি মাত্র প্রদীপ ছিলো এ ঘরে, তার স্নিগ্ধ আলো গিয়েছে যেখানে যেখানে, গড়ে উঠেছে আলোকিত মাহফিল।'

আপনাদের গুরুদায়িত্ব

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম! এ মহান ঐতিহ্যবাহী মাদরাসায় আপনারা শিক্ষা লাভ করছেন। এ মদরাসার 'মাতৃস্নেহের' ছায়ায় আপনারা বড় হয়ে চলেছেন। আপনাদের কাছে এ মাদরাসার প্রাণের দাবী এই যে, যুগের নয়া ফেতনা ও নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় আপনাদের দাঁড়াতে হবে। এখানে বেড়াতে আসা পর্যটকের সাধারণ চোখে কোন চাঞ্চল্য ও তরঙ্গ দোলা ধরা পড়বে না। কিন্তু এখানে এই শান্তসমুদ্রের তলদেশে সুপ্ত রয়েছে ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাবনা। কুফর ও ইলহাদ এবং বাতিল ও বদদ্বীনীর কেল্লা মিসমার করে দেয়ার মত কোন মউজ এখনো যদি ওঠে তাহলে এই মহাসমুদ্র থেকেই উঠতে পারে তা।

নাযুকতম সময়

আমি ইতিহাসের ছাত্র। ইতিহাস আমার প্রিয় বিষয়। হিন্দুস্তানের ইতিহাস আমি যতটুকু পড়েছি তার আলোকে পূর্ণ আস্থার সাথে আমি বলতে পারি যে, হিন্দুস্তানের হাজার বছরের ইতিহাসে এমন নাযুক ও কঠিন সময়কাল আর কখনো আসেনি। কেননা পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে তছনছ করে দেয়ার, মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে ফেলার, হিম্মত ও মনোবলকে গুঁড়িয়ে দেয়ার, আবেগ ও জাযবাকে নিস্তেজ করে দেয়ার এবং মূল্যবোধ ও চিন্তাধারাকে ওলটপালট করে দেয়ার এত উপায়-উপকরণ এবং উদ্যোগ-আয়োজন পিছনের আর কোন যুগে ছিলো না। অতীতের মানুষের হাতে কি এমন হাতিয়ার ছিলো? রাজনীতির এত মিষ্টি কথা, এত কূটচাল কি তখন ছিলো? গণতন্ত্র ও সাম্যবাদের এমন চটকদার শ্লোগান কি তখন ছিলো? প্রকাশনা ও সংবাদপত্র জগত ছিলো? বৈদ্যুতিন ও আকাশ সংস্কৃতির এ আগ্রাসন ছিলো? সর্বোপরি এত বড় বড় একাডেমি ও বিশ্ববিদ্যালয় কি ছিলো? কিছুই ছিলো না।

যুগের আবুল ফযল ও ফায়যী

বাদশা আকবরের দ্বীনে ইলাহীকে অতীত হিন্দুস্তানের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ফেতনা মনে করা হয়। কিন্তু আমি জানতে চাই, তখন কি শীর্ষ ক্ষমতাসীন ব্যক্তির হাতে এ সমস্ত একাডেমি ও শিক্ষাকেন্দ্র ছিলো? লক্ষ লক্ষ প্রচারসংখ্যার সংবাদপত্র ছিলো? আধুনিকতম এসব উপকরণ ও প্রযুক্তি ছিলো যা পূর্বের এ প্রান্তের কথা মুহূর্তে পশ্চিমের ঐ প্রান্তে পৌঁছে দেয়? বাদশাহ আকবরের কাছে ফায়যী ও আবুল ফাযাল-এর মত বিরল প্রতিভা ও জ্ঞান-জ্যোতিষ্ক অবশ্যই ছিলো। এ দু'জনের মেধা ও প্রতিভা আমি শুধু স্বীকারই করি না, সমীহও করি। কিন্তু ভেবে দেখুন এমন কত আবুল ফাযাল ও ফায়যী আজ বিভিন্ন স্থানে পূর্ণ প্রতাপের সাথে বসে আছে। তখন তারা মাত্র দু'জন ছিলেন, আর আজ তাদের কর্মের জন্য রয়েছে বড় বড় গবেষণাকেন্দ্র। তাছাড়া সে যুগের আবুল ফাযাল ও ফায়যীর অন্তরে কখনো কখনো ধর্মীয় জাযবাও হয়ত বা আড়মোড়া দিয়ে উঠতো। তাই তো দেখি, ফায়যীর কলম থেকে বের হয়েছে 'সাওয়াতেউল ইলহাম'-এর মত মহাবিস্ময়কর তাফসীর গ্রন্থ, আরবী ভাষা অলংকারের জগতে যার কোন তুলনা নেই। কিন্তু আজকের আবুল ফাযাল ও ফায়যীদের মনে ভুলেও কখনো ধর্মের প্রতি দুর্বলতা জাগে না। সে যুগের প্রগতিবাদী ও মুক্তবুদ্ধির পূজারীদের অন্তরেও ইসলামের প্রতি যে 'কোমল প্রান্ত' ছিলো এ যুগের আবুল ফাযাল ও ফায়যীদের অন্তরে তার ছিটেফোঁটাও নেই।

নাস্তিক্যবাদ ও সংশয়বাদের নতুন দরজা

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম! ফালসাফা ও কালামশাস্ত্র আজ তার প্রায় সব আবেদন ও আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে। জ্ঞানী-গুণী ও শিক্ষিত সমাজকে নাস্তিকতা ও সংশয়বাদের দিকে টেনে নেয়ার সেই ক্ষমতা এখন বিজ্ঞানেরও নেই যা উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের সূচনাকালে ছিলো। এমনকি এসব বিষয়ে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের এখন তেমন কোন আকর্ষণও নেই। বরং পথিকৃত বিজ্ঞানীদের পরিবর্তিত চিন্তা-চেতনার কারণে খোদ বিজ্ঞান এখন স্রষ্টা ও অদৃশ্যজগত এবং দ্বীনী হাকীকত ও তত্ত্বের পক্ষে নতুন নতুন তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করে চলেছে। সুতরাং যে দর্শন ও বিজ্ঞান উনিশ শতকের ওলামায়ে উম্মতকে অস্থির ও পেরেশান করে তুলেছিলো তা এখন নাস্তিকতা ও সংশয়বাদের বাহনরূপে তেমন একটা কাজ করছে না। আজ নাস্তিকতা ও সংশয়বাদের বাহন হচ্ছে রাজনীতিবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান এবং ইতিহাস ও শিল্পসাহিত্য। (স্থানীয় ভাষা ও সাহিত্যের পাশাপাশি) বিশ্ব-সাহিত্য হিসাবে ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে এখন ধর্ম-বিদ্বেষ, নৈতিক অবক্ষয় ও চিন্তার নৈরাজ্য ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। আপনাদের জন্য হয়ত এটা এক চমকপ্রদ তথ্য হবে যে, এখনকার বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও উর্দু বিভাগ নাস্তিকতা ও সংশয়বাদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এবং সম্ভবত কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগই সবচেয়ে দুর্বল ও অবহেলিত বিভাগরূপে বিবেচিত হয়ে আসছে।

বাস্তবোচিত ব্যাপক প্রস্তুতি

আমাদেরকে আজ উদার দৃষ্টিতে, নিবিষ্টচিত্তে ও পূর্ণ বাস্তববাদিতার সাথে বর্তমান পরিস্থিতি ও সুরতেহাল সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে হবে এবং ভেবে দেখতে হবে যে, জীবনের কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার এবং দ্বীন ও শরীয়তের দাওয়াত ও হেফাযতের যিম্মাদারি কাঁধে নেয়ার আগে আমাদের কী কী পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে? কী কী নতুন অস্ত্রে সজ্জিত হতে হবে? এবং কোন্ কোন্ আধুনিক রণকৌশলে আমাদের কুশলী হতে হবে?

আপনাদের জীবন ও কর্মের জন্য তাকদীরে ইলাহী এই সময় ও সমাজকেই নির্বাচন করেছে। সর্বপ্রথম আপনাদেরকে পূর্ণ উপলব্ধির সাথে জানতে হবে যে, কোন্ যুগের জন্য আপনাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে? এটা যেমন চিন্তা ও দুশ্চিন্তার বিষয় তেমনি সন্তোষ ও সন্তুষ্টিরও বিষয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে এ কঠিন যুগের যোগ্য সাব্যস্ত করেছেন এবং এত গুরুত্বপূর্ণ

সেবা-দায়িত্ব আপনাদের কাঁধে অর্পণ করেছেন। যামানার সঙ্গিন খাতরা এবং সময় ও সমাজের নাযুকতা অনুধাবনের চেষ্টা করুন এবং পূর্ণ যোগ্যতা ও সাহসিকতার সঙ্গে এ গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করুন এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন আল্লাহ আপনাদের তাওফীক দান করেন। আপনাদের মহান পূর্বপুরুষগণ যেমন সময় ও সমাজের বিদ'আত ও বিচ্যুতি এবং গোমরাহি ও ভ্রান্তির সাথে আপোশ করেননি। যামানার ফেতনা ও জাহেলিয়াতকে বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেননি, এ যুগের ফেতনা ও ফাসাদ এবং জাহালাত ও জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে আপনারাও তেমনি গৌরবময় ভূমিকা পালন করতে পারেন।

পাশ্চাত্যের ধর্মচিন্তা ও তার ফিতনা

দ্বীন ও ধর্মকে জীবন ও কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করার এবং সমাজ ও সংস্কৃতিকে ধর্মের নিয়ন্ত্রণ থেকে বঞ্চিত করার যে ইবলিসি আওয়ায ইউরোপ থেকে এসেছে আপনাদেরকে পূর্ণ আস্থা ও স্থিতির সাথে তার মোকাবেলা করতে হবে। ধর্মবিমুখ ইউরোপের সর্বস্বীকৃত মূলনীতি ও বিশ্বাস এই যে, ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের বিষয়। এ জীবনবিধ্বংসী শ্লোগান মেনে নেয়ার অর্থ হলো, হিন্দুস্তানে মুসলিম মিল্লাতের স্বতন্ত্র শিক্ষাকেন্দ্র ও শিক্ষাব্যবস্থার কোন প্রয়োজন নেই এবং সর্বভারতীয় অভিন্ন তাহযীব ও সংস্কৃতি গ্রহণ ছাড়া কোন উপায় নেই। বলাবাহুল্য যে, এরপর হিন্দুস্তানের হবে সেই পরিণতি যার সতর্কবাণী আল্লামা ইকবাল আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে উচ্চারণ করেছেন এভাবে–

ملا کو جو ھے ھند میں سجدہ کی اجازت
ناداں سمجھتا ھے کہ اسلام ھے آزاد

'হিন্দ-ভূমিতে সিজদার অনুমতি পেয়ে ভেবেছে নাদান মোল্লা/ হয়ে গেছে ইসলাম আযাদ, ফাতেহ লাল কেল্লা।'

দেওবন্দের সন্তানদের সফলতার সম্ভাবনা

শুধু দারুল উলূম দেওবন্দের আলিম-ফাযিলগণ যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন, আর আল্লাহর তাওফীক যদি তাদের হাত ধরে পথ দেখায় তাহলে তারা এ পরিস্থিতির যথেষ্ট পরিবর্তন করতে পারেন। আম মুসলমানের সঙ্গে তাদের যে গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক তা অন্য কোন দ্বীনী জামাতের নেই। সারা হিন্দুস্তানে কাওমী মাদরাসার জাল ছড়িয়ে আছে। এ সকল মাদরাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সকলে সাধারণ মুসলমানদের শ্রদ্ধার পাত্র। এলাকায়, মসজিদে মহল্লায় সর্বত্র রয়েছে তাদের দ্বীনী প্রভাব। এখন শুধু প্রয়োজন সত্য-সাধকের সাহসিকতার এবং আল্লাহ-প্রেমিকের বিশ্বাস-গভীরতার, যার সম্পর্কে তত্ত্বদর্শী কবি বলেছেন–

هوا هے گو تندو تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے

وہ مرد درویش جس کو حق نے دئیے ہیں انداز خسروانہ

ক্ষণে ক্ষণে যদিও আছে ঝড়ের ঝাপটা, তবু/ মরদে মুমিন জ্বালান দ্বীনের বাতি/ আল্লাহ যাকে দিয়েছেন হিম্মত বুলন্দ/ কলবে আছে যার ঈমানের জ্যোতি।

চিন্তা ও চরিত্রের গঠন

সময় ও সমাজের এ নতুন দায় ও দায়িত্ব সফলভাবে পালন করার জন্য আপনাদেরকে আজ চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞানসাধনার দিকে থেকে যেমন প্রস্তুত হতে হবে তেমনি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকেও পূর্ণরূপে প্রস্তুত হতে হবে। এক দিকে আপনাকে আধুনিক যুগের নতুন নতুন চিন্তা ও দর্শন এবং ফিতনার নিত্যনতুন রূপপরিবর্তন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং প্রতিটি ফিতনার প্রেক্ষাপট, কার্যকারণ এবং তার ক্রম বিবর্তনের ইতিহাস গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। কেননা প্রতিপক্ষের পরিচয় এবং তার শক্তি, কৌশল ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্ণ অবগত হওয়া, যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সফল মোকাবেলা গড়ে তোলার পূর্বশর্ত।

অন্যদিকে আপনাদেরকে অর্জন করতে হবে এমন দৃঢ়তা, অনমনীয়তা, আত্মমর্যদা, আত্মোপলব্ধি ও রূহানী শক্তি যাতে পৃথিবীর কোন শক্তি আপনাদের বিবেক ও চিন্তার, নীতি ও নৈতিকতার এবং আকীদা ও বিশ্বাসের সওদা করার কথা কল্পনাও করতে না পারে।

এ যুগের ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে তুচ্ছ মূল্যে বিবেক-বুদ্ধির সওদাবাজি শিক্ষা দেয় এবং নিলামের বাজারে মেধা ও যোগ্যতার বেচা-কেনার তালিম দেয়। পক্ষান্তরে আমাদের দ্বীন ও শরীয়তের শিক্ষাব্যবস্থার উদাত্ত আহ্বান তো হলো–

ہر دو عالم قیمت خود گفتہ   نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز

'আমার মূল্য যদি মনে করো দু'জাহান/ তাহলে বন্ধু বড় সস্তা ভেবেছো আমায়।'

বিবেকের সওদাবাজির যুগ

আজকের যুগ হলো বিবেক-বুদ্ধির ও দ্বীন-ঈমানের সওদাবাজির যুগ। বড় বড় বিদগ্ধ পণ্ডিৎ ও লেখক-সাহিত্যিক; যাদের মেধা, প্রতিভা ও জ্ঞান গভীরতার কোন তুলনা নেই, কিন্তু বিবেক নামের কোন পদার্থ তাদের মাঝে নেই। মাথায় মস্তিষ্ক আছে, বুকে নেই হৃদয় নামের কিছু। বরং বলা যায়, তাদের বুকে স্পন্দিত

হৃদয়ের পরিবর্তে রয়েছে এক চঞ্চল কলম, যা সত্য-মিথ্যার সীমা-রেখা মুছে ফেলতে পারে এবং আলো-অন্ধকার একাকার করে ফেলতে পারে। আখেরাতের চিন্তা, ঈমানের শাসন ও বিবেকের দংশন তাদের নেই। যুগের পালা বদলের সাথে রূপ বদলের এবং সময়ের গতি বুঝে 'মতি' পরিবর্তনের আশ্চর্য 'প্রতিভা' তাদের।

নতুন নেতৃত্বের প্রয়োজন

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম! দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষাঙ্গন থেকে আপনারা শিক্ষক হয়ে বের হোন, শাস্ত্রীয় গ্রন্থের টীকাকার ও ভাষ্যকার হয়ে বের হোন আমার আপত্তি নেই। ইমাম ও খতীব এবং দাঈ ও মুবাল্লিগ হয়ে বের হোন আমার আপত্তি নেই। নামী-দামী লেখক-সাহিত্যিক হয়ে বের হোন তাতেও আপত্তি নেই, আমি নিজেও বহুদিনের কলম-কাগজের 'গোনাহগার'। কিন্তু দুঃখের কথা বলবো কাকে, যুগ ও সমাজের এখন অন্য কিছুর প্রয়োজন। প্রয়োজন এমন মরদে ময়দানের, নয়া যামানাকে যারা দিতে পারে নতুন চিন্তা-নেতৃত্ব, নতুন দ্বীনী আস্থা ও আত্মবিশ্বাস এবং নতুন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি। অন্যথায় আল্লাহ না করুন হিন্দুস্তানী মুসলমানদের ভবিষ্যত অন্ধকার। এখন আমাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, আমারেদ চারপারেশর বেষ্টন সংকীর্ণ হয়ে আসছে। যেন হুবহু সেই কঠিনতম পরিস্থিতি, আলকোরআন তার ইজাযপূর্ণ ভাষায় যার চিত্র এঁকেছে এভাবে–

أ و لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها (الرعد ٤١)

'তারা কি দেখেনি যে, আমরা যমীনকে তার চারপাশ থেকে সংকোচিত করে আনি।' (সূরা রাআদ)

و ضاقت عليهم الأرض بما رحبت و ضاقت عليهم أنفسهم

'আর যমীন তার সুপ্রশস্ততা সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেলো এবং জীবন তাদের জন্য অসহনীয় হয়ে গেলো।' (সূরা তাওবা)

বন্ধুগণ! সুদীর্ঘ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা যাকে সময়ের স্পন্দন বুঝতে শিখিয়েছে তার কথা শোনো। যে যমীনের উপর আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি এবং দ্বীনের ও ইলমের বিভিন্ন দুর্গ তৈরী করছি তা কোন কঠিন প্রস্তরভূমি নয়, বরং বালুর টিলা, মরুঝড় অনবরত যার কণা উড়িয়ে নিয়ে চলেছে এবং আমাদের নীচে থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। এ যেন সেই যমীন কোরআন যাকে বলেছে –কাছীবাম-মাহীলা

আত্মবোধ ও বাস্তববোধ

বন্ধুগণ! সময়ের হাতে শিক্ষা লাভ করার আগে নিজেই শিক্ষা গ্রহণ করো। যামানার বে-রহম হাকীকত ও নির্দয় সত্য তোমার চোখ খুলে দেয়ার আগে নিজেই চোখ মেলে আলোর ইশারা দেখার এবং চারপাশের পৃথিবীর অবস্থা বোঝার চেষ্টা করো। দেখো, যামানার ইনকিলাব হঠাৎ তোমাকে কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে? কোথায় মাওলানা নানুতবী, মাওলানা মুহম্মদ আলী মুঙ্গেরী এবং মাওলানা শিবলী নোমানী (রহ) এর যুগ, আর কোথায় প্রযুক্তির চমকে ধাঁধিয়ে দেয়া নয়া জাহেলিয়াতের যুগ!

আপনাদের এখনো সময় ও সুযোগ আছে, হিম্মত ও মনোবলের সাথে নিজেদের চিন্তার বিনির্মাণে এবং আখলাক ও চরিত্র গঠনে আত্মনিয়োগ করুন এবং আসাতেযায়ে কেরামের হেদায়াত ও পথনির্দেশনা গ্রহণ করুন, যাতে মাদরাসার সীমাবদ্ধ জগত থেকে যখন জীবন ও কর্মের বিস্তৃত অঙ্গনে প্রবেশ করবেন তখন নির্ভয়ে বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হতে পারেন এবং চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিরও মোকাবেলা করতে পারেন।

আপনাদের জামাতে, এই জীর্ণ বস্ত্র ও শীর্ণ দেহের মাঝে ঘুমিয়ে আছে এক জীবন্ত সিংহ। আপনাদেরই মাঝে লুকিয়ে আছে এমন ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব, এমন নিবেদিতপ্রাণ খাদিমে মিল্লাত ও রাহবারে উম্মত যাদের খবর আপনি জানেন না, আপনার শিক্ষক-সঙ্গীরাও জানে না। সেই সুপ্ত প্রতিভা ও সম্ভাবনাকে আমি আমার এই কমযোর আওয়াযে ডাক দিয়ে গেলাম। হায়, যদি তা আপনাদের হৃদয়ের গভীরে তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারতো! ঈদের নও হেলালকে সম্বোধন করে ইকবাল বলেছেন, আমি আপনাদের সম্বোধন করে বলি–

بر خود نظر کشا زتهی دامنی مرنج   درسینه تو ماه تمامے نهاده اند

নিজের শূন্য হাত দেখে কেন ক্ষুণ্ন তুমি!, তোমার বুকে তো লুকিয়ে আছে পূর্ণ চাঁদ।

যামানা বোঝে শুধু যোগ্যতা ও অধিকারের ভাষা

২৭শে মুহররম ৯৩ হিঃ মোতাবিক ২রা মার্চ ৭৩ খৃঃ জামিয়া রাহমানিয়া খানকায়ে মুঙ্গের-এর দারুল হাদীছে তালিবানে ইলমের উদ্দেশ্যে এ মূল্যবান ভাষণ প্রদত্ত হয়েছিলো। আমীরে শরীয়ত হযরত মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ রাহমানী ছাহেব মজলিসের ছদর ছিলেন। জামিয়া রাহমানিয়ায় হযরত আলি মিয়াঁ (রহ) এর শুভাগমন উপলক্ষে যে মানপত্র পঠিত হয় তারই জবাবে তিনি এ বক্তব্য রেখেছিলেন। তাঁর বক্তব্যের মূল কথা ছিলো এই যে, দয়া ও করুণা প্রার্থনা করে পৃথিবীর বুকে টিকে থাকা সম্ভব নয়, সে জন্য আমাদেরকে পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। কেননা পৃথিবী শুধু যোগ্য মানুষকেই কদর করে।

نحمد اللـــه العظيم و نصلي على رسولـــه الكريم، أمـــا بعد

হযরত আমীরে শরীয়ত, আসাতেযা কেরাম এবং আমার প্রিয় তালিবানে ইলম! এখানে এই পুণ্য-ভূমিতে আপনাদের মাঝে হাজির হওয়া ছিলো আমার বহুদিনের তামান্না, যা আজ পূর্ণ হলো। জানি না, আমার আজকের হাজিরি আপনাদের জন্য কোন সুফল বয়ে আনবে কি না এবং এই 'আন্তরিক' মানপত্রে যে আশা ও প্রত্যাশা প্রকাশ করা হয়েছে আমার দ্বারা তা পূর্ণ হবে কি না। আপনাদের কোন দ্বীনী ও ইলমী খিদমত আমি আঞ্জাম দিতে পারবো কি না তাতে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। তবে এ উপস্থিতি আমার জন্য যে বিরাট সৌভাগ্যের তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি এখানে এসেছি একজন খাদিম হিসাবে, আপন ও স্বজন হিসাবে এবং একজন ভাই হিসাবে। তবে আমার বড় পরিচয়, আমি আপনাদের খাদিম ও সেবক। আমি মনে করি, আমার আব্বাজান (রহ)ও এখানে যখন হাজির হতেন, খুশী হতেন এবং এখানে যিনি ছিলেন তিনিও শান্তি পেতেন।

মানপত্রে যেমন বলা হয়েছে- এই সিলসিলার সঙ্গে এবং যাঁর নামে এ পুণ্যভূমির পরিচয়, তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক সুপ্রাচীন ও সুগভীর এবং এ জন্য আমি গর্বিত ও কৃতজ্ঞ। এ পবিত্র সম্পর্ক আল্লাহ যেন অটুট রাখেন। এখানে এসে আমার বিলকুল মনে হয় নি যে, আমি নতুন কোথাও এসেছি এবং অপরিচিতদের সম্বোধন করছি, বরং আমার হৃদয়ের অনুভূতি এই যে, আমি আপন খান্দানের মাঝে এসেছি এবং খান্দানেরই প্রিয় তরুণদের সম্বোধন করছি। আমি আশা করি, আমীরে শরীয়ত মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ রাহমানী ছাহেবও অভিন্ন অনুভূতি পোষণ করছেন। আমাকে ডাকতে গিয়ে নিশ্চয় তিনি ভাবেননি যে, বাইরের কাউকে দাওয়াত দিচ্ছেন, বরং তিনি অবশ্যই ভেবেছেন যে, বাগানের স্বজনকে বাগানের ফুলকলিদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। ইলমী বাগানের আমি এক আদনা খাদেম এবং আপনারা আগামী দিনের ফুল। আপনাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক একাত্মতার। তাই এখানে আমি প্রথাগত সৌজন্য বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার প্রয়োজন বোধ করি না। তবে এতটুকু অবশ্যই বলবো যে, মানপত্র তো হয় তার জন্য যিনি কিছুটা হলেও দূরের কিংবা যিনি সম্মানিত মেহমান। অথচ এ ঘর তো আমার ঘর এবং আমি

তো আপনাদেরই একজন, তবু আপনারা মানপত্রের তাকাল্লুফ করেছেন! তবে এর ভিত্তি যেহেতু মুহব্বত এবং মুহব্বত কদর করার বিষয়, আর মুহব্বত প্রকাশের সমাজ-প্রচলিত পন্থাকেই আপনারা পছন্দ করেছেন, তাই আমি বেশী অনুযোগ করবো না; শুধু বলবো, প্রয়োজন ছিলো না। তবু যদি ইখলাছ ও আন্তরিকতার সাথে করে থাকেন তাহলে আমি আপনাদের মানপত্র কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করছি।

আমার প্রিয় বন্ধুগণ! এ মুহূর্তে আপনাদের সাথে বলার মত কথা অনেক। কিন্তু আমি একটি কথাই শুধু বলতে চাই। আমরা সবাই একই নৌকার যাত্রী, একই কিশতির মুসাফির, বরং আমি তো বলি, দুনিয়ার যেখানে যত দ্বীনী মাদরাসা আছে, সমস্ত মাদরাসার তালিবানে ইলম আমরা একই নৌকার যাত্রী, একই কিশতির মুসাফির। আর কিশতি এখন উত্তাল সমুদ্রে, ঝড়-তুফানের কবলে এবং ভয়ঙ্কর এক ঘূর্ণাবর্তে পড়ে দিশেহারা। বড় বড় জাহাজ- যাদের রয়েছে আধুনিকতম সাজসরঞ্জাম এবং নিরাপত্তার পূর্ণ ইনতিযাম, তদুপরি ঝড় ও স্রোতের অনুকূলেই তাদের গতি, তারপরও তারা ঝড়-তুফানের ঝাপটায় জাহাজডুবির আশংকায় দিশেহারা। বিপদের ভয়াবহতায় তাদেরও কম্পমান অবস্থা। আমাদের পরিস্থিতি তাহলে কেমন নাযুক ও সঙ্গিন হতে পারে, যেখানে আমরা চলেছি ঝড়ের ও স্রোতের প্রতিকূলে শুধু ভাঙ্গা এক নৌকায় সওয়ার হয়ে? সুতরাং এই নাযুকতম সময়ে নিজেদের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে ধীর শান্তভাবে আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে এবং ভাঙ্গা কিশতি নিয়ে ঝড়-তুফান পাড়ি দিয়ে নিরাপদে তীরে পৌঁছার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। অন্যথায় ধ্বংস আমাদের অনিবার্য।

দু'টি প্রান্তিক চিন্তা

প্রিয় বন্ধুগণ! দ্বীনী মাদারেস সম্পর্কে সমাজে এখন দু'টি পক্ষ রয়েছে। একপক্ষ তো দ্বীনী মাদরাসা ও দ্বীনী শিক্ষার ভবিষ্যত সম্পর্কে চরম হতাশ এবং দ্বীনী মাদরাসার উপকারিতা ও উপযোগিতাই বুঝতে নারায। আজকের যুগে কেন, কী উদ্দেশ্যে মাদরাসার প্রয়োজন? সমাজের কী এমন কল্যাণে মাদরাসা শিক্ষার আয়োজন? বিষয়টি তাদের মাথায় আসে না, মনেও আসে না। তাদের বরং সোজাসাপ্টা প্রশ্ন, আমাদের আগামী জীবনে মাদরাসার ন্যূনতম কোন ভূমিকা আছে কি না? পরিবর্তিত যুগ ও সমাজের জন্য মাদরাসা শিক্ষার কোন 'বার্তা' আছে কি না? সর্বোপরি সময়ের স্রোতধারার বিপরীতে টিকে থাকার যোগ্যতা আছে কি না?

এদিকে অন্য পক্ষ গাফলতের ঘোরে এমনই বেহুঁশ যে, সময়ের বাস্তবতা সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই। তারা মনে করে, এখনো চারশ ছয়শ বছর আগের বাগদাদ ও নিশাপুরের জামেয়া নেযামিয়ার যামানা বিরাজ করছে। কম-সে কম ফিরেঙ্গি মহলের দরসে নেযামির যামানা তো অবশ্যই বহাল আছে। হাকীকত ও সত্যের মুখোমুখি হতে তারা রাজী নয়। যামানার ইনকেলাব এবং সময়ের পরিবর্তন সম্পর্কে তারা ভাবতে প্রস্তুত নয়। যামানার কঠিন বাস্তবতা থেকে নিজেদের তারা এমনভাবে গুটিয়ে রেখেছে যেন উটপাখী। ঝড়ের মুখে বালুর ভিতরে মুখ লুকিয়ে উটপাখী ভাবে, যেহেতু সে দেখছে না সেহেতু পৃথিবীতে কিছুই ঘটছে না। কিন্তু অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ হয়? চোখ বুজে কি ঝড় থেকে আত্মরক্ষা হয়?

বলাবাহুল্য যে, চিন্তার জগতে উভয়পক্ষ দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। উভয়ের চিন্তা চরম প্রান্তিকতার শিকার, আমাদের মাদরাসার পরিভাষায় যাকে বলে, 'নাকীযের' দুই প্রান্তে তাদের অবস্থান। কোন পক্ষই বাস্তবতার পরিচয় দিতে পারেনি এবং কারো চিন্তাই সরল রেখা ও মধ্যবর্তী রাস্তায় অগ্রসর হতে পারেনি।

সময়ের দ্রুত পরিবর্তন

বন্ধুগণ! আপনারা জানেন না এমন নয় এবং এটা জানার জন্য বড় কোন উদ্ঘাটন বা গবেষণার প্রয়োজন, তাও নয়। চোখ মেলে তাকালে যে কেউ বুঝতে পারে যে, যামানা বড় সংবেদনশীল এবং সময় দ্রুত পরিবর্তনশীল। বরং ইতিমধ্যেই সময়ের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে। তারপরও সময়ের গতি থেমে নেই, পরিবর্তনের ধারা চলছে তো চলছেই। সুতরাং তালিবানে ইলম হিসাবে অস্তিত্বের স্বার্থেই আমাদের আজ ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে। উভয় প্রান্তিকতা পরিহার করে শান্ত মস্তিষ্কে, পূর্ণ স্থিরতা ও স্থৈর্যের সাথে গভীরভাবে আত্মপর্যালোচনা করতে হবে যে, আমাদের ভবিষ্যত কী? আগামী দিনে আমাদের সম্ভাবনা কী? পরিবর্তিত সময়ে আমাদের করণীয় কী? সময়ের কাছে আমাদের আশা ও প্রত্যাশা কি? এবং আমাদের কাছে সময়ের দাবী ও চাহিদা কী? আর কীভাবে তা পূরণ করা সম্ভব?

মাদরাসা তো প্রত্নতত্ত্ব-কেন্দ্র নয়

একটি কথা আমি খোলামেলা বলতে চাই। এ বিষয়ে বড় বড় ও ভালো ভালো বই এসে গেছে, হয়ত আপনারা পড়েছেন, নয়ত আগামীতে পড়বেন।

চিন্তাশীল ও গবেষক সমাজ তত্ত্বগত ও তথ্যগত দিক থেকে চিন্তা-গবেষণার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পৃথিবীর কোন ব্যবস্থা শুধু ঐতিহ্যপ্রীতির ভিত্তিতে, শুধু অতীতের দোহাই দিয়ে টিকে থাকতে পারে না এবং জোর করে তার অস্তিত্ব ধরে রাখা যায় না। যত উন্নত ব্যবস্থাই হোক, শুধু মহান ঐতিহ্য ও পবিত্র উত্তরাধিকার হিসাবে বা মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক স্মৃতি হিসাবে টিকে থাকা সম্ভব নয়, টিকিয়ে রাখাও সম্ভব নয়।

পৃথিবীতে যাদুঘর ও প্রত্নতাত্ত্বিক ভবনের অবকাশ অবশ্যই আছে। বড় বড় সব শহরেই আছে। জীবন্ত যাদুঘরও আছে, মৃত যাদুঘরও আছে। হয়ত আপনাদের প্রাদেশিক রাজধানী পাটনায়ও আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে এধরনের যাদুঘর ও প্রত্নতাত্ত্বিক ভবন যত্নের সাথেই সংরক্ষণ করা হয়। সেজন্য পর্যাপ্ত ভূমি ও পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করা হয়। এটা ঠিক আছে। কিন্তু ভেবে দেখুন, চলমান জীবনে তার অবস্থান ও ভূমিকা কী? নিরীহ ও নিঃসম্পর্কিত, পরিদর্শন ও বিনোদনযোগ্য উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়। কতিপয় প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন ছাড়া কিছু নয়। এগুলোর সংরক্ষণ এ জন্য নয় যে, জীবনের জন্য তা অপরিহার্য এবং সময়ের গতি এ ছাড়া অচল। কিংবা সমাজের প্রগতির ক্ষেত্রে এর কোন ভূমিকা রয়েছে। মোটেই নয়, বরং শুধু এই যে, মানুষের ব্যস্ত জীবনে সাময়িক বিনোদন ও মনোরঞ্জনের প্রয়োজনে এগুলোকে রাখা হয়েছে। আর রাখা হয়েছে, যেন মানুষ তাদের অতীত ইতিহাস নিয়ে গর্ব করার সুযোগ পায়। কেননা এগুলো তাদের গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন, দেশ ও জাতির অতীত সভ্যতার কোন একটি অধ্যায়ের প্রতিনিধি। এর বেশী কিছু নয়। এই স্মৃতিবস্তুগুলোর যদি অনুভূতি থাকতো, কিংবা এগুলো যাদের স্মৃতিচিহ্ন তাদের যদি জীবন থাকতো তাহলে তামাশার বস্তু হিসাবে তারা মোটেই খুশী হতো না, বরং এ অপমানজনক অবস্থার বিরুদ্ধে অবশ্যই তারা প্রতিবাদ করতো।

কোন জীবন্ত জাতি ও যিন্দা কাওম, যাদের কাছে মানব ও মানবতার জন্য রয়েছে নিজস্ব পায়গাম ও রিসালাত এবং বাণী ও বার্তা, রয়েছে স্বতন্ত্র জীবনদর্শন ও সমাজ-চিন্তা, যারা ন্যায় ও সত্যরূপে কিছু বিষয়কে স্বীকার করে এবং প্রচার করে, আবার অন্যায় ও অসত্যরূপে কিছু বিষয়কে অস্বীকার করে এবং প্রতিরোধ করে, জীবনের পথে চলার জন্য আল্লাহ যাদের দান করেছেন নূর ও নূরানিয়াত তারা সময় ও সমাজের বুকে এ অবস্থান কিছুতেই মেনে নিতে রাজী হবে না যে, দয়া করে কিছু স্থান বরাদ্দ করা হলো এবং নিরীহ ও ক্ষতিহীন মনে করে সেখানে পড়ে থাকার সুযোগ দেয়া হলো। যেমন প্রাচীন মিসরের ফেরআউনদের মমিকৃত লাশ দর্শনীয় বস্তুরূপে রেখে দেয়া হয়েছে।

দ্বীনী মাদরাসা কি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন?

যারা এ ভাষায় দ্বীনী মাদরাসার পক্ষে ওকালতি করেন যে, ভাই! দেশে বড় বড় যাদুঘর আছে, প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রয়েছে। বৃটিশজাতির তো বড় বৈশিষ্ট্যই হলো প্রত্নতত্ত্ব-প্রীতি। এক লন্ডনে যত বড় বড় মিউজিয়াম আছে সম্ভবত দুনিয়ার অন্য কোন শহরে নেই। সুতরাং এই নিরীহ-নির্বিরোধী দ্বীনী মাদরাসাগুলোকে আর কিছু না হোক প্রাচীন স্মৃতি হিসাবেই রেখে দাও না কেন! তাহলে আমি অন্তত দ্বীনী শিক্ষা ও দ্বীনী মাদরাসার জন্য এ অপমানজনক অবস্থান মেনে নিতে প্রস্তুত নই। আমি তো মনে করি; যে শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব মাওলানা কাসিম নানুতবী (রহ) করেছেন এবং যে জন্য মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী (রহ) নদওয়াতুল উলামা কায়েম করেছেন– আমরা সবাই যে শিক্ষাঙ্গনের মানস-সন্তান, তার ভিত্তি এ ধরনের হীনমন্য চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার উপর ছিলো না। এটা সমাজের কাছে দয়া ও করুণার কোন আবেদন ছিলো না। যুগ ও সমাজের কাছে তাদের এই নিবেদন ছিলো না যে, ভাই! তোমরা তো কত কিছুর জন্য কত জায়গা ছেড়ে রেখেছো। বড় বড় শহরে, জীবনের দৌড়ঝাঁপ ছাড়া যেখানে আর কিছুর অবকাশ নেই, যেখানে ফালতু একহাত জমি পাওয়ারও সুযোগ নেই সেখানেও তো বিশাল আয়তনের কবরস্তান পড়ে আছে, সুতরাং মাদরাসাগুলোর জন্য কিছু জায়গা ছেড়ে দিলে তোমাদের কী এমন ক্ষতি! আর কিছু না হোক তোমাদের অতীত গৌরবের স্মৃতি হিসাবেও তো এগুলো বেঁচে থাকতে পারে!

তো আমি অন্তত এই নাকে খত দেয়া অবস্থান মেনে নিতে পারি না।

যাই হোক এক দল মনে করে যে, আজকের সমাজে দ্বীনী শিক্ষা ও দ্বীনী মাদরাসার কার্যকারিতা ও জীবন-যোগ্যতা শেষ হয়ে গেছে। এখন টিকে থাকতে হলে যাদুঘর বা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসাবেই শুধু টিকে থাকতে হবে। কিন্তু আগেই বলেছি যে, প্রথমত আমি এই করুণাপ্রার্থীর অবস্থান মেনে নিতে পারি না। দ্বিতীয়ত নির্মম সত্য এই যে, দুনিয়াতে যে জামাত ও সম্প্রদায় এবং যে ইদারা ও প্রতিষ্ঠান এ লজ্জাজনক অবস্থানে নেমে আসে এবং সময় ও সমাজের করুণার উপর বেঁচে থাকার যিল্লতি মেনে নেয় তার জন্য জীবনসংগ্রামে মুখরিত এই পৃথিবীতে টিকে থাকার বিশেষ কোন সুযোগ থাকে না। তার জন্য জীবনের স্পন্দন অব্যাহত রাখার কোন উপায় থাকে না। জীবনের প্রয়োজন এবং সময়ের দাবী ও চাহিদা এতই একরোখা যে, কোন কারণে আজ যদি মানুষ এ সমস্ত কবরস্তান ছেড়েও দিয়ে থাকে তো আগামীকাল ছেড়ে দেবে

না। কেননা জীবিতদের কাছে মৃতদের দাবী কখনোই অগ্রাধিকার পায় না। দিল্লীর খাজা বাকি বিল্লাহর কবরস্তান কত বিরাট ছিলো! সেই কবরস্তান দেখেছেন এমন মানুষ এখানেও হয়ত আছেন। জীবনের শুরুতে আমার দিল্লীভ্রমণকালে সেটা ছিলো এক বিরাট খোলা ময়দান। হাজার হাজার কবর ছিলো, তারপরও বিরাট খালি জায়গা ছিলো। কিন্তু এখন সেখানে হযরত খাজা বাকি বিল্লাহর মাযার আছে, আর চারপাশে সামান্য কিছু জায়গা আছে, গোটা কবরস্তান চলে গেছে যিন্দা মানুষদের দখলে। এটা এ জন্য যে, শহরের চাহিদা ও প্রয়োজন বাড়তেই থাকে এবং এটাকে মনে করা হয় হাকীকত ও বাস্তব সত্য। পক্ষান্তরে মুর্দাদের সমস্যাকে মনে করা হয় নিছক মজবুরি ও নাচারি। আর মজবুরি ও নাচারি কখনো হাকীকত ও বাস্তব প্রয়োজনের মোকাবেলা করতে পারে না।

সুতরাং আমার বক্তব্য এই যে, প্রথমত দ্বীনী শিক্ষা ও দ্বীনী মাদরাসার জন্য এ অবস্থান গ্রহণযোগ্যই নয়, দ্বিতীয়ত মানব জাতির ইতিহাস প্রমাণ করে যে, সময় ও সমাজ খুব বেশী সময়ের জন্য দয়া ও করুণার আব্দার বরদাস্ত করে না এবং কারো মজবুরি ও নাচারির কাহিনী শুনতে চায় না। কেননা জীবন হলো চিরপ্রবাহমান এক স্রোতধারা এবং সময় এমনই বাস্তববাদী যে, যোগ্যতা ও উপযোগিতার প্রশ্নে সে অনড় এবং শ্রেষ্ঠত্বের বন্দনায় বিভোর। তাই যোগ্যতা ও উপযোগিতা ছাড়া কাউকে গ্রহণ করতে কিংবা নিজের অংশ থেকে অংশ দিতে সে রাজী নয়।

ইতিহাস ও ঐতিহ্য অস্তিত্বের নিরাপত্তা নয়

পৃথিবীর বুকে কোন প্রতিষ্ঠান শুধু এই যুক্তিতে এগিয়ে যেতে পারে না যে, আজ থেকে একশ দু'শ বছর আগে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং জাতির জীবনে তার অবদান রয়েছে, সুবর্ণ অতীত ও গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। শুধু ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে এবং শুধু অতীতের দোহাই দিয়ে কোন প্রতিষ্ঠান, কোন দল ও আন্দোলন এবং কোন দর্শন ও ব্যবস্থা না পিছনে চলেছে, না সামনে চলবে। কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, কিংবা তার অনুকূলে কিছু রেয়ায়েত লাভের জন্য আপনি যদি তার ইতিহাস ও অতীত অবদান তুলে ধরেন তাহলে কেউ তা কান পেতে শুনতে পর্যন্ত রাজী হবে না। কোন কারণে আজ যদি মানুষ চুপ থাকে তাহলে আগামীকাল অবশ্যই ভিতর থেকে জোর দাবী ওঠবে যে, এ বোঝা নামাও, এ আপদ দূর করো। এমনকি বিনোদনের জগতেও দেখুন, আজকের নন্দিত তারকা আগামীকাল কীভাবে কক্ষচ্যুত হয়ে পড়ে। এ

পৃথিবীতে করুণার কোন স্থান নেই। এমনকি যোগ্যতরের মোকাবেলায় যোগ্য ব্যক্তিরও এখানে স্থান নেই।

অধিকতর উপকারীর বেঁচে থাকার অধিকার

এই বিশ্বজগতে আল্লাহর যে অটল বিধান শুরু থেকে কার্যকর এবং আলকোরআন আমাদের সামনে যে সত্য তুলে ধরে তা এই যে, অধিকতর উপকারী শুধু টিকে থাকবে। আজকের পৃথিবী অবশ্য যোগ্যতরের অধিকারের (SURVIVAL OF THE FITTEST) কথা বলে, কিন্তু আলকোরআন ঘোষণা করেছে অধিকতর উপকারীর বেঁচে থাকার বিধান। এবং এটাই সত্য। সূরাতুর-রাদ-এর আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে। আপনারাও হয়ত বারবার পড়েছেন এবং তাফসীরও দেখেছেন–

فأما الزبد فيذهب جفآء، و اما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال

'ফেনা ও খড়কুটা যা তা ভেসে যাবে, আর যা মানুষকে উপকার দান করে তা যমিনে টিকে থাকবে। এভাবেই আল্লাহ উদাহরণ তুলে ধরেন'।

সময় ও সমাজের জন্য যে প্রতিষ্ঠানের উপকারিতা নেই, যার কাছে কোন পায়গাম ও বার্তা নেই, যার কোন দান ও অবদান বর্তমান নেই, মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতি যার উপর নির্ভরশীল নয় এবং মানবতার অস্তিত্ব ও বিকাশ যার মুখাপেক্ষী নয় তা নিজেও অস্তিত্বের অধিকার হারিয়ে ফেলে। এ ধরনের অপ্রয়োজনীয় বস্তুকে আলকোরআন زبد বলে আখ্যায়িত করেছে, যা অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক অর্থবহ শব্দ।

'যাবাদ' হলো সাগরের ফেনা যার ভেতরে স্বতন্ত্র সত্তাগত অস্তিত্ব নেই, যার মাঝে স্থিতি ও স্থায়িত্বের যোগ্যতা নেই। কেননা ফেনা শুধু সাগরের স্ফীতির একটি বাহ্যিক প্রকাশ। তাতে কোন বস্তুগুণ ও জমাটতা নেই, বাতাসপূর্ণ ফাঁপা অবস্থামাত্র। কিংবা ধরুন, নীচের কিছু ময়লা উপরে ভেসে উঠেছে, মানুষের উপকার করার কোন যোগ্যতা নেই। পানির উপর দিয়েই তা ভেসে যাবে, কিংবা কিনারে গিয়ে কোন কিছুর সাথে আটকে যাবে, তার স্থায়ী কোন অস্তিত্ব থাকবে না। কেননা তার মাঝে অস্তিত্ব রক্ষার যোগ্যতা নেই। আল্লাহর বিধান এ অনুমতি দেয় না যে, 'যাবাদ' বা সাগর-ফেনা বেশী সময় বাকি থাকবে। কেননা বিশ্বজগতে এতটা প্রশস্ততা নেই যে, সাগরের যুগ যুগের ফেনা ও খড়কুটা সে ধারণ করতে পারে। সাগর-ফেনার মত 'অপদার্থ' যদি বাকি থেকে

যায় তাহলে তো মানুষের উপকারের জন্য যেগুলোর বাকি থাকা উচিত সেগুলোর জন্য সমস্যা সৃষ্টি হবে। তাই আল্লাহর অটল বিধান এই যে, যা মানুষের উপকার করবে এবং যা মানুষ ও মানবতার জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হবে তাই শুধু পৃথিবীতে বাকি থাকবে।

যামানা শুধু বোঝে যোগ্যতা ও প্রতিযোগিতার ভাষা

যত তিক্তই হোক স্পষ্ট সত্য এই যে, আমাদের দ্বীনী মাদরাসাগুলো যদি অস্তিত্ব রক্ষা করতে চায় এবং যিন্দেগির কাফেলায় মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করতে চায় এবং সময় ও সমাজের কাছে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে নিজের উপকারিতা এবং যোগ্যতা ও উপযোগিতা প্রমাণ করতে হবে। সময় ও সমাজের কাছে তাকে এ সত্য তুলে ধরতে হবে যে, চলমান জীবনে তার প্রয়োজন রয়েছে এবং তাকে বাদ দিয়ে সে প্রয়োজন পূর্ণ হতে পারে না, বরং তার অবর্তমানে এক বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হবে যা মানব সমাজের জন্য ক্ষতিকর। এ ছাড়া অস্তিত্ব রক্ষার এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার আর কোন উপায় নেই। কেননা সময় ও সমাজ যে ভাষা বোঝে এবং সবসময় বুঝে এসেছে তা হলো যোগ্যতা ও প্রতিযোগিতা এবং উপকারিতা ও উপযোগিতার ভাষা। এ ভাষা বোঝার জন্য তরজমার প্রয়োজন নেই। আরবীতে বলুন কিংবা ইংরেজীতে যামানা তা বোঝবে। শব্দের ভাষায় বলুন কিংবা শব্দহীন ভাষায় যামানা তা বোঝবে। কেননা মানুষের ভাষা বিভিন্ন, কিন্তু যামানার ভাষা অভিন্ন। যামানা যে ভাষা বোঝে তা হলো যোগ্যতা ও প্রতিযোগিতা এবং উপকারিতা ও উপযোগিতার ভাষা, সংগ্রামময় জীবনের মুখরিত অঙ্গনে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার ভাষা। আল্লামা ইকবাল যেমন বলেছেন, 'জীবন হলো নিরন্তর সংগ্রামের নাম, যোগ্যতা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অধিকার প্রতিষ্ঠার নাম।'

জীবন কারো দয়া ও দান নয়। জীবন তো যোগ্যতাবলে নিজে অর্জন করতে হয়। আপনি জীবনের অধিকার অর্জন করুন, পৃথিবী আপনাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

জার্মানীর ইতিহাস দেখুন, দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পরও বিজয়ী শক্তি মানচিত্র থেকে তাকে মুছে ফেলতে পারে নি, বরং ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তার অস্তিত্ব মেনে নিয়েছে। পৃথিবীতে বহু জাতির বিলুপ্তি ঘটেছে, আবার এমনও জাতি আছে যারা বারবার পরাজিত হয়েও টিকে আছে। তাতারীদের হাতে মুসলিম জাতির এমন পরাজয় ঘটেছিলো যে, সম্ভবত দুনিয়ার অন্য কোন জাতির ইতিহাসে তার নজির নেই। কিন্তু তাদের মাঝে ছিলো মানুষের উপকার এবং

মানবতার কল্যাণ সাধনের যোগ্যতা, তাদের কাছে ছিলো একটি যিন্দা দাওয়াত এবং একটি জীবন্ত বাণী ও বার্তা, তাই বিজয়ী তাতারীদেরকে শেষ পর্যন্ত মাথা নোয়াতে হয়েছিলো মুসলিম জাতির সামনে।

তাতারীদের শক্তি ও তলোয়ার মুসলমানদের পরাজিত করেছিলো, কিন্তু তাতারীদের দিল ও দেমাগ এবং হৃদয় ও মস্তিষ্ক মুসলমানদের দাওয়াতের সামনে, তাদের উপকারিতা ও কল্যাণকরতার সামনে অবনত হয়েছিলো।

আমার প্রিয় বন্ধুগণ! আমাদের দ্বীনী মাদরাসাগুলোর সামনে আজ একটিমাত্র পথ খোলা রয়েছে, আর তা এই যে, যিন্দেগির ময়দানে তাকে তার যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করতে হবে। সময় ও সমাজকে বোঝাতে হবে যে, মাদরাসা ও তার কোরবানি যদি না থাকে, দ্বীনী শিক্ষা ও দ্বীনী দাওয়াত যদি না থাকে তাহলে জীবন অর্থহীন হয়ে যাবে, কিংবা জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অন্ততপক্ষে জীবনে এক বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হবে, যা আর কেউ পূর্ণ করতে পারে না। এছাড়া নিছক দয়া ও করুণার আবেদন পৃথিবীতে না কখনো গ্রহণযোগ্য হয়েছে, না গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আর এ যুগ তো হলো গণতন্ত্রের যুগ। এখন তো এ অবকাশ মোটেই নেই যে, আমরা হাত জোড় করে বলবো, ভাই! অমুক সরকার আমাদের প্রতি সদয় ছিলো, অমুক সরকার আমাদের রক্ষা করেছে। অমুক অমুক যুগে আমাদের বড় শান-শওকত ছিলো, তোমরাও দয়া করে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করো, আমরা তোমাদের ক্ষতির কারণ হবো না। কিংবা যদি বলি, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে মাদরাসা ও আলেম সমাজের অবদান ছিলো, সুতরাং আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার আছে, তাহলে ভাই, আমার কথা বিশ্বাস করো, আজকের পৃথিবী তা মেনে নেবে না। পৃথিবী এখন অনেক বেশী হিসেবী, অনেক বেশী স্বার্থনিমগ্ন।

গুরুত্বপূর্ণ এক মোর্চায় আপনাদের অবস্থান

সময় ও সমাজের কাছে আপনারা প্রমাণ করুন যে, আজকের জীবনসংগ্রামের অতি গুরুত্বপূর্ণ এক মোর্চায় ও ঘাঁটিতে আপনারা অবস্থান করছেন। যদি আপনারা এ ঘাঁটি ত্যাগ করেন তাহলে তা সামলানোর মত আর কেউ নেই। আপনারা প্রমাণ করুন যে, ঈমান ও বিশ্বাসের মোর্চায় এবং আখলাক ও রূহানিয়াতের ঘাঁটিতে আপনারা অবস্থান করছেন, খেদমতে খালক ও মানবসেবার ঘাঁটিতে আপনারা অবস্থান করছেন, ইলমচর্চা ও জ্ঞানসাধনার অতি উচ্চস্তরে আপনারা অবস্থান করছেন। নিজেদের অবস্থান থেকে যদি আপনারা সরে আসেন, কিংবা যদি আপনাদের সরিয়ে দেয়া হয় তাহলে

যিন্দেগির ময়দানে এবং জীবনের রণাঙ্গনে এমন বিরাট শূন্যতা দেখা দেবে যা কোন আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় বা কোন জ্ঞান ও গবেষণা পরিষদ পূর্ণ করতে পারবে না এবং অন্য কোন কর্মসূচী ও কর্মপ্রচেষ্টাই তার বিকল্প হতে পারবে না। এটাই হলো আল্লাহর সেই চিরন্তন বিধান যা আলকোরআনে উপরের আয়াতে বলা হয়েছে–

فأما الزبد فيذهب جفآءا و أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال

'ফেনা তো ভেসে চলে যাবে, আর যা মানুষের উপকার করে তা পৃথিবীতে বাকি থাকবে। এভাবেই আল্লাহ উদাহরণ তুলে ধরেন।'

আমাদের বুঝতে হবে যে, বর্তমান যুগে শুধু মুসলমানদের নেক জাযবা ও কল্যাণ চেতনা এবং শুধু দ্বীন ও শরীয়তের প্রতি মুসলমানদের মুহব্বত ও ইহতিরামের উপর ভিত্তি করে কিংবা ওলামায়ে কেরামের অতীতের বুজুর্গি ও কোরবানির দোহাই দিয়ে দ্বীনী মাদরাসাগুলো তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে না। বুকের উপর পাথর রেখে আমি এ শব্দগুলো উচ্চারণ করছি। বলতে আমার নিজেরও যন্ত্রণাবোধ হচ্ছে, কিন্তু এটা তিক্ত সত্য, আর সত্যের মুখোমুখি আমাদের হতেই হবে। অন্তত এই মহান শিক্ষাঙ্গনের তালিবানে ইলমের সামনে তো এ সত্য আমাকে অবশ্যই তুলে ধরতে হবে। কেননা এর প্রতিষ্ঠাতা সেই মহান ব্যক্তি যিনি তাঁর যুগের মানুষের সামনে সর্বপ্রথম স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে, যুগের পরিবর্তন ঘটেছে এবং সময়ের স্রোত নতুন দিকে মোড় নিয়েছে, আর সময় ও সমাজের বৈধ দাবী ও চাহিদা অবশ্যই পূরণ করতে হবে এবং নিজেদের উপযোগিতা ও উপকারিতা প্রমাণ করতে হবে।

হযরত মূঙ্গেরী (রহ) এর প্রজ্ঞা ও অর্ন্তদৃষ্টি

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী (রহ) কে আপনারা একজন শায়খে তারীকত এবং ওলিয়ে কামিল রূপে জানেন। নিঃসন্দেহে তিনি অতি উচ্চস্তরের 'ছাহেবে নিসবত' বুজুর্গ ছিলেন। সমকালীন বুজুর্গানে দ্বীনও তাঁর নিসবত ও 'উর্ধ্ব-সম্পর্কের' স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান ছাহেব (রহ) তাঁর সম্পর্কে এত উচ্চমার্গের মন্তব্য করেছেন যে, সে পর্যন্ত পৌঁছা আমাদের উপলব্ধির পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এর সঙ্গে সংযোজন করে আমি বলতে চাই যে, আল্লাহ তাঁকে এমন দ্বীনী প্রজ্ঞা ও বাছীরত এবং অর্ন্তদৃষ্টি ও নূরে বাতেন দান করেছিলেন যা খুব কম মানুষেরই

নছীব হয় এবং তাদেরই নছীব হয় যাদের দ্বারা আল্লাহ বড় কোন কাজ নেন। আল্লামা ইকবাল তাঁর কবিতায় যে মহাপুরুষের কথা বলেছেন, আমি মনে করি হযরত মূঙ্গেরী ছিলেন তারই প্রতিচ্ছবি। আল্লামা ইকবাল বলেছেন–

دو صد دانا دریں محفل سخن گفت   سخن نازک تراز برگ سمن گفت

ولے بامن بگو آن ذیدہ ور کیست   کہ خارے دید و احوال چمن گفت

'এই মাহফিলে কত শত মানুষ কত শত কথা বলেছে। কিন্তু আমাকে দেখাও এমন একজন মানুষ যিনি বাগানের কাঁটাও দেখেছেন এবং ফুলের সৌন্দর্যও দেখেছেন, তারপর বাগানের কাহিনী বলেছেন।'

নাদওয়াতুল উলামার আন্দোলন সাধারণ কোন আন্দোলন ছিলো না। এ আন্দোলন ছিলো যুগের ওলামায়ে উম্মতের দ্বীনী প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টির সর্বোচ্চ প্রকাশ। আপনাদেরকে আমি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী (রহ) এর শিক্ষাঙ্গনের তালেবানে ইলম হিসাবে সম্বোধন করছি। আমি জামেয়া রাহমানিয়া বা নাদওয়াতুল উলামা-কে চিনি না। আমি তো চিনি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী (রহ) ও তাঁর চিন্তাধারাকে। তাই আপনাদেরকেও এবং নাদওয়ার ছাত্রদেরকেও আমি মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী (রহ) এর শিক্ষাঙ্গনের তালিবানে ইলম হিসাবেই সম্বোধন করি। এই দু' তিনদিন আগে সেখানে আমি নাদওয়ার ছাত্রদের সম্বোধন করেছি এবং সুঘটনাই বলতে হবে যে, আজ আপনাদের সম্বোধন করার সুযোগ পেয়েছি।

আপনাদের করণীয় দু'টি কাজ

এখন আমি আসল উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হবো। আপনাদের আসল ফায়দা ও কল্যাণের কথা আপনাদের সামনে নিবেদন করবো। আপনারা দু'ভাবে আপনাদের উপকারিতা ও উপযোগিতা প্রমাণ করতে পারেন; সময় ও সমাজের সামনে নিজেদের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা এবং জীবনের অধিকার সাব্যস্ত করতে পারেন। প্রথমত আভ্যন্তরীণ অঙ্গন থেকে, দ্বিতীয়ত বহিরাঙ্গন থেকে। আভ্যন্তরীণ অঙ্গন তো এই যে, আপনারা ইলম চর্চা ও জ্ঞান সাধনায় পূর্ণতা ও পারদর্শিতা অর্জন করুন।

মানপত্রেও আপনারা ইঙ্গিত করেছেন এবং মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ রাহমানী ছাহেবও বলেছেন, 'আমি একজন বিশ্ব-পর্যটক।' এতে প্রশংসার বা গর্বের কিছু নেই। আল্লাহর কোন হিকমত ছিলো, বহু দেশ দেখার এবং সেখানকার ইলমী মজলিসে জ্ঞানী-গুণীদের সঙ্গে বসার এবং মতবিনিময় করার সুযোগ আমার

হয়েছে। তালীম-তারবিয়াত ও শিক্ষা-দীক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনুষ্ঠিত সেমিনার-সম্মেলনেও আমি যোগদান করেছি। বিভিন্ন দেশের বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথেও আমার বিশেষ যোগাযোগ ও সম্পর্ক রয়েছে। পৃথিবীর ভালো-মন্দ আমি দেখেছি। তাই বিশ্বের প্রায় সব দেশ ঘুরে আসা এবং সব কিছু দেখে আসা, সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার অধিকারী একজন মানুষ হিসাবে আমি আপনাদের বলছি। আর এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, আমার কথার গুরুত্ব ও গভীরতা যেন আপনারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। আমার কথা একজন সাধারণ পথচারী ও মুসাফিরের কথা নয়, দুনিয়ার বড় বড় স্কলার ও জ্ঞানী-গুণীদের মজলিসে বসে সব দেখে আসা মানুষের কথা। কবির ভাষায়–

میرے دیکھے ہوئے ہیں مشرق و مغرب کے میخانے

'মাশরিক-মাগরিবের শরাবখানা আমি দেখে এসেছি এবং চেখে এসেছি।'

সুতরাং আমি পূর্ণ দায়িত্বের সাথে আপনাদের বলছি, যে কোন ইলম –তার গোত্র, শ্রেণী ও পরিচয় যাই হোক– তাতে পূর্ণতা ও পারদর্শিতা অর্জন করা অবশ্যই ফলদায়ক ও কল্যাণজনক। আপনারা যদি মনে করেন যে, আরবী ভাষা ও সাহিত্যে এবং দ্বীনী ইলমের বিভিন্ন শাখায় কামাল পয়দা করে কী হবে? জঙ্গলে ময়ুরের নাচ কে দেখবে? কোথায়, কে আমাদের এ সব যোগ্যতার কদর করবে?

তাহলে আমি বলবো, এটা আপনাদের অজ্ঞতার কথা। আমি বলছি এবং সচেতনভাবে বলছি, হিন্দুস্তান থেকে শুরু করে ইউরোপ আমেরিকা পর্যন্ত এবং দেওবন্দ-আলীগড় থেকে শুরু করে অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ পর্যন্ত সর্বত্র আপনাদের ইলমের এবং ইলমী কামালের কদর রয়েছে। তবে শর্ত ঐ একটাই– কামাল ও পূর্ণতা এবং যোগ্যতা ও পারদর্শিতা।

কামাল ও পূর্ণতা কাকে বলে?

অবশ্য নারায না হলে আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, কামাল ও পূর্ণতা কাকে বলে? কোন বিষয়ের সাধারণ ধারণা ও লঘু জ্ঞানকে অবশ্যই কামাল বলে না। আরবী ভাষায় দু'টো কথা বলতে পারা, দু' কলম লিখতে পারা এবং কিতাবের এবারত পড়তে পারাকে কামাল বলে না। কামাল তো বলে কোন বিষয়ের তলদেশে ডুব দিয়ে মণিমুক্তা তুলে আনাকে। কামাল ও পূর্ণতা তো এমন এক শক্তি যা নিজেই নিজের স্বীকৃতি আদায় করে নেয়। আমি পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বলছি যে, যুগের পরিবর্তন ও সময়ের প্রতিকূলতার কথা বলে

হায় হুতাশ করা আসলেই ভিত্তিহীন।

যারা আপনাদের বলে বেড়ায় যে, কোথায় কোন চক্করে পড়ে আছো! কিসের পিছনে সময়ের অপচয় করছো! চেয়ে দেখো, সময় ও সমাজ কত বদলে গেছে! জীবনের সর্বত্র পরিবর্তনের কেমন দোলা লেগেছে! ধর্মজ্ঞান ও আরবী শিক্ষা এযুগে কী কাজে আসবে? তার চেয়ে পড়তে যদি কলেজ-ভার্সিটিতে, করতে যদি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা-সাধনা তাহলেই না সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতে। এসব যারা বলে, বিশ্বাস করুন তারা আপনাদের ধোকায় ফেলতে চায়। এসব কাঁচা বুদ্ধির কাঁচা কথা। বাস্তব সত্য এই যে, পৃথিবীর যে কোন বিষয়ে আপনি কামাল ও পূর্ণতা এবং যোগ্যতা ও বিশেষজ্ঞতা অর্জন করুন. তখন আপনার মুখে আর এ অভিযোগ উচ্চারিত হবে না যে, যামানা আমাকে জিজ্ঞাসা করে না, সময় আমাকে সুযোগ দেয় না। আমাদের দ্বীনী শিক্ষার যা কিছু অবক্ষয় ও অবমূল্যায়ন আপনি দেখতে পাচ্ছেন তার কারণ যোগ্যতা ও পূর্ণতার অভাব ছাড়া অন্য কিছু নয়।

দেখুন, একসময় হিন্দুস্তানব্যাপী ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রের একচ্ছত্র জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা ছিলো এবং সারা দেশের সর্বত্র হেকীম সাহেবদের দাওয়াখানা ছিলো। হিন্দু-মুসলমান, নেককার-বদকার ও আলেম-জাহেল নির্বিশেষে সমস্ত রোগী হেকীম সাহেবদের শরণাপন্ন হতো। দাওয়াখানায় রোগীর ভীড় লেগে থাকতো এবং তাদের সামাল দিতে হেকীম সাহেব রীতিমত হিমশিম খেতেন, কিন্তু এখন! বেচারা হেকীম ও তার দাওয়াখানার করুণ অবস্থা দেখে সত্যি করুণা হয়।

আপনারা কি মনে করেন যে, ইউনানী চিকিৎসার পতনের কারণ হলো দেশে ইউরোপীয় চিকিৎসা ও আধুনিক ঔষধের আগ্রাসন? আমি তা স্বীকার করি না। আমার দাবী এই যে, ইউনানী চিকিৎসার পতনের মূল কারণ হলো, অতীতের মত বিজ্ঞ হেকীমের অভাব, যাদের মেধা ও হেকমত ছিলো অকল্পনীয়। এখনো যদি সেই রকম হেকীমের আবির্ভাব ঘটে তাহলে আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আধুনিক চিকিৎসার চিকিৎসকরাও তাদের শরণাপন্ন হবেন। আপনার শহরের সিভিল সার্জনও হেকীম সাহেবের দাওয়াখানায় ধরনা দিতে বাধ্য হবেন। আমার কথায় বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি নেই। রোগী ও চিকিৎসক সবাই ধরনা দেবে। কেননা রোগযন্ত্রণার উপশম না হলে ধরনা না দিয়ে উপায় কী?

আগে হেকীম পয়দা করুন, তারপর অবস্থা দেখুন। আমি প্রাচীন ইউনানের

জালীনুস ও বোকরাতের কথা বলছি না। আমি এ যুগের হেকীম আজমল খান ও হেকীম মাহমুদ খানের কথাই বলছি। এমন কি অন্তত তাদের অর্ধেক যোগ্যতার হেকীমও যদি তৈরী হয়ে যায় তাহলেই ইউনানী চিকিৎসার বিলুপ্তির বিলাপ বন্ধ হয়ে যাবে, এবং নব উত্থানের কোলাহল শুরু হয়ে যাবে। আসল ঘটনা এই যে, আগে দরসে নেযামী থেকে ফারেগ হয়ে মেধাবী আলেমগণ প্রায় সকলে ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহী, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী ও হযরত মাওলানা মূঙ্গেরী (রহ) সম্পর্কে আমার জানা নেই, কিন্তু সে যুগের অধিকাংশ আলিম চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন এবং অনেকে পেশা হিসাবেও তা গ্রহণ করতেন। মেধাবী ও অভিজাত পরিবারের সন্তানরা বিভিন্ন জ্ঞান ও শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জনের পর যখন সাধনা ও অধ্যবসায় সহকারে ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রে আত্মনিয়োগ করতেন তখন তারা এমন বিরল যোগ্যতার অধিকারী হতেন যে, শুধু শিরায় হাত রেখে রোগীর ভিতরে পৌঁছে যেতেন এবং যেন চোখে দেখে রোগ নির্ণয় করতেন।

বর্তমানে আমাদের মাদরাসাগুলোরও একই অবস্থা। আমাদের সমস্যা বিষয়ের নয়, সমস্যা হলো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের পূর্ণতা ও যোগ্যতার এবং মেধা ও প্রতিভার। আপনি যে কোন শাস্ত্রে এবং ইলমের যে কোন শাখায় বিশেষজ্ঞতা অর্জন করুন, পূর্ণতা ও গভীরতা লাভ করুন দুনিয়া আপনার ধার ও ভার স্বীকার করবে এবং আপনার যথাযোগ্য মূল্যায়ন করবে এবং আপনার জীবন ও জীবিকার সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে। আমাদের মাদরাসাগুলোর সামনে এখন যে সব সমস্যা ও প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা 'আপ সে আপ' দূর হয়ে যাবে। কেননা যা কিছু সমস্যা তা মূলত আমাদের দুর্বল মনোবল ও কর্মবিমুখতার অনিবার্য ফল।

আমাদের মাদরসাগুলোতে আজ কোন প্রতিভা জন্মলাভ করছে না, ফনের কোন ইমাম তৈরী হচ্ছে না। দলে দলে 'মাওলানা' তো বের হচ্ছে, কিন্তু আলিম ও আহলে ইলম তৈরী হচ্ছে না। এ বিষয়ে তো আমাদের মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ রহমানী সাহেবেরই বেশী তিক্ত অভিজ্ঞতা হওয়ার কথা। দেওবান্দ ও নদওয়া উভয় প্রতিষ্ঠানেরই তিনি গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদি রোকন। তিনি অবশ্যই জানেন যে, দেশের শীর্ষস্থানীয় এ দু'টি প্রতিষ্ঠান থেকে কী মাপের আলেম বের হচ্ছে। পরীক্ষকগণ দাওরার পরীক্ষা নিতে এসেছেন, দেখা গেলো 'মাওলানা' সাহেবরা হাদীছের এবারতই শুদ্ধ করে পড়তে পারেন না। বোখারী শরীফের প্রথম হাদীছ ভুল পড়ছেন এবং ভুল তরজমা করছেন। লাগাতার কয়েক বছর

এই মানের মাওলানারাই পাগড়ী মাথায় করে বের হয়ে আসছেন এবং আফসোস করছেন যে, এখন সমাজে আলিমের কদর নেই। মাদরাসায় পড়েই আমাদের ভাবিষ্যত নষ্ট হয়েছে। দ্বীনী শিক্ষার পথ নির্বাচন করে মা-বাবা আমাদের জীবন বরবাদ করেছেন।

আমার ধারণা, বিশ-পচিশ বছর থেকে এই অধঃপতন প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। অথচ এখনো আমাদের মাদরাসার পরিমণ্ডলে এমন সব ব্যক্তি রয়েছেন যারা ইলমের কোন না কোন শাখায় যোগ্যতা ও পূর্ণতা অর্জন করেছেন এবং যে যেখানে আছেন, মানুষের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছেন। মানুষের হুজুমে একটু নিরিবিলি সময় পাওয়া তার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ছে। যে কেউ যে কোন একটি বিষয়ে যদি 'কামাল' অর্জন করে তাহলে তার অর্থনৈতিক সমস্যাও শেষ, সামাজিক সমস্যাও শেষ। এর পরও যদি কারো রিযিকের বা সামাজিক মর্যাদার অভাব থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে, তার চরিত্রে ও আচরণে কোন না কোন দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কিছু দিন আগে এক মজলিসে আমি বলেছিলাম, যদি তোমরা কোন যোগ্য ও বা-কামাল মানুষের অভাবের কথা শোনো, কিংবা যদি কারো সম্পর্কে ইতিহাসে পড়ো যে, এত এত যোগ্যতা সত্ত্বেও সমাজে তার কদর হয় নি, তাহলে নিশ্চয় জেনো, তার মাঝে কোন না কোন ত্রুটি ও দুর্বলতা ছিলো, দম্ভ ও হঠকারিতা ছিলো, আলস্য ছিলো, বদমেজাজি ছিলো- একটা কিছু ছিলো, যার কারণে মানুষ তার থেকে ফায়দা নিতে পারেনি। অন্যথায় এটা আমি মানতে রাজী নই যে, একজন বা-কামাল ও যোগ্য মানুষ -যার মাঝে ধীরতা ও স্থিরতা ছিলো, সংযম ও ভারসাম্য ছিলো, আর সে- হারিয়ে গেছে।

আসল প্রশ্ন হলো সাধনা ও পরিশ্রমের এবং আখলাক ও চরিত্রের। ইলমের কামাল এবং আখলাকের জামাল- তথা জ্ঞানের পূর্ণতা এবং চরিত্রের সৌন্দর্য কারো মাঝে একত্রিত হওয়ার পর সামাজ তাকে মর্যাদা না দিয়ে পারে না।

আসল সমস্যা মেহনত মোজাহাদার

আমি আরেকটি কথা বলতে চাই। হয়ত আমার মুখে এধরনের কথা শোনবার ধারণাও আপনাদের নেই। আপনারা জানেন, আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার বুনিয়াদই ছিলো নেছাব ও পাঠ্যব্যবস্থার সংশোধনের উপর। মাওলানা মূঙ্গেরী (রহ) এর মত সনাতন শিক্ষা ব্যবস্থায় গড়ে ওঠা মানুষ- যাকে বলা যায় ঐ শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বোত্তম নমুনা- তিনি স্বয়ং নেছাব সংশোধনের আহ্বায়ক। আমি এবং মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ রহমানী

ছাহেবও এর প্রবক্তা। তারপরও আমি পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই যে, নেছাব সংশোধন তেমন বড় বিষয় নয়। বড় বিষয় হলো শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মেহনত ও সাধনা এবং পরিশ্রম ও অধ্যবসায়।

এটা বাস্তব সত্য যে, প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন কালজয়ী ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব তৈরী হয়েছেন যা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় তৈরী হচ্ছে না। রহস্য কোথায়? অথচ প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনায় আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার কিছু কিছু বিষয় অবশ্যই উন্নততর। যেমন সে যুগে আরবী সাহিত্যের পাঠ্য হিসাবে নাফহাতুল ইয়ামান ও মাকামাতে হারীরী পড়ানো হতো, গদ্য সাহিত্যে মানসম্মত এমন কোন কিতাব ছিলো না যা দ্বারা ভাষা ও সাহিত্যের বিশুদ্ধ রুচি এবং ভাব প্রকাশের যোগ্যতা সৃষ্টি হতে পারে। অথচ তখন এমন এমন ব্যক্তি তৈরী হয়েছেন যারা অবিস্মরণীয় কর্ম ও কীর্তি রেখে গেছেন। আল্লামা যোবায়দী, মাওলানা গোলাম আলী বেলগেরামী, শেখ মুহসিন বিন ইয়াহয়া তারহাতী, নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান এবং মাওলানা ছাদরুদ্দীন আযুরদাহ্-এর মত ব্যক্তি তৈরী হয়েছেন। পক্ষান্তরে এখন আরবী গদ্য সাহিত্যের উন্নত থেকে উন্নত কিতাব পড়ানো হয়, যাতে আরবী ভাষার সর্বোত্তম নমুনা সংকলিত হয়েছে, অথচ তেমন প্রতিভা উঠে আসছে না। নেছাব যদি প্রতিভা সৃষ্টির নিশ্চয়তা দিতো তাহলে তো এখন আরো বড় প্রতিভার জন্ম হতো। আমাদেরকেই দেখুন। আমার বন্ধু মাওলানা মসউদ আলম নদভী লেখক হিসাবে আরবী সাহিত্যে বিরাট সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি পড়েছিলেনটা কী? এই 'মাকাতে হারীরী' ছাড়া আর কী? আমার ছাত্রজীবনে তো 'মুখতারাত' ছিলো না। আমিও 'মাকামাতে হারীরী'র ছাত্র। সুতরাং আমি বলতে চাই, ইলমের কামাল ও যোগ্যতা লাভের বিষয়টি সিংহভাগ নির্ভর করে উস্তাদের মেহনত ও আত্মনিবেদন এবং তালিবে ইলমের সাধনা ও অধ্যবসায়ের উপর। উন্নত নেছাব অবশ্যই সহায়ক। তাই এখনো আমি নেছাব সংশোধনের প্রবক্তা, কিন্তু শুধু নেছাব সংশোধন যথেষ্ট নয়।

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম! আসল ত্রুটি তো এই যে, আপনারা মেহনত ছেড়ে দিয়েছেন। আপনাদের মাঝে নেই পূর্ববর্তীদের আবেগ-উদ্যম এবং প্রতিযোগিতার মনোবল। ইলমের কোন শাখায় কামাল ও পূর্ণতা অর্জন করা আপনাদের কাছে গর্ব ও গৌরবের বিষয় নয়। অথচ আমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা এই ছিলো যে, মাদরাসার মুদাররিসির মোকাবেলায় দুনিয়ার বাদশাহী কবুল করতেও তারা ছিলেন নারায। তাদের কাছে শিক্ষকতার মর্যাদা ছিলো এত বড় যে, রাজ্যের ওযারাতির প্রস্তাবও তারা হেলায় প্রত্যাখ্যান করতেন। অনেকে

এমনও ছিলেন যে, ওয়ারাতির দায়িত্ব পালন করছেন, আবার নিবেদিতপ্রাণ উস্তাদ হিসাবে দরসও দিচ্ছেন। ওযীর আসফুদ্দৌলা ও সা'আদত আলী দিনে ছিলেন কর্মব্যস্ত ওযীর, আর রাত্রে ছিলেন আত্মনিমগ্ন মুদাররিস। এধরনের বহু উদাহরণ আপনি পাবেন। অযোধ্যার স্বনামধন্য ওযীর তাফাযযাল হোসেন খান যখন দরসের মসনদে বসতেন, মনে হতো একজন শিক্ষক ছাড়া তিনি আর কিছু নন।

উদাহরণ আরো আছে। কিন্তু এখন আমি-আপনি তো মুদাররিস বলে পরিচয় দিতে রীতিমত সংকোচ বোধ করি। সুতরাং দিলের বড় দরদের সাথে একটি কথা আপনাদের বলতে চাই যে, ভিতর থেকে নিজেদের মাঝে যোগ্যতা ও পূর্ণতা সৃষ্টি করুন। মেহনত ও সাধনায় আত্মনিয়োগ করুন। ইলমের জন্য এবং জ্ঞানের তলদেশে পৌঁছার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করুন। কোন না কোন শাস্ত্রে কামাল ও পূর্ণতা অর্জন করুন।

এখন আমাদের মাদরাসাগুলোর সবচে' বড় সংকট হলো শিক্ষক-সংকট। কোথাও উপযুক্ত শিক্ষক খুঁজে পাওয়া যায় না। আমার নিজের অবস্থা এই যে, এত বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ে বসে আছি, আমাদের শাস্ত্রজ্ঞ দু'তিনজন শিক্ষকের প্রয়োজন, কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না। আরো শুনুন, দারুল উলূম দেওবন্দ এখন শায়খুল হাদীছ খুঁজে পাচ্ছে না। সবাই জানে যে, দারুল উলূম দেওবন্দে শায়খুল হাদীছ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব হয় নি। মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ ছাহেব সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী মজলিসের সদস্য। কিন্তু তিনি আশ্বস্ত নন, আমিও আশ্বস্ত নই। কেউ আশ্বস্ত নয়। অর্থাৎ শায়খুল হাদীছ নিয়োগের ক্ষেত্রে দারুল উলূম দেওবন্দের যে ঐতিহ্য ও মানদণ্ড ছিলো সে দিক থেকে বিষয়টি এখনো প্রশ্নসাপেক্ষই রয়ে গেছে।

সুতরাং আমি আবেদন করবো যে, আপনারা এদিকে দৃষ্টি দান করুন এবং যোগ্যতা ও পূর্ণতা লাভের সাধনায় আত্মনিয়োগ করুন। একথা ভাববার আদৌ প্রয়োজন নেই যে, দেওবন্দ ও নদওয়ায় সুযোগ না পেয়ে আপনারা দূরাঞ্চলে পড়ে আছেন। নাদওয়া বলুন, দেওবন্দ বুলন, কোন প্রতিষ্ঠানেরই কোন বিশেষত্ব নেই। এখানে থোকেও আপনি মেহনত ও সাধানা করতে পারেন এবং যোগ্যতা ও পূর্ণতা অর্জন করতে পারেন। তখন স্বয়ং দেওবন্দ ও নাদওয়া আপনার প্রার্থী হবে। আমি লিখে দিতে পারি যে, আপনি যদি কোন বিষয়ে কামাল ও পূর্ণতা অর্জন করতে পারেন তাহলে নাদওয়া ও দেওবন্দ সবখানেই আপনার জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে। আপনাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হবে।

দ্বীনী যোগ্যতা অর্জন করুন।

এটা তো হলো প্রথম কথা, দ্বিতীয় কথা এই যে, ইলমী যোগ্যতার পাশাপাশি নিজেদের মাঝে দ্বীনী যোগ্যতাও সৃষ্টি করুন। উলামায়ে রাব্বানীর কিছু গুণ এবং তাঁদের নূরানী জীবন ও চরিত্রের কিছু ঝলক আপনাদের মাঝেও থাকতে হবে, যা আমাদের নিকট অতীতের আকাবিরীনের মাঝেও ছিলো। হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আলী মূঙ্গেরী (রহ) এবং তাঁর সমকালীন ও সহচর আলিমগণের মাঝে ছিলো। কিছুটা নির্মুখাপেক্ষিতা ও তাওয়াক্কুল এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক ও আখেরাতমুখিতা আপনাদের অবশ্যই থাকতে হবে এবং ইবাদতের প্রতি সহজাত প্রেম থাকতে হবে। এক কথায় ইবাদতে ও তাকওয়ায় আপনাদের স্তর যেন হয় সাধারণ মানুষের উপরে।

তাহলে দু'টি কথা হলো, প্রথমত ফনের কামাল ও শাস্ত্রীয় যোগ্যতা, দ্বিতীয়ত আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক। সেই সম্পর্ক যা ছিলো সর্বযুগের উলামায়ে রাব্বানীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যাদের দেখে মানুষ আল্লাহমুখী হতো, আল্লাহর স্মরণে উদ্বুদ্ধ হতো। যাঁদের সান্নিধ্যে আখেরাতের ইয়াদ তাজা হতো। দিলে ব্যথা ও দরদ এবং তাপ ও উত্তাপ সৃষ্টি হতো। আল্লাহ-প্রেমের জোশ ও জাযবা পয়দা হতো। এই আধ্যাত্মিকতা ও রাব্বানিয়াত কিছু না কিছু অবশ্যই হাছিল করতে হবে।

বহির্গত দু'টি করণীয়

এ তো গেলো অন্তর্গত দিক থেকে আপনাদের করণীয় দু'টি কাজ। এখন আমি আপনাদেরকে বহির্গত দিক থেকে করণীয় দু'টি কাজের কথা বলবো। এ কথা আমি এ জন্য বলছি না যে, এখানে আমীরে শরীয়ত উপস্থিত আছেন। বরং যা কিছু বলছি আমানতদারির সাথে বলছি। কেননা হাদীছ অনুযায়ী- 'যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় সে আমানত রক্ষার দায়বদ্ধ।'

আপনারা যেহেতু আমাকে বরণ করেছেন এবং আমার প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছেন সেহেতু আমাকে পূর্ণ আমানতদারির সাথেই বলতে হবে এবং সেজন্যই আমি বলছি, আপনাদের একটি করণীয় এই যে, অন্তত বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে আপনারা শরীয়া বিধানের ইমারাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সর্বশক্তি নিয়োগ করুন। সমগ্র প্রদেশে এর জাল বিস্তার করুন। কোন গ্রাম ও কসবা যেন এর আওতা বহির্ভূত না থাকে। আপনাদের জন্য এটা এত বড় নেয়ামত যে, বিহারবাসীদের প্রতি আমার কোন ঈর্ষা হলে শুধু একারণেই হবে। এখানে

ঈর্ষণীয় অনেক কিছু আছে, অস্বীকার করি না। কিন্তু বড় ঈর্ষার বিষয় এই যে, এই প্রদেশবাসীকে আল্লাহ শরীয়তের নেযাম প্রতিষ্ঠার নেয়ামত দান করেছেন, কিন্তু আফসোস, মানুষ এর কদর করছে না, উল্টো এই নেযামতকে দুর্বল ও অকার্যকর করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

আমি আজ রেলগাড়ীতে বলছিলাম, আমার বুঝে আসে না যে, আমাদের বড় বড় ব্যক্তিকে কেয়ামতের দিন যখন জিজ্ঞাসা করা হবে যে, কেন তোমাদের জীবনে শরীয়তের নেযাম ছিলো না। শরীয়তের নেযাম ছাড়া কীভাবে জীবন কাটিয়েছো? তখন আমাদের কী জবাব হবে? এ সম্পর্কে হাদীছ শরীফে এত কঠিন সতর্কবাণী এসেছে যে, অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। তাই আমি ছাফছাফ বলতে চাই- হযরত আমীরে শরীয়তের অনুপস্থিতিতেও আমি একথা বলতাম যে, এখান থেকে ফারাগাতের পর আপনাদের প্রথম ফরয কর্তব্য হবে নেযামে শরীয়তকে বিস্তৃত ও সুসংহত করা। প্রদেশের সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীকে শরীয়া ব্যবস্থার সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত করুন যেন তাদের গোটা জীবন শরীয়তের অনুগতরূপে পরিচালিত হয়।

আমি তো মনে করি যে, যাকাত ব্যবস্থাকেও এর অধীনে আনার চেষ্টা করা হোক। যেমন, প্রকাশিত সম্পদ তথা স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত সংগ্রহ করে শরীয়তসম্মত ক্ষেত্রে বন্টনের ব্যবস্থা করা হোক। এমনকি সম্ভব হলে অপ্রকাশিত সম্পদ তথা গবাদিপশুকেও এর আওতায় আনা যায়। কেননা হযরত উছমান (রাঃ) এর পূর্বে সে ব্যবস্থাও কার্যকর ছিলো।

যাই হোক এখান থেকে ফারাগাতের পর কর্মের ময়দানে এটাই হবে আপনাদের প্রথম করণীয়। এ কাজের উপর অন্য কিছুকে আমি অগ্রাধিকার দিতে রাজী নই। যদি তা করতে পারেন তাহলে শুধু এই নয় যে, আপনারা এ মাদরাসার সঙ্গে বিশ্বস্ততা রক্ষা করলেন এবং এর ঋণ পরিশোধ করলেন, বরং এর দ্বারা আপনারা সকল দ্বীনী মাদরাসার শিক্ষার্থীদের মাঝেও অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার অধিকারী হবেন।

দ্বিতীয় করণীয় হলো প্রত্যেক অঞ্চলে দ্বীনী মক্তব কায়েম করা। মাফ করবেন, বর্তমান সময়ে আমি এতটা জরুরী মনে করি না যে, এলাকায় এলাকায় দাওরা মাদরাসা খুলতে হবে এবং সবখানে বোখারী শরীফ খতম করতেই হবে। তার চেয়ে সর্বত্র দ্বীনী মক্তব কায়েম করা অনেক বেশী জরুরী, যেখানে দ্বীনের বুনিয়াদি ইলম এবং হালাল-হারামের জ্ঞান দান করা হবে, সর্বোপরি ঈমান ও কুফুর এবং তাওহীদ ও শিরকের পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন

করে তোলা হবে।

আমরা আজ মাদরাসার চারদেয়ালের মাঝে নিরাপদে বসে আছি, অথচ গোটা হিন্দুস্তান খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। সবকিছুকে জাতীয়করণ করা হচ্ছে। আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির পালা এসে গেছে, আগামীকাল হয়ত মাদারেসের পালা আসবে। সুতরাং ঢল মাথার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার আগেই তৎপর হোন, সমগ্র হিন্দুস্তানে দ্বীনী মক্তবের জাল বিছিয়ে দিন। এবং মসজিদকে মুসলিম-জীবনের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করুন। অশুভ বিপ্লবের আগ্রাসী থাবা সবার শেষে যেখানে পৌঁছবে সেটা হলো মসজিদ। সুতরাং এমন নিরাপদ ও পবিত্র স্থানকেই নিজেদের কর্মকেন্দ্ররূপে গ্রহণ করুন যেখানে বিপ্লবের ঢেউ সবার শেষে পৌঁছবে। কিংবা যেখান পর্যন্ত বিপ্লবের প্রভাব পৌঁছতে পৌঁছতে কেয়ামতই এসে যাবে। হতে পারে যে, ঐ পর্যন্ত বিপ্লবের ধাক্কা পৌঁছার সুযোগই হবে না। সুতরাং আপনারা মসজিদকে মুসলমানদের যিন্দেগির কেন্দ্র রূপে গড়ে তুলুন এবং বিপুল সংখ্যায় দ্বীনী মক্তব কায়েম করুন। এমন অর্থহীন চিন্তা যেন আপনাদের বিভ্রান্ত না করে যে, মাদরাসায় এতকিছু পড়লাম, আর এখন বাচ্চাদের আলিফ বা পড়াই কিংবা দেহাতীদের মাঝে থেকে ইলম বরবাদ করছি। এটা সম্পূর্ণ ভুল চিন্তা। কেননা আসল উদ্দেশ্য তো আল্লাহর রিযা ও সন্তুষ্টি অর্জন এবং ইসলামের হেফাযত ও সংরক্ষণ।

মেটকথা, আপনাদের জিহাদের ক্ষেত্র হলো দু'টি। অর্থাৎ তালিবে ইলম হিসাবে যোগ্যতা ও পূর্ণতা অর্জন করুন এবং ফারাগাতের পর শরীয়তি নেযাম ও দ্বীনী মক্তব কায়েম করুন।

এ দু'টি কাজ যদি করতে পারেন তাহলে আপনারাই হবেন و أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তখন দুনিয়ার কোন বে-রহম ও নির্দয় হাত আপনাদের চিহ্ন মুছে ফেলতে পারবে না। যামানার কোন ইনকেলাব ও বিপ্লব মর্যাদার আসন থেকে আপনাদের টলাতে পারবে না। কেননা নিজেদের কর্ম ও কীর্তি দ্বারা আপনারা আপনাদের উপকারিতা ও উপযোগিতা প্রমাণ করেছেন। আর যারা দ্বীনের মাধ্যমে, দ্বীনের পথে নিজেদের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা প্রমাণ করবে আল্লাহ তাআলার অটল বিধানে তাদের জন্য সম্মানজনক জীবনের পূর্ণ নিশ্চয়তা রয়েছে। এ জন্যই তো বদর যুদ্ধের নাযুকতম মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন–

اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد

হে আল্লাহ, এই জামাত যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তো পৃথিবীতে

আপনার ইবাদত হবে না।

সুতরাং আপনারাও যোগ্যতা ও উপযোগিতা দ্বারা অন্তত হিন্দুস্তানের ক্ষেত্রে প্রমাণ করে দিন যে, আপনারা না থাকলে এখানে আল্লাহর দ্বীন থাকবে না। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনারা এমন সুরক্ষা ও সুনিশ্চয়তা লাভ করবেন যে, কেউ আপনাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।

ভাই ও বন্ধুগণ! আমার এ দু'টি কথা মনে রাখুন। হয়ত আমার কথায় জোশ ও জাযবা এবং তাপ ও উত্তাপ নেই। হয়ত কোন চমকপ্রদ জ্ঞানতত্ত্ব নেই এবং বাগ্মিতা ও বাককুশলতা নেই। কিন্তু এগুলোই আপনাদের কাজের কথা। যদি আপনারা হৃদয় দিয়ে তা গ্রহণ করেন এবং সাধানা দিয়ে নিজেদের জীবনে তা জীবন্ত করেন তাহলে ইনশাআল্লাহ্ আজ থেকে দশবছর পর বুঝতে পারবেন যে, নিজেদের অস্তিত্বের চারপাশে কত বড় রক্ষাপ্রাচীর আপনারা তৈরী করে ফেলেছেন। শুধু নিজেদের জন্য নয়, বরং হিন্দুস্তানের সমস্ত মাদারেসের জন্য এবং সকল দ্বীনী দাওয়াত ও মেহনতের জন্য। যদি একাজ না হয় তাহলে আল্লাহ্ না করুন মাদরাসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। কিন্তু যদি আপনারা আল্লাহ্ মদদ ও সাহায্য লাভের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেন এবং হিন্দুস্তানের মাটিতে বেঁচে থাকার যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেন তাহলে যামানার কোন ইনকিলাব এবং সময়ের কোন ঝড়ঝাপটা আপনাদের অস্তিত্ব মুছে ফেলতে পারবে না।

দয়া প্রার্থী কোন জাতি বেঁচে থাকতে পারে না।

ভাই ও বন্ধুগণ! যদি আপনারা যোগ্যতা ও উপযোগিতার প্রমাণ পেশ না করতে পারেন তাহলে শুনে রাখুন, শুধু ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে এবং শুধু দয়া ও করুণা প্রর্থনা করে না কোন জাতি ও সম্প্রদায় অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে, না কোন আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠান টিকে থাকতে পারে। আপনারা যদি কোন বাণী ও পায়গাম শুনতে চান তাহলে আপনাদের সামনে এটাই আমার আখেরী পায়গাম। আপনারা যদি কোন পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা নিতে চান তাহলে আপনাদের জন্য এটাই আমার একমাত্র পরামর্শ। কিংবা আপনারা যদি কোন আবেদন ও দরখাস্ত গ্রহণ করতে চান তাহলে আপনাদের খেদমতে এটাই আমার আখেরী দরখাস্ত, এটাই আমার শেষ আবেদন। এছাড়া আমার আর কিছু বলার নেই।

দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা আপনাদের সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করুন। আপনাদের ভবিষ্যতকে সমুজ্জ্বল করুন। আপনারা বড়ই সৌভাগ্যবান যে,

হিন্দুস্তানের এক বিরাট ব্যক্তিত্বের ছায়া লাভ করেছেন। এক বিরাট কেন্দ্রের সাথে আপনাদের সম্পর্ক। যে কেন্দ্র ইলম ও জ্ঞান সাধনারও পৃষ্ঠপোষক, আবার নেযামে শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জিহাদেরও পরিচালক। দু'আ করি, আপনারা যেন এ মহান ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে ও তারবিয়াতে প্রতিপালিত হতে পারেন এবং পূর্ণ উন্নতি লাভ করতে পারেন। আপনাদের সুপ্ত প্রতিভার যেন পূর্ণ স্ফুরণ ঘটে। নিজেদের ইলম দ্বারা, আমল দ্বারা, আখলাক দ্বারা এবং রূহানিয়াত দ্বারা আপনারা যেন কাওম ও মিল্লাতের উপকার করতে পারেন। আমীন।

মাদরাসার প্রকৃত পরিচয়

২২শে শাওয়াল, ১৩৯৬ হিজরী মোতাবেক ১৭ই অক্টোবর ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে জামেয়াতুল হিদায়াত, জয়পুর-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদবী (রহঃ) এই বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। দ্বীনী মাদরাসার পরিচয় কী? দ্বীনী মাদরাসার শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্য কী? এবং আজকের সমাজে দ্বীনী মাদরাসার প্রয়োজনীয়তা কী? এসকল প্রশ্নের জবাব তিনি তুলে ধরেছেন।

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نتوكل عليه ، أما بعد:

فقد قال الله تعالى : و هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا و ينشر رحمته و هو الولي الحميد

জনাব সদরে মজলিস, উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম এবং সম্মানিত সুধীবৃন্দ! আমার প্রতি আপনাদের এ সম্মাননার জন্য আমি যেমন কৃতজ্ঞ, তেমনি লজ্জিত। এত বড় মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য আমার মত অধমকে আপনারা নির্বাচন করেছেন। কেন করেছেন তা আপনারাই জানেন। কিন্তু আমি কীভাবে বোঝাবো যে, আপনাদের স্বাগত ভাষণের সুউচ্চ প্রশংসা আমাকে কেমন লজ্জা দিয়েছে? 'আয়ায' তো নিজের পরিচয় জানে, তাই প্রশংসায় লজ্জিত হওয়াই স্বাভাবিক। মানুষ যদি নিজের হাকীকতই না জানে তাহলে সে কিছুই জানে না। আলহামদু লিল্লাহ্ আমি আমার হাকীকত জানি।

একজন তালিবে ইলম এবং একটি ইলমী পরিবারের সন্তান হিসাবে তো অবশ্যই আমি এই মাদরাসার ভিত্তি স্থাপনের খেদমত আঞ্জাম দেয়ার হকদার। এ বিষয়ে বিনয় প্রকাশের প্রয়োজন নেই। এই রাজস্থানের এক 'প্রতিভাপ্রসূ' ভূখণ্ডের সঙ্গেও আমার সুপ্রাচীন সম্পর্ক রয়েছে, যা অবশ্যই আমার জন্য হকদারির সুফারিশ করবে। তবু বাস্তব সত্য এই যে, আপনাদের প্রদত্ত মর্যাদা ও সম্মাননা এত বড় এক জুব্বা যা আমার খাটো দেহে বেমানান, বরং চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেহের খাটোত্ব দেখিয়ে দেয় এবং লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে শরীফ ও মহৎ মানুষ আপন মহত্ত্বগুণে ছোটকেও বড় করে দেখে থাকেন। এর বেশী আর কিছু আমি বলতে চাই না, কারণ হয়ত এটাকেও কৃত্রিম বিনয় মনে করা হবে।

আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি তা দেখতেই পাচ্ছেন, আমি ক্বারী ছাহেবের তেলাওয়াত থেকে গ্রহণ করেছি। আমার চিন্তায় এখন বলার মত কোন বিষয়বস্তু ছিলো না। ক্বারী ছাহেবের তেলাওয়াত আমার চিন্তাকে আলোকিত করেছে। কোরআনুল কারীম এভাবেই মানুষকে পথ দেখায় এবং সমস্যার সামাধান দেয়। অনেক সময় চিন্তায় আসে না যে, কী বলবো বা কী

করবো। কী বলা বা করা উচিত? তখন কোরআন খুলে তেলাওয়াত শুরু করুন, দেখবেন গায়ব থেকে পথ প্রদর্শন শুরু হয়ে গেছে এবং অদৃশ্য থেকে ইংগিত এসে গেছে যে, এই করো বা এই বলো। আজ এখানেও আমার সাথে একই মু'আমালা হলো। ক্বারী ছাহেবের তিলাওয়াত থেকেই আমি আমার বিষয়বস্তু পেয়ে গিয়েছি। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন–

هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا و ينشر رحمته، و هو الولي الحميد

তিনিই আল্লাহ যিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন – আয়াতে غيث শব্দটি এসেছে। আসলে বৃষ্টি শব্দটি 'গায়ছ'- এর পূর্ণ সমার্থক নয়। গায়ছ মানে এমন কিছু যা ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে সাহায্য রূপে আসে এবং মুশকিল আসান করে, যা ঠিক বিপদের সময় উদ্ধারকারীরূপে উপস্থিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলছেন– 'মুমূর্ষু রোগীর শুকনো গলায় কয়েক ফোঁটা আবেহায়াত ও সঞ্জীবনী সুধা ঢেলে দিলে যেমন সে প্রাণ ফিরে পায় তেমনি দগ্ধ ও বিশুষ্ক ভূমিতে আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টিরূপে আবেহায়াত বর্ষণ করেন। এভাবে মানুষ যখন হতাশার শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ায় এবং ব্যাকুল ও তৃষ্ণার্ত চোখে আসমানের দিকে তাকায় যে, কখন আল্লাহ বৃষ্টি দিয়ে দগ্ধ ফসলকে সজীব করবেন! ঠিক তখন আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা মানুষকে সাহায্য করেন এবং তার জীবনে সজীবতা দান করেন। মানুষের উপর তিনি করুণার ছায়া বিস্তার করেন এবং রহমতের সুশীতল হাওয়া চালু করেন। আর তিনি হলেন – الولي الحميد।

এখানে আল্লাহ তা'আলার যে দু'টি গুণবাচক নাম নির্বাচন করা হয়েছে তা খুবই অর্থবহ। আল্লাহ তা 'আলার তো সব নামই উত্তম– و له الأسماء الحسنى

এবং তাঁর সব গুণই সর্বসুন্দর ও সর্বোচ্চ– و له المثل الأعلى

তবে এখানে উপরোক্ত নাম দু'টি এ জন্য নির্বাচন করা হয়েছে যে, আলোচ্যবিষয়ের সঙ্গে এবং মানবতার প্রতি করুণা এবং মানবজাতির প্রতি হিতৈষণা প্রকাশের ক্ষেত্রে এ গুণদু'টির বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।

মানবজাতি কার? শুধু আল্লাহর। আল্লাহই মানবজাতির খালিক ও মালিক। কেউ কি নিজের ক্ষেত ও ফসলের শুকিয়ে যাওয়া দেখতে পারে! জ্বলে পুড়ে ছারখার হওয়া বরদাশত করতে পারে! পারে না। আল্লাহ যেহেতু মানবজাতির ولي বা অভিভাবক সেহেতু তিনি কীভাবে মানবজাতির মুমূর্ষুদশা এবং শুকিয়ে যাওয়া দেখতে পারেন! তদুপরি আল্লাহ হলেন حميد বা চিরপ্রশংসার উপযুক্ত। যার শানই হলো হামদ ও প্রশংসা তাঁর সম্পর্কে তো এটা কল্পনাই করা যায় না যে, নিজের সৃষ্টি আশরাফুল মাখলুকাতকে বিপদের মুহূর্তে এবং সাহায্যের চরম

প্রয়োজনের মুহূর্তে এভাবে নিঃসঙ্গ ছেড়ে দেবেন। তিনি তো চিরপ্রশংসিত মহান অভিভাবক।

রোগ ও আরোগ্যের চিরন্তন সম্পর্ক

বন্ধুগণ! পিপাসা ও পিপাসা নিবারণের মাঝে, প্রয়োজন ও প্রয়োজন পূরণের মাঝে এবং রোগ ও রোগের আরোগ্যের মাঝে এমন এক অটুট বন্ধন রয়েছে যা কখনো ছিন্ন হতে পারে না। এটা প্রকৃতির চিরন্তন সম্পর্ক। যতদিন পিপাসা আছে ততদিন তা নিবারণের উপকরণও আছে। যতদিন প্রয়োজন আছে ততদিন তা পূরণের উপায়ও আছে এবং যতদিন রোগ-ব্যধি আছে, ততদিন চিকিৎসা ও আরোগ্যের উপাদানও আছে।

একই ভাবে মরুভূমি ও ইলমের মাঝে, মরুভূমি ও হিদায়াতের মাঝেও রয়েছে সূক্ষ্ম ও গুপ্ত এবং শাশ্বত ও চিরন্তন এক সম্পর্ক, যার সাক্ষ্য স্বয়ং আলকোরআনেও পাওয়া যায়। মানবতার ইতিহাস এবং মানবজাতির সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতাও যার সত্যতা প্রমাণ করে।

আপনারা দেড় হাজার বছর আগের ঐ সময়ের কথা স্মরণ করুন যখন সারা পৃথিবী হয়ে পড়েছিলো নিস্ফলা, যখন মানবতার সমগ্র ফসল-ভূমি হয়ে পড়েছিলো বিশুষ্ক এবং নবীগণের শত সহস্র বছরের মেহনত ও কোরবানি দ্বারা তৈরী সবুজ সজীব বাগান উত্তপ্ত লু হাওয়ার ঝাপটায় ঝলসে যেতে বসেছিলো, মানবতার ফসল-ভূমি যখন শুকিয়ে সারখার হতে চলেছিলো এবং মানবতা প্রায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিলো এবং যাদের দেখার তারা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলো। (আর সে জন্য বিশেষ কোন অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন ছিলো না, সাধারণ চক্ষু-দৃষ্টিই যথেষ্ট ছিলো।) পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলো যে, সময়ের ঘড়ি যেন শেষ মুহূর্তগুলো অতিক্রম করছে। মুমূর্ষু মানবতা এখনই হয়ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে।

এই ছিলো যখন অবস্থা তখন পৃথিবীতে সুখী-সচ্ছল বহু দেশ ছিলো, ফলে-ফুলে ও সবুজে ছাওয়া বহু শহর ছিলো। এমনও দেশ ছিলো যা হাজার বছর ধরে কৃষ্টি ও সভ্যতার কেন্দ্ররূপে পরিচিত ছিলো। যেখানে ভূমি থেকে যেন জ্ঞানের ঝরণাধারা উৎসারিত এবং আকাশ থেকে যেন জ্ঞানের বারিধারা বর্ষিত হতো, কিন্তু মানবতাকে তার মুমূর্ষু দশা থেকে উদ্ধার করার কোন যোগ্যতা পৃথিবীর এ সব জাতির ছিলো না, বরং তারা ছিলো মানবতার প্রতি বৈরী ও বিদ্রোহী। উপশম তো দূরের কথা, তাদের দ্বারা বরং মানবতার ব্যাধি ও ব্যথা দিন দিন বেড়েই চলেছিলো।

আপনি যদি সে যুগের ইতিহাস পড়েন তাহলে অবশ্যই জানতে পারবেন যে, তখন মানবতা যার বিরুদ্ধে আর্তনাদ ও ফরিয়াদ করছিলো, মানবতা যার নামে নালিশ ও বিচার দায়ের করছিলো সে আর কিছু নয়, বিভিন্ন জাতির এই ভ্রষ্ট সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং এই ভ্রান্ত জ্ঞান ও বুদ্ধি। কেননা তখন তা নির্মাণের পরিবর্তে বিনাশের এবং সৃষ্টির পরিবর্তে ধ্বংসের পথে চলেছিলো। তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ 'ইউনান' ছিলো, শিল্প-সাহিত্যে গর্বিত ইরান ছিলো এবং প্রাচীনতম সভ্যতার লীলাভূমি এই হিন্দুস্তানও ছিলো। খৃস্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে তো ভারতভূমি জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিলো।

মুমূর্ষু মানবতার সকরুণ দৃষ্টি এই সব সুসভ্য জাতির প্রতিই নিবদ্ধ ছিলো যে, হয়ত তাদের পক্ষ হতে মানবতার উদ্ধারের কোন প্রচেষ্টা শুরু হবে, হয়ত সেদিক থেকে নতুন করে বসন্তের সঞ্জীবনী সমীরণ প্রবাহিত হবে। মানবতার সতৃষ্ণ দৃষ্টি ছিলো ইউনানের দিকে, কিন্তু ইউনানের দর্শন ও যুক্তিবিদ্যায় ছিলো না মানবতার ব্যথা ও যন্ত্রণার উপশম। মানবতার সকাতর দৃষ্টি ছিলো হিন্দুস্তানের দিকে, কিন্তু হিন্দুস্তানের অংক ও গণিত শাস্ত্রে ছিলো না মানবতার দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা। মানবতার আশা ও প্রত্যাশা ছিলো সৌন্দর্যের সাধক পারস্যের প্রতি। পারস্য মানবতাকে শিল্প দিলো, সাহিত্য দিলো এবং কাব্য-অলংকার দিলো, কিন্তু তাতে ছিলো না মানবতার মুক্তির কোন বার্তা।

বসন্তের বার্তা এলো মরুভূমি থেকে

মানবতার সেই চরম দুর্দশা ও চূড়ান্ত হতাশার সময় আল্লাহর ফায়সালা হলো এবং আরবের মরুভূমি থেকে আল্লাহর রহমতের বসন্ত-বায়ু প্রবাহিত হলো, আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় জোশ সৃষ্টি হলো এবং জাবালে হেরার চূড়া থেকে সেই নূর উৎসারিত হলো যা বিশ্বমানবতাকে দিতে পারে নতুন জীবন ও নতুন প্রাণ।

মুমূর্ষু মানবতার সঞ্জীবনী সুধার জন্য আল্লাহ মরুভূমিকে শুধু এ জন্য নির্বাচন করেন নি যে মরু আরবেরই বেশী প্রয়োজন ছিলো ঐ সঞ্জীবনী সুধার। বরং আল্লাহ তাঁর কুদরতের এই তামাশা ও কারিশমা দেখাতে চাচ্ছিলেন যে, এক ফোঁটা পানির জন্য তৃষ্ণার্ত যে মরুভূমি, আল্লাহর ইচ্ছা হলে সেই মরুভূমিই পারে সমগ্র মানব জাতির হৃদয় ও আত্মার তৃষ্ণা নিবারণ করতে। তদুপরি মানবতার মুক্তির বার্তা বহনের জন্য আল্লাহ সেখানকার কোন জ্ঞানগর্বী ও দার্শনিককে নির্বাচন করেননি। আল্লাহ মরুভূমিকে যেমন নির্বাচন করেছেন,

তেমনি মরুভূমির নবীকেও নির্বাচন করেছেন। অবশ্যই নিগূঢ় কোন রহস্য নিহিত ছিলো তাতে। মরুভূমি এবং মরুভূমির উম্মী নবীর মাঝে সূক্ষ্ম একটি যোগসূত্র এবং অন্তরঙ্গ একটি সম্পর্ক অবশ্যই ছিলো। মরুভূমি হলো আরবের এবং নবী হলেন উম্মী – নিরক্ষর! সুতরাং বুদ্ধি ও যুক্তির সীমানায় এমন কিছুই ছিলো না যাকে আশ্রয় করে কোন একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারে দুনিয়ার বুদ্ধিবাদী ও জ্ঞানগর্বী পণ্ডিৎ সমাজ, কিংবা খুঁজে বের করতে পারে কার্যকারণের সূক্ষ্ম কোন সম্বন্ধ যার যৌক্তিকতা গ্রহণ করে নেবে মানুষের আকল-বুদ্ধি এবং জ্ঞান-দর্শন।

এ কথা বলার কোনই উপায় ছিলো না যে, কোন জ্ঞানসাধক ও দার্শনিক মানবজাতিকে নতুন জ্ঞান দান করেছেন এবং সবুজ-শ্যামল কোন দেশ দুনিয়াকে বাহার ও বসন্তের এবং ফুল ও গোলশানের পায়গাম দিয়েছে। কেননা মানবতার জন্য বসন্তের পায়গাম এসেছে ঊষর মরুভূমি থেকে! এবং ইলমের ঝরণাধারা উৎসারিত হয়েছে উম্মী নবীর বক্ষ হতে! এবং তা শুধুই ইলম ছিলো না, ছিলো ইলমের ও আলিমের সৃজনশালা। সেই সঙ্গে ছিলো ইলমের তালিম। অর্থাৎ সেই ইলমের মাঝে নিহিত ছিলো – শুধু কতিপয় ব্যক্তিকে নয়, বরং – গোটা জাতিকে মুআল্লিমরূপে গড়ে তোলার অপার শক্তি। সেই ইলম একটি জাতিকে সমগ্র মানবজাতির শিক্ষক ও মুআল্লিমরূপে গড়ে তুলেছিলো।

আরবের ঊষর মরুভূমিতে উম্মী নবীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা দেখিয়ে দিলেন যে, আমার কুদরত ও সালতানাত আসবাবের মুখাপেক্ষী নয়। দুনিয়ার সমস্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং মানবের সকল ধারণা ও কল্পনার বিপরীতে আমার কুদরত কাজ করতে পারে, আমার সালতানাত কায়েম হতে পারে। তারপর মানবতা ও সভ্যতা কী দেখতে পেলো! আল্লামা ইকবালের চেয়ে সুন্দর ভাষায় তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়–

ازدم سیراب آں امی لقب لاله رست از ریگ صحرائے عرب

'সেই উম্মী নবীর পাক যবান থেকে উৎসারিত হলো আবেহায়াতের এমন অমিয় ধারা যা আরবের মরুভূমিতে সৃষ্টি করলো এক পুষ্পোদ্যান এবং তাতে সুরভিত হলো সারা বিশ্ব।'

সবুজ-সজীব হলো মানবতার ফসলভূমি

বন্ধুগণ! আল্লাহ তা'আলা আপন কুদরতের এই কারিশমা সব সময় দেখিয়ে এসেছেন। ইলমের প্রসার ও বিস্তারের এবং ইলমের সঞ্জীবনী সুধায় পরিতৃপ্তি

লাভের এ ধারা ঊষর মরু থেকে যখন শুরু হলো তারপর থেকেই চলছে কুদরতের এ কারিশমা। এখন আর মরু ও মরুদ্যানের এবং সাহারা ও গুলশানের পার্থক্য নেই। উম্মী নবীর এ মু'জিযা প্রকাশ পেয়ে এসেছে বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন পরিবেশে। আমাদের ভারতভূমির কথাই ধরুন, বরং আপনাদের রাজস্থানের মরুভূমির কথাই ধরুন। এ বিরান ভূমিতে মুসলমানদের আগমনের পর এখানেও তারা ইলমের ঝরণা-ধারা প্রবাহিত করেছেন। শুধু যে দিল্লী, লাহোর ও মুলতানকে, কিংবা শুধু যে লৌখনো-জৌনপুরকে তারা সীরাজের সমকক্ষরূপে গড়ে তুলেছেন তাই নয়, বরং নাগোর এবং নিকট অতীতে টোংক-এর মত সাধারণ জনপদকেও তারা ইলমের কেন্দ্ররূপে গড়ে তুলেছেন।

রাজস্থানের এই ঊষর ভূমিকে আপনারা যেন তুচ্ছ না ভাবেন। আমাদের ইতিহাস-অজ্ঞতারই প্রমাণ হবে যদি আমরা মনে করি যে, হিন্দুস্তানের ইলম-সাধনা ও ইলমি আন্দোলনের ইতিহাসে রাজস্থান ও রাজপুতানার কোন অবদান নেই। ইতিহাসের তো সাক্ষ্য এই যে, ইলমের ধারা প্রবাহের ক্ষেত্রে এ মরুভূমি সুদীর্ঘ কাল পালন করেছে অগ্রণী ভূমিকা। প্রথম যুগে নাগোর এবং শেষ যুগে টোংক-এর জনপদ ইলমের জগতে তার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে এবং এখানকার ওলামায়ে কেরাম মেধা ও প্রতিভা এবং ইলম সাধনা ও জ্ঞান গভীরতার এমন স্বাক্ষর রেখেছেন যা অস্বীকার করার উপায় নেই।

নাগোর সম্পর্কে তো আমার বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নেই। কেননা এই শহরেরই দুই কৃতি সন্তান ছিলেন বাদশাহ আকবরের দরবারের শোভা ও অলংকার, ইতিহাসে যারা আবুল ফজল ও ফায়যী নামে অমর হয়ে আছেন। সত্য বটে, তাদের চিন্তা ও চেতনা এবং নীতি ও নৈতিকতার সবকিছু আমরা সমর্থন করি না। আরো সত্য এই যে, তাদের ইতিহাসের উপর ইতিহাসেরই এমন ধূলি-আস্তরণ পড়ে আছে যে, প্রকৃত সত্য এখন আর জানার উপায় নেই। আমরা জানি না আলমে আখেরাতে তারা কী অবস্থা লাভ করেছেন। কিন্তু তাদের মেধা ও প্রতিভা, তাদের জ্ঞান সাগরতা ও বিদ্যাবৈচিত্র তো আমরা অস্বীকার করতে পারি না। ফায়যীর কাব্যসৌন্দর্য এবং আবুল ফযলের কলমজাদু ও ইতিহাস গ্রন্থনার অনন্য কৃতিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন না করে তো পারি না!

নিকট অতীতে টোংক-এর ক্ষুদ্র জনপদে– যার নাম রাজস্থানের বাইরে

হয়ত খুব কম মানুষই জানে– যখন ছোট্ট একটি ইসলামী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলো তখন তা এক বিরাট ইলমী মারকাযরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলো। এমন সকল যুগস্রষ্টা আলিম ও জ্ঞানসাধক সেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যাদের ইলমী ফায়য ও ফায়যান লাভ করার জন্য বিশাল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ ছুটে আসতো। আল্লামা হায়দার আলী টোংকী এবং তাঁর পরে মাওলানা হাকীম বারাকাত-এর জ্ঞানের সুখ্যাতি ও ইলমী ফায়য তো সারা হিন্দুস্তানে এবং হিন্দুস্তানের সীমানা ছাড়িয়ে মুসলিম জাহানের দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলো। আরো অনেকে ছিলেন, যাদের জীবনবৃত্তান্ত জানতে চাইলে শুধু উর্দুভাষায় নয়, বরং আরবীভাষার বড় বড় আকর গ্রন্থেও তাদের খ্যাতি ও সুখ্যাতির বিবরণ আপনারা পাবেন।

শেষ যুগের বিরল ইলমী ব্যক্তিত্ব মাওলানা মাহমুদ হাসান খান টোংকী-এর কথা আমি এখানে বলতে চাই, যার শুধু নামটুকু উচ্চারণ করাও আমাদের জন্য গর্ব ও গৌরবের বিষয়। এ মজলিসে আমার পরিচয় প্রসঙ্গে আরব জাহানের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। সেখানকার বিভিন্ন একাডেমি, ইউনিভার্সিটি ও ইলমী মজলিসে অতি উচ্চস্তরের জ্ঞানী, গুণী ও বুদ্ধিজীবীদের সামনে বক্তব্য রাখার সুযোগ আমার হয়েছে। সেখানে যখনই আমি মাওলানা মাহমুদ হাসান খান টোংকী-এর ইলমী মাকাম এবং কীর্তি ও কর্মের কথা আলোচনা করেছি তখন তাদের মাঝে আমি অপরিসীম বিস্ময় ও কৌতুহল লক্ষ্য করেছি। তারা সকলে মুগ্ধ বিস্ময়ে বলে উঠেছেন, সত্যি কি এমন অনন্য সাধারণ প্রতিভা সেখানে জন্মলাভ করেছে!

আমি তাদের বলেছি, হাঁ, সেখানে এমন লেখক-প্রতিভা জন্মলাভ করেছে যিনি তার রচিত সুবিশাল জীবনী-গ্রন্থের মাধ্যমে নিজেকে যেমন অমর করেছেন তেমনি হিন্দুস্তানের অসংখ্য আলিম ওলামা এবং লেখক ও জ্ঞানসাধককেও অমরত্ব দান করেছেন এবং তাদের কলম ও কলম-কীর্তিকে মুসলিম জাহানের সামনে তুলে ধরেছেন। معجم المصنفين (গ্রন্থকারদের পরিচয়কোষ) নামে তাঁর রচিত গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা আমার জানা মতে বিশ হাজার। কে বিশ্বাস করবে যে, এটা ছিলো একা একজন মানুষের কীর্তি? আমি প্রায়ই বলে থাকি যে, ইউরোপের বড় বড় গবেষণা সংস্থা বিপুল উদ্যোগ আয়োজনের মাধ্যমে যে কাজ সম্পাদন করে আমাদের মুসলিম জাহানে এক সময় একক উদ্যোগে ও নিজস্ব চেষ্টা- সাধনায় তার চেয়ে বড় কাজ হতো। মাহমুদ হাসান নামের একজনমাত্র মানুষ ইউরোপের পূর্ণাঙ্গ একটি একাডেমির কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। 'মুজামুল মুছান্নিফীন' কিতাবের মাধ্যমে তিনি শুধু হিন্দুস্তানের নয়, বরং গোটা ইসলামী

জাহানের লেখক-গ্রন্থকারদের জীবন ও কর্ম সংরক্ষণ করে গেছেন; সময়ের আয়তনে যা প্রথম হিজরী শতক থেকে চৌদ্দশতক পর্যন্ত এবং ভৌগলিক আয়তনে যা হিজায থেকে ইন্দোনেশিয়া, বাদাখশাঁ, খাতান ও তাশকন্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। দুঃখের বিষয়, এ সুবিশাল গ্রন্থের কয়েকটি মাত্র খণ্ড এ পর্যন্ত প্রকাশিত হতে পেরেছে। তারপরও এ গ্রন্থের কোন নযীর নেই। এখানে আমি সমগ্র রাজস্থানের কীর্তি ও কর্মের কথা বলছি না, বরং যে জয়পুরের মাটিতে আজ আমরা জামেয়াতুল হিদায়াতের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করছি তার থেকে কয়েক মাইল দূরের এক অখ্যাত শহরের একজনমাত্র ব্যক্তির কর্ম ও কীর্তির কথা বলছি।

যাই হোক আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, ইলম ও জ্ঞান সাধনার এবং রচনা ও গবেষণার সঙ্গে সাহারা ও মরুভূমির রয়েছে সুগভীর এক সম্পর্ক। আরবের উম্মী নবীর মাধ্যমে সৃষ্ট এ সম্পর্ক আজো অটুট রয়েছে এবং চিরকাল অটুট থাকবে ইনশাআল্লাহ।

এমনকি আজো এ জঙ্গলভূমে যে মঙ্গলদৃশ্য আপনারা দেখছেন এবং আজকের মজলিসে ওলামায়ে কেরামের যত নূরানী ছূরত দেখছেন, প্রকৃতপক্ষে সেটাও সেই উম্মী নবীরই ফায়য ও বরকত ছাড়া আর কিছু নয়। পৃথিবীর শেষ দিন্ পর্যন্ত যেখানে যত জ্ঞানের দীপ্তি এবং ইলমের নূর প্রসারিত হবে তা হবে সেই উম্মী নবীরই দান ও অবদান এবং তাঁরই ফায়য ও ফায়যান। অন্ধকার আরবে আসমানী ইলমের যে প্রদীপ তিনি জ্বেলেছিলেন সে আলোই ছড়িয়ে আছে সারা জাহানে দেশ-কালের সীমানা ছাড়িয়ে। এ নববী প্রদীপ থেকেই প্রজ্বলিত হয়েছে সর্বকালের সর্বদেশের সকল জ্ঞান-প্রদীপ। তাই কবি বলেছেন–

یک چراغیست دریں نرم که از پر تو آں

ہر کجامی نگری انجمنے ساختہ اند

'মক্কী ও মাদানী মাহফিলের একটিমাত্র প্রদীপ, যেখানে পৌঁচেছে তার আলো, সেখানেই তৈরী হয়েছে আলোকিত মাহফিল।'

আজ এখানে জামেয়াতুল হেদায়াত নামে ইলম ও হিদায়াতের যে নতুন প্রদীপ প্রজ্বলিত হতে চলেছে, তা প্রকৃতপক্ষে সেই হাদীয়ে কামেল ও সিরাজে মুনীর-এর সমুজ্জ্বল আলোরই সামান্য প্রতিবিম্ব।

মাদরাসার কেন প্রয়োজন?

বন্ধুগণ! আমি জানতে চাই, কোন্ চিন্তা-ভিত্তির উপর আজ এখানে জামিয়াতুল হিদায়াত (মাদরাসা) প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে? কী এর প্রয়োজন?

উম্মতের কোন্ অভাব ও শূন্যতা এ প্রতিষ্ঠান পূর্ণ করবে? জাতি ও সমাজের জন্য সে কী বার্তা ও পায়গাম বহন করবে? যে কোন প্রতিষ্ঠনের অস্তিত্বের বৈধতার জন্য এ জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক জবাব অবশ্যই থাকতে হবে।

এ প্রসঙ্গে প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে, মাদরাসা কাকে বলে? কী তার পরিচয়? কী তার প্রয়োজন? কী তার গুণ ও বৈশিষ্ট্য? এবং কোথায় তার প্রকৃত মূল্য? আপনাদের এ শহরে এবং সারা ভারত জুড়ে এত এত নামী-দামী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থাকার পরও একটি জামিয়াতুল হিদায়াতের এবং একটি আরবী ও দ্বীনী মাদরাসার কী প্রয়োজন?

এ সম্পর্কে মাওলানা আব্দুল হাই ছাহেব অত্যন্ত উপযোগী ও মনোজ্ঞ ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন এবং আরবী ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। এটা এখন সবাই স্বীকার করছেন। কিন্তু আজ থেকে প্রায় শতবছর পূর্বে হিন্দুস্তানের বুকে নাদওয়াতুল ওলামা যখন এ আওয়ায তুলেছিলো যে, আরবী ভাষা এক জীবন্ত ভাষা, সুতরাং জীবন্ত ভাষারূপেই তার শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ হওয়া উচিত এবং আরবীভাষার সঙ্গে মাতৃভাষার অন্তরঙ্গতা অর্জন করা উচিত। যখন এ আওয়ায বুলন্দ করা হয়েছিলো তখন মনে হয়েছিলো, নির্জন মরুভূমির এ নিঃসঙ্গ আওয়ায শোনার ও বোঝার কেউ নেই। কিন্তু সময়ের বিবর্তন, বিশ্ব-রাজনীতির পরিবর্তন এবং দুনিয়ার উন্নতি ও অগ্রগতি আজ শত বছর পূর্বের সেই আওয়াজের সত্যতা ও বাস্তবতা প্রমাণ করে দিয়েছে। সে যুগের অন্তর্দর্শী আলিমগণ বিশেষত ইসলামী উম্মাহর সঙ্গে ঐক্য ও একতার সেতুবন্ধন গড়ে তোলার জন্য আরবীভাষার যে প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা অনুভব করেছিলেন আজ সময় ও সমাজ তার বাস্তবতা স্বীকার করে নিয়েছে। ইলমী সাধনা ও দ্বীনী দাওয়াতের কথা বলুন, ইসলামী উম্মাহর ভ্রাতৃ-বন্ধন কিংবা জীবন সংগ্রামের কথা বলুন কোন ক্ষেত্রেই আরবী ভাষায় প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

মাদরাসার প্রয়োজনীয়তার স্বপক্ষে আরো অনেক কিছু বলা যায় এবং বলা হচ্ছে। আমিও তা অস্বীকার করি না, কিন্তু আমি জানতে চাই, মাদরাসার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী? মাদরাসার আসল বাণী ও পায়গাম কী? উম্মতের কোন্ ব্যথার উপশম এবং কোন্ রোগের আরোগ্য এই মাদরাসা?

আজ এখানে জামেয়তুল হিদায়াত নামে একটি দ্বীনী মাদরাসার যে নতুন চারা অঙ্কুরিত হতে যাচ্ছে আল্লাহ তাকে সবুজ সজীব মহাবৃক্ষে রূপান্তরিত করুন, যার শীতল ছায়ায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারে;

সর্বোপরি ইলমের রোশনি ও হেদায়াতের নূর লাভ করতে পারে। অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে আমি এই দু'আ করি। কিন্তু আমার প্রশ্ন এই যে, উম্মতের কোন্ অভাব ও কী শূন্যতা পূরণের জন্য জামিয়াতুল হিদায়াত আজ তার যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে?

এ সম্পর্কে আমার দৃষ্টিকোণ ঐ সকল শিক্ষিত বন্ধুদের থেকে অনেক ভিন্ন যারা মাদরাসার পরিচয় জানেন বলে দাবী করেন এবং মাদরাসার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা বলেন। আমার দৃষ্টিতে মাদরাসা শুধু পঠন-পাঠনের কিংবা বিশেষ শিক্ষিত কিছু মানুষ উৎপাদনের কেন্দ্র নয়। কোন মাদরাসার শুধু এইটুকু ভূমিকা ও পরিচয় মেনে নিতে এবং চিন্তার এত নিম্ন স্তরে নেমে আসতে আমি রাজী নই। দুনিয়ার অন্য সমস্ত স্কুল কলেজ ও ইউনিভার্সিটির মত মাদরাসাও নিছক লেখা-পড়ার হুনর শিক্ষা দানের কেন্দ্র নয়। এধরনের চিন্তাকে আমি মাদরাসার পরিচয়-সত্তার বিলুপ্তি সাধনের অপরাধ বলে মনে করি। অর্থাৎ আমি যদি মাদরাসার উকিল হতাম, কিংবা আমি নিজে যদি মাদরাসা হতাম তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আমি মোকদ্দমা দায়ের করতাম যারা মাদরাসাকে শুধু এতটুকু অধিকার ও পরিচয় দিতে চায় যে, শাস্ত্র ও বৃত্তি শিক্ষাদানের জন্য যেমন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং সেগুলোর বিভিন্ন মান ও স্তর রয়েছে তদ্রূপ মাদরাসাও বিভিন্ন ফন ও বিষয় শিক্ষা দানের; আরবী ভাষা, ফিকাহ, তাফসীর, হাদীছ ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা দানের একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্র।

না, বরং আমার চিন্তা ও বিশ্বাস এই যে, মাদরাসা হলো খেলাফতে ইলাহীয়ার মহান দায়িত্ব পালনকারী, মানবজাতিকে হেদায়াতের পায়গাম দানকারী এবং মানবতাকে মুক্তির পথ প্রদর্শনকারী নায়েবীনে রাসূল তৈরীর কেন্দ্র। মাদরাসা হলো আদর্শ মানব তৈরীর আদর্শ কারখানা।

দেশে বিভিন্ন শিল্প-কারখানা থাকে, অস্ত্র-কারখানা থাকে। আমরা অবশ্যই এগুলোর মূল্যায়ন করি। দেশের উন্নয়নে ও নিরাপত্তা বিধানে এগুলোর প্রয়োজন ও গুরুত্ব স্বীকার করি। কিন্তু প্রত্যেক জিনিসের স্তর তারতম্য রয়েছে। মাদরাসা শুধু বিভিন্ন বিষয়ে এবং বিভিন্ন বিদ্যায় – হোক তা দ্বীনী বিদ্যা– কিছু দক্ষ লোক উৎপাদনের কারখানা নয়। মাদরাসা তো হলো এমন আদর্শ মানব তৈরীর কেন্দ্র যা আমি উপরে আলোচনা করে এসেছি। এটা অবশ্য ভিন্ন প্রসঙ্গ যে, মাদরাসাগুলো এখন সেই মহান দায়িত্ব পালন করছে কি না? এবং প্রতিটি মাদরাসা তা পালন করতে চায় কি না? আমাদের মৌলিক ও তাত্ত্বিক আলোচনার সঙ্গে উক্ত বিষয়ের কোন সম্পর্ক নেই।

মাদরাসার একজন খাদেম হিসাবে এবং বিভিন্ন মাদরাসার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের সূত্রে এ তিক্ত বাস্তবতা আমি স্বীকার করি যে, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে আমরা অনেক পিছনে পড়ে গেছি। অতীতের মাদরাসা যে মহান দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছে, বর্তমানের মাদরাসা তা পালন করতে পারছে না। কেন পারছে না? এ বড় তিক্ত প্রশ্ন এবং এর জবাব আরো তিক্ত। তবু এ প্রশ্ন এখনো সমান গুরুত্বপূর্ণ যে, মাদরাসার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী? আল্লাহর পক্ষ হতে মাদরাসার উপর অর্পিত মহান দায়িত্ব কী?

মাদরাসার পরিচয়-উৎস

সর্বপ্রথম মাদরাসার বুনিয়াদ কোথায় রাখা হয়েছিলো? দুনিয়ার সর্বপ্রথম মাদরাসার বুনিয়াদ কর্ডোভা ও গ্রানাডায় নয়, কায়রো ও বাগদাদে নয়, দিল্লী ও লৌখনোতে নয় এবং দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামা বা দারুল উলূম দেওবন্দে নয়, বরং সর্বপ্রথম মাদরাসার বুনিয়াদ রাখা হয়েছে মসজিদে নববীতে এবং তার নাম ছিলো ছুফফা। আমাকে মাফ করুন, আমি শুধু ঐ বিদ্যালয় এবং ঐ মাদরাসাকেই বিশুদ্ধ ও বৈধ বংশপরিচয়ের অধিকারী মনে করি যার শাজারা ও বংশলতিকা ছুফফায়ে নববীতে গিয়ে শেষ হয়েছে।

আমি শুধু ঐ মসজিদকেই বিশুদ্ধ বংশপরিচয়ের অধিকারী মনে করি যার শাজারা ও বংশপরিচয় কাবায়ে ইবরাহীমীতে এবং মসজিদে নববীতে গিয়ে শেষ হয়েছে। এর বিপরীত শব্দ আমার বলার প্রয়োজন নেই, কোরআন নিজেই তা বলে দিয়েছে। যে মসজিদ কাবায়ে ইবরাহীম ও মসজিদে নববীর সঙ্গে যুক্ত নয় তা হলো মসজিদে যিরার– দুষ্কৃতির মসজিদ। তদ্রূপ ঐ বিদ্যালয় বিদ্যালয় নয় এবং ঐ মাদরাসা মাদরাসা নয় যার বংশপরিচয় ছুফফায়ে নববী এবং মসজিদে নববীর সঙ্গে যুক্ত নয়, আবু যর ও সালমান ফারসী (রাঃ) এবং আবু হোরায়রা ও যায়দ বিন ছাবিতের সঙ্গে যুক্ত নয়, ছিদ্দীকে আকবর ও আলী মুরতাজা এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) এর সঙ্গে যুক্ত নয়।

ঐ মাদরাসা মাদরাসা নয়, বরং মানবতার জবাইখানা যার সম্পর্ক নবী ও তাঁর ছাহাবাগণের সঙ্গে নয়, যারা বিশ্বকে হেদায়াতের পথ দেখিয়েছেন, কোরআনের পায়গাম শুনিয়েছেন। যারা নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে অন্যের উপকার করার শিক্ষা দান করেছেন। যাদের জীবনাদর্শ ছিলো এই যে, তোমার ঘরে বাতি না জ্বলুক, অন্যের ঘরে যেন আলো থাকে; তুমি পেটে পাথর বাঁধো, যেন পরবর্তীদের মুখে আহার জোটে (কেননা পাথর বাঁধার ইতিহাস তো গাযওয়াতুল খান্দাকেই শেষ হয়ে গেছে।)

যারা এ পায়গাম দিয়ে গেছেন যে, মাদরাসার উদ্দেশ্য জীবিকার ক্ষেত্র সৃষ্টি করা নয় এবং এমন শিক্ষিত মানুষ তৈরী করা নয় যারা কলমের বা যবানের জাদুতে মানুষকে মোহমুগ্ধ করতে পারে। মাদরাসার তো দায়িত্ব হলো মানবতাকে কোরআনের বাণী শোনানো, মানুষের মাঝে কোরআনের আলো ছড়ানো এবং সকল প্রতিকূলতার মাঝেও বিভ্রান্ত মানব-কাফেলাকে মুক্তির পথ দেখানো।

দুনিয়াতে যখন সকল সত্য ও হাকীকতকে অস্বীকার করা হয়, শক্তি ও ক্ষমতার পূজাকে যখন একমাত্র সত্য মনে করা হয়, মাল ও দৌলতকে যখন একমাত্র হাকীকত মনে করা হয়, যখন জোর গলায় প্রচার করা হয় যে, পৃথিবীতে নীতি ও নৈতিকতার মৃত্যু ঘটেছে, ইজ্জত ও সম্ভ্রমের মৃত্যু ঘটেছে, শারাফাত ও ইনসানিয়াতের মৃত্যু ঘটেছে, সকল সত্যের মৃত্যু ঘটেছে, বেঁচে আছে একটিমাত্র সত্য, আর তা হলো যে কোন মূল্যে, যে কোন উপায়ে নিজের লাভ নিশ্চিত করা এবং আত্মস্বার্থ উদ্ধার করা। চারদিকে যখন শোর ওঠে যে, নীতি ও বিবেক বিসর্জন দিয়ে এবং শারাফত ও ইনসানিয়াতের সওদা করে যেভাবে পারো নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং উদিত সূর্যের পূজা করো তখন মাদরাসা উঠে দাঁড়ায় এবং দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে; না, শারাফাত ও ইনসানিয়াতের এখনো মৃত্যু হয় নি, নীতি ও নৈতিকতা এখনো বিলুপ্ত হয় নি। বিবেক ও আত্মমর্যাদা এখনো বেঁচে আছে। মাদরাসা তখন এ পায়গাম পৌঁছে দেয় যে, দুনিয়ার ক্ষতিতে রয়েছে আখেরাতের লাভ, ক্ষুধা ও অনাহারে রয়েছে এমন স্বাদ, শাহী দস্তরখানেও যা পাবে না তুমি এবং কখনো কখনো যিল্লতি ও লাঞ্ছনাতেও থাকে এমন ইজ্জত ও মর্যাদা, শাহী তখতে বসেও যার নাগাল পাবে না তুমি। মাদরাসা তখন জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করে যে, আল্লাহর শক্তিই বড় শক্তি এবং হকের আওয়াযই শ্রেষ্ঠ আওয়ায।

এ-ই হলো মাদরাসার পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য, এ-ই হলো মাদরাসার দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং এখানেই মাদরাসার মূল্য ও গুরুত্ব। এ দায়িত্ব ভুলে গিয়ে মাদরাসা যদি দুনিয়ার অন্যকিছুতে মগ্ন হয়ে পড়ে তাহলে আর যাই হোক তা মাদরাসা নামের যোগ্য নয়।

আমি মনে করি, জামেয়াতুল হিদায়াত-এর আসল ভিত্তি-প্রস্তর আজ এই সুমহান আদর্শ ও চেতনারই উপর রাখা হচ্ছে এবং তা এই গান্দা ইনসানের গোনাহগার হাতে নয়, বরং নবুয়ত ও ছাহাবিয়াতের গায়েবানা হাতে। এবং এ ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন আজকের নতুন কোন ঘটনা নয়, যুগে যুগে বারবার ঘটেছে এবং দুনিয়ার কোণে কোণে বহু শত জামেয়াতুল হিদায়াত বিদ্যমান রয়েছে।

দ্বীন ও শরীয়ত যতদিন যিন্দা আছে, ইনসানিয়াত ও মানবতার শ্বাস-প্রশ্বাস যতদিন অব্যাহত আছে ততদিন পৃথিবীর কোন ভূখণ্ড জামিয়াতুল হিদায়াত থেকে খালি থাকতে পারে না। আজকের নবপ্রতিষ্ঠিত এই জামিয়াতুল হিদায়াত প্রকৃতপক্ষে যুগে যুগে দেশে দেশে প্রতিষ্ঠিত জামিয়াতুল হিদায়াতেরই উত্তরসূরী। এটা নতুন কিছুর সূচনা ও উদ্বোধন নয়, বরং ছুফফা থেকে উৎসারিত ইলমের ঝরণাধারারই অব্যাহত প্রবাহ। দুনিয়ার ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্কর কোন চেঙ্গিজ, কোন কায়সার ও কিসরা এবং কোন তলোয়ার বা অস্ত্রশক্তিই এ ধারাপ্রবাহকে বন্ধ করতে পারে নি, কখনো পারবেও না। মাদরাসার মানুষ কখনো কোন মূল্যেই সওদাবাজির স্তরে নেমে আসতে পারে না।

দুনিয়ায় এখন সবকিছুরই কম বা বেশী মূল্য নির্ধারিত আছে। উপযুক্ত মুল্যে সবাই সবকিছু বিকিয়ে দিতে প্রস্তুত। আজকের দুনিয়া বিরাট এক নিলাম ঘর ছাড়া কিছু নয়। সবাই এখানে নিলামের ডাকে উঠতে তৈয়ার। সবাই তার বিবেক-বুদ্ধি, মেধা ও প্রতিভা এবং জ্ঞান ও যোগ্যতার মূল্য-তালিকা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত, শুধু উপযুক্ত মূল্যের অপেক্ষা। হয়ত কাউকে খরিদ করতে কিছুটা সময় লাগে, তবে তা এ জন্য নয় যে, সে বিক্রি হতে প্রস্তুত নয়, বরং এ জন্য যে, এখনো তার চাহিদা মত মূল্য উঠেনি।

কিন্তু মাদরাসা এর ব্যতিক্রম। মাদরাসা সবকিছু মেনে নিতে রাজী নয়। এ দুনিয়া নিলামঘর, এখানে কোন না কোন মূল্যে সবারই নিলাম হতে পারে, মাদরাসা তা মানতে রাজী নয়। আমরা যারা মাদরাসার বাসিন্দা, নিজেদের মূল্য হিসাবে আমরা তো দুনিয়ার সমস্ত সম্পদকেও তুচ্ছ মনে করি। আমাদেরকে তো আল্লাহ ছাড়া কেউ কোন মূল্যে খরিদ করতে পারে না।

মানবতার অধঃপতন যখন শুরু হলো, নীতি ও নৈতিকতায় যখন ধ্বস নামলো, মানুষ যখন ভাবতে লাগলো যে, হক ও বাতিল সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়, আদর্শের যা কিছু বুলি কপচানো হয় তা শুধু মজলিসের শোভা বর্ধনের জন্য, বাস্তবে তার কোন অস্তিত্ব নেই। হক ও বাতিল এবং হালাল ও হারাম বলে কিছু নেই। ন্যায় ও অন্যায় এবং নীতি ও নৈতিকতা বলে কিছু নেই। আসল হলো অর্থ ও বিত্ত, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি এবং পদ ও প্রতিষ্ঠা।

সময় ও সামাজ যখনই এমন অবক্ষয় ও অধঃপতনের স্বীকার হয়েছে তখনই মাদরাসা সময়ের স্রোতধারা এবং সমাজের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আওয়াজ তুলেছে, মাদরাসা তখন এমন মানুষ পয়দা করেছে, যারা পাহাড়ের উচ্চতাকেও ছাড়িয়ে গেছে, পর্বতের অবিচলতাকেও হার মানিয়েছে।

সমকালীন দুনিয়ার সামনে মাদরাসা এই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে যে, তোমাদের নিলামের বাজারে বিক্রি হওয়ার মত মানুষ এরা নয়। বিশ্বাস না হলে চেষ্টা করে দেখো, খরিদ করতে পারো কি না। যদি পারো তাহলে স্বীকার করে নেবো যে, ঈমান ও আকীদা বলে কিছু নেই। আখলাক ও আদর্শ এবং নীতি ও নৈতিকতা বলে কিছু নেই। দুনিয়া থেকে এসব বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

দুনিয়ার মানুষ চেষ্টা করে দেখেছে, পারেনি। পৃথিবীর নিলামের বাজার তাদের পায়ের উপর ভেঙ্গে পড়েছে, কিন্তু তারা ছিলেন অবিচল-স্থির। মাদরাসা সব সময় এমন মানুষ পয়দা করে এসেছে।

কমযোর চারদেয়ালের এই মাদরাসাগুলো যুগে যুগে কেমন মানুষ পয়দা করেছে, তার কয়েকটি নমুনা আমি তুলে ধরছি। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে মাদরাসার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ও ইতিবৃত্ত তুলে ধরা তো সম্ভব নয়। যদি আপনারা জানতে চান তা হলে একেকটি মাদরাসার উপর কয়েক খণ্ডের বিশাল বিশাল ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছে তা পড়ুন। মরক্কোর রাবাতে আমাকে কয়েক খণ্ডের একটি বিরাট কিতাব হাদিয়া দেয়া হয়েছিলো, শুধু জামিয়াতুল কারাবিন-এর ইতিহাসের উপর। তা পড়ে দেখুন। তদ্রূপ মিসরের জামেয়াতুল আযহার কিংবা হিন্দুস্তানের দারুল উলুম দেওবন্দ, নদওয়াতুল উলামা ও ফিরিঙ্গি মহলের ইতিহাস পড়ে দেখুন। আমি শুধু কয়েকটি নমুনা তুলে ধরবো–

এই হলো মাদরাসার শান

ইমাম মালিক (রহঃ) এর যামানা। সারা মুসলিম জাহানে তখন শুধু ইলমেরই চর্চা ও সাধনা ছিলো। ইলমের জগতে ইমাম মালিকের এমনই অখণ্ড মর্যাদা ছিলো যে, 'হাদ্দাছানা মালিকুন'– ইমাম মালিক আমাকে হাদীছ শুনিয়েছেন– বলতে পারা সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয় ছিলো। মুসলিম জাহানের কোন অঞ্চলে কেউ যদি বলতো, 'হাদ্দাছানা মালিকুন' তাহলে সবার কান খাড়া হয়ে যেতো এবং সবাই মাথা তুলে তাকিয়ে দেখতো যে, কে এই ভাগ্যবান ব্যক্তি, ইমাম মালিকের শিষ্যত্বের মর্যাদা যিনি লাভ করছেন!

যাই হোক, উমাইয়া ও আব্বাসী খেলাফতের সন্ধিক্ষণে মদীনার মসজিদে নববীতে ইমাম মালিকের হালকায়ে দরস কায়েম ছিলো। বাগদাদের খলীফা হারুন রশীদের পক্ষ থেকে যথাযোগ্য আদবের সঙ্গে পয়গাম গেলো যে, যদি মেহেরবানি করে দরবারে তাশরীফ আনেন এবং শাহযাদা আমীন ও মামুনকে হাদীছের কিছু সবক পড়িয়ে দেন তাহলে কৃতজ্ঞ হবো।

হযরত আব্বাস (রাঃ) এর বংশধর খলীফা হারুনকে ইমাম মালিক (রহঃ) বললেন–

'এই ইলম তো আপনাদের ঘর থেকেই এসেছে এবং ইলমকে ইযযত করার শিক্ষা তো মানুষ আপনাদের ঘর থেকেই পেয়েছে। সুতরাং আপনারই হাতে তার অবমাননা শোভনীয় হতে পারে না। হে আমীরুল মুমিনীন! ইলম কারো কাছে আসে না, ইলমের কাছেই আসতে হয়।'

সে যুগের খলীফা বুঝে গেলেন এবং মেনে নিলেন। শাহযাদা আমীন ও মামুনও ইমাম মালিকের দরসে হাযির হয়ে হাদীসের সবক নিলেন। কথিত আছে যে, ইমাম মালিক এ শর্তও আরোপ করেছিলেন যে, শাহযাদাদেরকে মজলিসে সবার পিছনে বসতে হবে। সে যুগের খলীফা এ শর্তও মেনে নিয়েছিলেন।

এ-ই হলো মাদরাসার শান, এ-ই হলো মাদরাসাওয়ালাদের মান! দ্বিতীয় নমুনা দেখুন–

হযরত আতা কিংবা হযরত তাউস (রহঃ) এর ঘটনা। ভরা দরবারে খলীফা আলমানছূরকে তিনি উপদেশ দিলেন। মজলিসে উপস্থিত একজনের বর্ণনা এই যে, আমরা এই ভয়ে কাপড় গুটিয়ে নিচ্ছিলাম যে, এখনই হয়ত জল্লাদের খড়গ নেমে আসবে। সুতরাং এ অন্যায় খুনের দাগ যেন আমাদের কাপড়ে না লাগে।

এর মধ্যে মনছূর হযরতকে বললেন, অনুগ্রহ করে আপনার পাশে রক্ষিত দোয়াত-কলম একটু উঠিয়ে দিন। হযরত বললেন, আমি পারবো না।

মনছূর অবাক হয়ে বললেন, কেন? হযরত বললেন– কারণ, আপনার লেখার বিষয়ে আমি আশ্বস্ত নই। যদি আল্লাহকে নারায করার মত কিছু লেখেন তাতে আমি শরীক হতে চাই না।

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা আবার কাপড় গুটাতে লাগলাম যে, এখন তো অবশ্যই জল্লাদের উপর হুকুম হবে। কিন্তু হকের হায়বত ও ভয়-মহিমা এমনই ছিলো যে, পরাক্রমশালী খলীফার মুখ থেকে কোন হুকুম জারি হলো না।

এবার আপনাদের শোনাবো তৃতীয় ও শেষ ঘটনা, যাতে বুঝতে পারেন যে, কেমন হয়ে থাকে ইলম ও আহলে ইলমের শান!

মাত্র একশ বছর আগের ঘটনা। শায়খ সাঈদ আল হালাবী দামেশকের মসজিদে নিজের হালকায় দরস দিচ্ছেন। এবং ওযরবশত পা ছড়িয়ে রেখেছেন। উস্তাদ সাধারণত কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে এবং মসজিদের দরজার দিকে মুখ

করে বসেন। তিনিও তাই বসেছেন।

সে সময় মিসরের খেদেবী সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী পাশার পুত্র ইবরাহীম পাশা ছিলো দামেস্কের গভর্নর। মিসরের খেদেবী সালাতানাতের বিলুপ্তি ঘটেছে রাজা ফারুকের আমলে, জামাল আব্দুননাসেরের হাতে। মাত্র পনের বিশ বছর আগের কথা।

ইবরাহীম পাশার জল্লাদ স্বভাবের কথা ছিলো সবারই জানা। সেদিন সে ভাবলো যে, পথেই যখন পড়ে, মসজিদে গিয়ে হযরতের যিয়ারত করি এবং দরস দেখে আসি।

দামেস্কের প্রবল পরাক্রমশালী গভর্নর ইবরাহীম পাশা মসজিদে প্রবেশ করলো। সবার ধারণা ছিলো যে, কষ্ট হলেও অন্তত কিছু সময়ের জন্য হযরত পা গুটিয়ে নেবেন। কিন্তু তিনি না নড়লেন, না দরস বন্ধ করলেন। পা ছড়িয়ে যেমন দরস দিচ্ছিলেন, দিতেই থাকলেন। আর গভর্নর ইবরাহীম পাশা তাঁর পায়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলো।

শায়খের ছাত্রদের ভাষ্য এই যে, আমরা ভয়ে কাঁপছিলাম যে, হয়ত চোখের সামনেই আমাদের প্রিয় শায়খ শহীদ হয়ে যাবেন, কিংবা চরম লাঞ্ছনার সম্মুখীন হবেন। হয়ত রক্ষীদলকে হুকুম দেয়া হবে যে, হাত বেঁধে নিয়ে চলো। কিন্তু কিছুই হলো না। গভর্নর শায়খের পায়ের ধারে দাঁড়িয়ে থাকলো আর তিনি দরস দিতে থাকলেন। পাও গুটালেন না, ফিরেও তাকালেন না।

আল্লাহ্ জানেন, মানুষের উপর এই ছেঁড়া ফাটা কাপড়ওয়ালা বান্দাদের কী আছর পড়ে! দামেস্কের গভর্নর নিরবে এসেছিলো, নিরবেই চলে গেলো। এমনকি সে শায়খের এমনই ভক্ত হলো যে, প্রাসাদে ফিরে গিয়ে খাদেমের হাতে আশরাফী ভর্তি থলে পাঠিয়ে দিলো যে, শায়খকে আমার সালাম বলো, আর বলো যে, এই তুচ্ছ হাদিয়া যেন তিনি কবুল করেন।

শায়খের জবাব ছিলো স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত বাক্য, যা ইলমের ইতিহাসে যুগ যুগ ধরে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তিনি বললেন, তোমার বাদশাহকে সালাম বলবে, আর বলবে–

إن الذي يمد رجله لا يمد يده

'যে পা ছড়ায় সে হাত ছড়ায় না।'

দুনিয়াতে দুই কাজ একসাথে হয় না। হয় তুমি দুনিয়ার দিকে পা ছড়াবে কিংবা হাত বাড়াবে। হয় লোভ দমন করবে, নয়ত যিল্লতি ভোগ করবে।

ইতিহাসের পাতায় শায়খ সা'ঈদ আলহালাবীর মুখের শব্দ এভাবেই সংরক্ষণ করা হয়েছে– إن الذي يمد رجله لا يمد يده

জামিয়াতুল হিদায়াতের পায়গাম

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আজ আমাদের এমন মাদরাসারই প্রয়োজন এবং আমি আশা করি যে, যে মাদরাসার নাম জামিয়াতুল হিদায়াত রাখা হয়েছে সে মাদরাসার তালেবান ও ফাযেলান উক্ত মাদারাসার শিক্ষাজীবন থেকে এ পায়গাম ও হিদায়াতই লাভ করবেন। তারা অবশ্যই পূর্ববর্তী ওলামায়ে রাব্বানী ও হাক্কানীদের গায়রত ও আত্মমর্যাদাবোধের শিক্ষা লাভ করবেন, যাদের গৌরবোজ্জ্বল হাজারো ঘটনায় ইতিহাসের পাতা ভরপুর।

আজ আমাদের এমন মানুষের প্রয়োজন যারা দুনিয়ার সামনে পা ছড়াতে পারুন বা না পারুন, হাত ছড়ানোর নীচতায় কখনো নেমে আসবেন না।

আমি বলি না যে, আপনাকে পা ছড়াতেই হবে। কেননা আজকের যামানা এতটা বরদাশত করার যোগ্য নয় এবং আজকের তাহজীব ও সংস্কৃতিও তা সমর্থন করে না। তদুপরি ইসলামও বিনা প্রয়োজনে এমন করার শিক্ষা দেয় না। কিন্তু এ কথা আমি অবশ্যই বলবো যে, কারো সামনে হাত লম্বা করার হীনতা যেন আমরা বরদাশত না করি। আলিমে হক কারো সামনে হাত পাতে না এবং কোন মূল্যেই আত্মমর্যাদা বিসর্জন দেয় না, বরং সর্বস্ব ত্যাগ করেও ইলমের আবরু এবং দ্বীনের ইযযত রক্ষা করে।

মাদরাসার কাছে আজ সময়ের দাবী হলো এমন মানুষ এবং এমন আলিমে দ্বীন তৈরী করা, যে কোন মূল্যে যারা ইনসান ও ইনসানিয়াতের ইযযত রক্ষা করবে। সময় ও সমাজের এবং মানুষ ও মানবতার আজ প্রয়োজন এমন ওলামায়ে হকের যাদের হাত শুধু আল্লাহর সামনেই দরাজ হবে, কোন মানুষের সামনে নয়।

যে মহান বুজুর্গ ও আধ্যাত্মিক পুরুষের সঙ্গে এই নব প্রতিষ্ঠিত জামিয়ার পরিচয় সম্পৃক্ত, তিনিও আমাদের এ শিক্ষাই দিয়ে গেছেন। মানুষের সামনে তাঁর হাত কখনো দরাজ হয় নি, হয়েছে শুধু আল্লাহর সামনে। সুতরাং তাঁর রূহ তখনই খুশী হবে যখন এখান থেকে এমন মর্দে মুমিন ও আলিমে হক বের হবে যারা আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে হাত দরাজ করবে না।

আজ আমরা শুধু এ দৃশ্যই দেখি যে, সবাই কোন না কোন ছুরতে দুনিয়ার সামনে হাত পেতে রেখেছে। কারো হাত যদি প্রসারিত না হয়ে থাকে তবে তা

এ জন্য যে, এখনো তার সুযোগ হয় নি, কিন্তু তা প্রসারিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল। এমন হাত কোথায় আছে যা দরাজ হতে রাজী নয়? এমন দিল কোথায় আছে যা দুনিয়ার প্রতি লালায়িত নয়?

বন্ধুগণ! দুনিয়া এখন মেধা ও প্রতিভার সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত নয়; যামানা এখন জ্ঞানী ও দার্শনিকের তালাশে পেরেশান নয়। কবির ভাষায়—

میرے دیکھے ہوئے ہیں مشرق و مغرب کے میخانے

'আমার দেখা আছে পূর্ব-পশ্চিমের পানশালা'

ইউরোপের সব দেশ আমি দেখেছি। প্রাচ্যের কোণে কোণে আমি গিয়েছি। আজ বড় বড় জ্ঞানী-গুণী, লেখক-সাহিত্যিক, কবি-দার্শনিক এবং বাগ্মী বক্তা ও চিন্তাবিদের অভাব নেই। অভাব শুধু আল্লাহর ঐ সকল বান্দার, ঐ সকল পবিত্র-আত্মার, মানুষের সামনে যাদের হাত দরাজ হতে রাজি নয়। যারা অনাহার বরণ করেন, কিন্তু যিল্লতি বরদাশত করেন না, যারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন, কিন্তু বিবেকের অপমৃত্যু সহ্য করেন না।

দুনিয়াতে হাজারো বিপ্লব আসবে এবং যাবে, ক্ষমতা ও সরকারের হাতবদল হবে, বিভিন্ন হাওয়া বয়ে যাবে, আবার থেমে যাবে, অনেক কিছু হবে, হতে পারে, কিন্তু আহলে ইলমের হাত কারো সামনে লম্বা হতে পারে না। কোন মূল্যেই তাঁদের বিবেক ও বিশ্বাসের সওদা হতে পারে না। তাদের নীতি ও নৈতিকতা কখনো নিলামের পণ্য হতে পারে না।

আপনারা বিশ্বাস করুন, এই আসমান-যমীন ততদিনই সঠিক অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে যতদিন কোন না কোন ছুরতে কোন না সংখ্যায় এধরনের মানুষের অস্তিত্ব থাকবে। সংখ্যায় তারা যত কমই হোক এবং তাদের খুঁজে বের করার জন্য দূরবীক্ষণ বা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হোক, তাদের অস্তিত্বই হলো আসমান-যমীনের স্থিতির যামানত। আল্লাহর শোকর, এখনো পৃথিবীতে এমন লোকের অস্তিত্ব রয়েছে। হয়ত দুর্লভ, কিন্তু বিলুপ্ত নয়। এখানে সেখানে একজন দু'জন হলেও তারা আছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তারা থাকবেন।

ভাই ও বন্ধুগণ! ব্যস, আমার কথা শুধু এই যে, আজ মাদরাসার কাজ হলো এমন হাক্কানী রাব্বানী ওলামার জামাত তৈয়ার করা যারা শুধু এই নয় যে, নিজেদের বিবেকের সওদা করবে না। এটা তো তাদের শান ও মর্যাদা থেকে অনেক দূরে। এটা তো তাদের সম্পর্কে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। তারা তো বরং ঐ লোকদেরকে শাসন করবে, সংযত করবে এবং হিদায়াত করবে যারা বিবেকের সওদাবাজিতে লিপ্ত রয়েছে।

তারা তো যামানার শোরগোলের মাঝেও জলদগম্ভীর স্বরে সবাইকে বলবে, মানুষের বুদ্ধি-বিবেক এত সস্তা নয় যে, নিলামের বাজারে তার বেচা-কেনা চলবে। একটি পদ, একটি চেয়ার, একটি সন্তুষ্টি কিংবা একটি মুচকি হাসি তাকে খরিদ করে নেবে।

বন্ধুগণ! আপনাদের এই রাজ্যগুলোতেই এবং এ সকল কেন্দ্রেই হয়ত এমন বহু ঘটনা শুনেছেন যে, আল্লাহর বান্দারা কঠিন থেকে কঠিন মুহূর্তেও নিজেদের ইযযত ও শারাফাতের উপর কোন দাগ ও ময়লা আসতে দেননি। বড় থেকে বড় ক্ষতি তারা হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছেন কিন্তু আত্মমর্যাদা ত্যাগ করে যিল্লতির স্তরে নেমে আসা বরদাশত করেন নি। আমি শুধু হিন্দুস্তানের কথা বলছি না। আমার দৃষ্টি সারা বিশ্বের প্রতি প্রসারিত। সারা দুনিয়াকে আমি আমার সামনে দেখতে পাচ্ছি। আর আপনাদের সামনে এখন যা বলছি তা আমি দুনিয়ার সবখানে বলে এসেছি। এমন নয় যে, আজই প্রথম বলছি। আমি আরবদের সামনেও বলেছি যে, দেখো; ইযযত ও গায়রত আমরা তোমাদের কাছ থেকে শিখেছি, ঈমান ও বিশ্বাসের শিক্ষা আমরা তোমাদের কাছ থেকে পেয়েছি, দৃঢ়তা ও মযবুতির সবক আমরা তোমাদের কাছ থেকে লাভ করেছি, সুতরাং আমাদের চোখের সামনে তোমরা আজ তা থেকে সরে যেতে পারো না। জামাল আব্দুন-নাছেরের জাতীয়তাবাদী তুফানের যুগে যখন আরবদের বুদ্ধি ও সংযম নিয়ন্ত্রণে ছিলো না, যখন ভাববার এবং বোঝবার মত অবস্থায় তারা ছিলো না তখনো আমি তাদের 'গারীবান' ধরে ধরে বলেছি যে, এসব কী হচ্ছে? আল্লাহর দ্বীন থেকে সরে ধ্বংসের কোন গড্ডালিকায় ভেসে চলেছো তোমরা?

আলিম যেন দিকনির্ণয় যন্ত্র

মাদরাসার দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো সুউচ্চ নীতি ও নৈতিকতা, সুদৃঢ় হিম্মত ও মনোবল এবং সুসংহত ঈমান ও বিশ্বাসের অধিকারী এমন আলিম পয়দা করা যারা বিবেক-বুদ্ধির এ সওদাবাজির যুগে এবং নীতি ও নৈতিকতার এ অবক্ষয়ের যুগে স্থির আলোর মিনার হয়ে অবস্থান করবে। আলোর মিনার কখনো তার স্থান থেকে বিচ্যুত হয় না, বরং স্বস্থানে অবিচল থেকে সঠিক দিক নির্দেশ করে। দিকনির্ণয় যন্ত্র যেমন, আপনি যেখানেই থাকুন আপনাকে কিবলার দিক বলে দেবে। হিন্দুস্তানেও বলে দেবে, অন্য দেশেও বলে দেবে। পাহাড়ের চূড়ায়ও বলে দেবে, সমুদ্রের মাঝেও বলে দেবে। আলিমে দ্বীন যে যুগে এবং যে দেশেই থাকুন, আলোর মিনার হয়ে থাকবেন এবং কম্পাসের কাঁটার মত সঠিক দিক নির্দেশ করে যাবেন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উপরে যে মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা বলা হলো তারই উপর আজ জামিয়াতুল হিদায়াত-এর ভিত্তি রাখা হচ্ছে। আর হাকীকত এই যে, প্রতিটি দ্বীনী মাদরাসার এটাই হলো বুনিয়াদ। এগুলোই মাদরাসার আসল পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য এবং এ কারণেই মাদরাসার এত মূল্য ও গুরুত্ব। ভবন ও সাজসজ্জা কোন মাদরাসার পরিচয় নয়। তদ্রূপ ভাঙ্গা ঘর-দুয়ার এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জীর্ণ পোশাকও কোন মাদরাসার জন্য লজ্জার বিষয় নয়। এক অন্তর্জ্ঞানী সত্যই বলেছেন–

মাদরাসার বাসিন্দা যারা তাদের লেবাস তো ফকীরানা, কিন্তু তাদের মেযাজ হলো শাহানা। এটাই ছিলো আমাদের পূর্বসূরী ওলামায়ে উম্মতের পরিচয় বৈশিষ্ট্য এবং আজ সময় ও সমাজের প্রয়োজন তাদেরই জীবন্ত নমুনার।

মাদরাসা দেখে না বাতাসের গতি

আল্লাহর শোকর এই যে, মসজিদুন্নবীর ছোফফা থেকে মাদরাসার যে ধারা চলে এসেছে তা কোন যুগে কোন দেশে বাতাসের গতি এবং সময়ের স্রোত দেখে চলার নীতি গ্রহণ করে নি। কত ঝড়ঝাপটা এসেছে, কত ইনকিলাব ও বিপ্লব আঘাত হেনেছে, কিন্তু মাদরাসা তার লক্ষ্য পথে অবিচল থেকেছে। সময়ের স্রোতের কাছে এবং বাতাসের গতিমুখের সামনে মাদরাসা কখনো আত্মসমর্পণ করেনি। যদি করতো তাহলে এখনো মাদরাসা ইলমের রোশনি ছড়াতে পারতো না, এখনো এই অন্ধকার যুগে মাদরাসা হিদায়াতের আলোর মিনার হয়ে থাকতো না। এই যে এখানে ওখানে টুটা-ফাটা কিছু মাদরাসা এখনো টিকে আছে যামানার ঝড়ঝাপটা মোকাবেলা করে তা একথাই প্রমাণ করে যে, মাদরাসা কখনো বাতাসের গতি দেখে পথ চলে না। মাদরাসা যদি তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর অবিচল থাকে তাহলে যামানার কোন ইনকিলাব মাদরাসার অস্তিত্ব মুছে ফেলতে পারে না।

ভাই ও বন্ধুগণ! এখানেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনারা আমাকে যে সম্মান দিয়েছেন এবং আমার মত একজন হাকীর তালিবে ইলমকে এমন পবিত্র ও বরকতপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য নির্বাচন করেছেন সে জন্যও আমি আপনাদের শোকর আদায় করি। আমার সম্পর্কে আপনারা যা কিছু বলেছেন, আল্লাহর কাছে দু'আ করি, আপনারাও দু'আ করুন, যেদিন সবার সব গোপন অবস্থা প্রকাশ করে দেয়া হবে সেদিন যেন আল্লাহ আমাকে লজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করেন। আমীন।

এই জামিয়াতুল হিদায়াতকে আল্লাহ চিরকাল আবাদ রাখুন এবং সত্যিকার অর্থে তাকে হিদায়াতের মারকায বানিয়ে দিন। আমীন।

তোমাদের বড় হতে হবে

২২ নভেম্বর ৬৫ খৃষ্টাব্দে নদওয়াতুল উলামার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছেলেদের পুরস্কার বিতরণী জলসায় হযরত মাওলানা যে নছীহত করেছিলেন এখানে সংক্ষেপে তা পেশ করা হচ্ছে।

হযরত মাওলানার উপদেশের সারসংক্ষেপ এই যে, শৈশবকাল থেকেই স্বপ্ন দেখতে হবে বড় হওয়ার এবং তা দুনিয়ার বড় হওয়া নয়, আখেরাতের বড় হওয়া।

আমার স্নেহের ছাত্ররা! তোমাদের দেখে আমার আজ বড় আনন্দ হচ্ছে, যেমন খান্দানের ছোট ছোট বাচ্চাদের দেখে খান্দানের বৃদ্ধ মুরুব্বীর আনন্দ হয়। তোমরা খুব মেহনত ও পরিশ্রম করেছো এবং এই প্রতিযোগিতায় নিজেদেরকে পুরস্কারের যোগ্য প্রমাণিত করেছো, তোমাদের উস্তাদগণ তোমাদেরকে পুরস্কারের যোগ্য মনে করেছেন এ জন্য আমি তোমাদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। তোমাদেরকে কিতাবপত্র এবং অন্যান্য যে পুরস্কার দেয়া হচ্ছে হয়ত বাজারে সেগুলোর অর্থমূল্য তেমন বেশী নয়, কিন্তু এদিক থেকে এগুলো খুবই মূল্যবান যে, তোমাদের মুরুব্বীগণ এগুলো তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন এবং তোমাদের উস্তাদদের উপস্থিতিতে এই বলে তোমাদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে যে, আমাদের বাচ্চারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে।

আমিও যখন তোমাদের মত ছোট ছিলাম তখন আমাদের মুরুব্বীদের কাছ থেকে বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছিলাম, কিন্তু শৈশবের উদাসীনতায় সেগুলো হারিয়ে গেছে। সে জন্য এখন আমার খুব আফসোস হয়। যদি বরকতের জিনিস হিসাবে সেগুলো এখন আমার কাছে থাকতো তাহলে খুব ভালো হতো। শৈশবের আনন্দের স্মৃতিগুলো এবং উস্তাদদের দু'আর চিহ্নগুলো এখন যদি আমার কাছে থাকতো তাহলে খুব খুশি লাগতো। কিন্তু শৈশবের অবহেলার কারণে সেগুলো হারিয়ে গেছে। এখন আমি তোমাদেরকে নছীহত করছি, বরং অছিয়ত করছি যে, তোমরা এই পুরস্কারগুলো খুব হেফাযত করে রাখবে, যেন হারিয়ে না যায়। যখন তোমরা আমার মত বুড়ো হবে তখন শৈশবের এই স্মৃতিগুলো দেখে তোমাদের মনে বড় আনন্দ হবে এবং তোমাদের মনে পড়বে যে, আমাদের উস্তাদগণ আমাদেরকে মুহব্বত করে এই পুরস্কার দিয়েছিলেন।

বিভিন্ন বিষয়ের উপর আজ আমি তোমাদের বক্তৃতা শুনলাম। তোমাদের সবার বক্তৃতা রেকর্ড করা হয়েছে। আমি খুব খুশী হয়েছি। তোমাদের বয়স ও যোগ্যতা হিসাবে খুব ভালো হয়েছে। এগুলো থেকে তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের শুভ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আমি আশা করি, একদিন তোমরা বড় বড় লেখক-সাহিত্যিক হবে এবং উচ্চস্তরের বক্তা হবে, আর এই যোগ্যতাগুলোকে তোমরা দ্বীনের খেদমতে ব্যবহার করবে। আমরা তো এই দুনিয়ায় থাকবো না,

আমাদের পরে তোমরা দ্বীনের এবং উম্মতের খেদমতের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। ইনশাআল্লাহ।

তবে একটি কথা বলতে ইচ্ছে করে। তোমাদের বক্তৃতাগুলো যদি আরো সহজ সরল ও সাবলীল হতো তাহলে ভালো হতো। সব সময় যেমন সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করো তেমন সহজ ভাষায় হলে ভালো হতো। কেননা ভালো বক্তৃতা সেটাই যার ভাষা সহজ থেকে সহজ এবং যার উচ্চারণভঙ্গি খুব স্বাভাবিক, যেমন সব সময় আমরা কথা বলে থাকি। অবশ্যই তোমাদের বক্তৃতাগুলো মোবারকবাদের যোগ্য এবং আমার মনে হচ্ছে যে, তোমাদের উস্তাদগণ যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন এবং তাদের পরিশ্রম অনেক দূর সফল হয়েছে।

এখন আমি তোমাদেরকে কয়েকটি জরুরী কথা বলতে চাই। যদি তোমরা সেগুলো মনে রাখো এবং পালন করতে চেষ্টা করো তাহলে তোমাদের লাভ হবে এবং তোমাদের ভবিষ্যত জীবন সুন্দর হবে।

প্রথম কথা এই যে, শৈশবের জীবন বড় পবিত্র জীবন। তোমাদের কোন গুনাহ নেই, তোমরা মাছুম। তাই শিশু বয়সে মানুষ যা স্বপ্ন দেখে এবং যা কামনা করে আল্লাহ তা'আলা কোন না কোন সময় সেগুলো পুরা করে দেন। সুতরাং এখন তোমরা ভবিষ্যত জীবন সম্পর্কে যা কিছু আকাঙ্ক্ষা করবে এবং আল্লাহর কাছে যা কিছু চাইবে খুব চিন্তা ভাবনা করে চাইবে।

এটা বড়দের বড় অভিজ্ঞতার কথা যে, শৈশবের স্বপ্ন ও কল্পনা ভবিষ্যতে বাস্তব হয়ে সামনে এসে যায়। শৈশবের কল্পনাকে আল্লাহ প্রায় বাস্তব করে দেন। সুতরাং এখন থেকে নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে তোমরা বড় বড় স্বপ্ন দেখো এবং আল্লাহর কাছে বড় কিছু চাও। এখন থেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করো যে, তোমরা ইসলামের সত্যিকার খাদেম হবে, ইসলামের মুখলিছ দা'ঈ হবে। দা'ঈ মানে যে দাওয়াত দেয়। তো দুনিয়ার মানুষকে তোমরা দ্বীনের দাওয়াত দেবে, সত্যের পথে, সুন্দরের পথে ডাকবে। তোমরা ইসলামের নাম উজ্জ্বল করবে। ইসলামের জন্য তোমরা জীবনের সবকিছু কোরবান করবে। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীনকে তোমরা বুলন্দ করবে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ যেমন বড় আলিম ছিলেন, দা'ঈ ছিলেন, দ্বীনের মুজাহিদ ছিলেন তোমরাও তাদের মত হবে।

বোকা ছেলেরা যেমন তুচ্ছ তুচ্ছ স্বপ্ন দেখে যে, ভবিষ্যতে আমি রেলগাড়ীর টিটি হবো এবং বিনা পয়সায় রেলে ভ্রমণ করবো, কিংবা থানার দারোগা হবো, আর সবাই আমাকে সালাম করবে। এধরনের সাধারণ সাধারণ স্বপ্ন তারা

দেখে। যদিও এগুলো খারাপ কিছু নয়, কিন্তু তোমাদের উচিত আরো বড় স্বপ্ন দেখা, আরো বড় হওয়ার প্রতিজ্ঞা করা। তবে এর অর্থ এই নয় যে, দারোগার পরিবর্তে এস পি হওয়ার স্বপ্ন দেখবে। বরং তোমরা উত্তম থেকে উত্তম নিয়ত করো এবং উত্তম থেকে উত্তম আকাঙ্ক্ষা করো। তোমরা এই আকাঙ্ক্ষা করো যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পেয়ারা নবী থেকে যে কাজ নিয়েছেন ছাহাবা কেরাম থেকে যে কাজ নিয়েছেন আমরা সারা জীবন সেই কাজ করবো। শৈশবের মাছুম অবস্থা আল্লাহর কাছে এতই প্রিয় যে, শিশুরা যা কিছু আকাঙ্ক্ষা করে, যা কিছু চিন্তা করে আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন। তোমরা এই প্রতিজ্ঞা করো যে, আমরা আল্লাহর প্রিয় হবো এবং আল্লাহর বান্দাদের বেশীর চেয়ে বেশী ফায়দা পৌঁছাবো।

দেখো, মানুষের মাঝে আল্লাহ এই যোগ্যতা রেখেছেন যে, সে সবকিছু হতে পারে। ইচ্ছা করলে সে ফিরেশতাও হতে পারে, বরং ফিরেশতার চেয়ে বড় হতে পারে। কেননা আল্লাহ মানুষের মাঝে এমন কিছু গুণ রেখেছেন যা ফিরেশতাদের মাঝে নেই। সুতরাং মানুষ যখন এতো বড় হতে পারে তাহলে কেন তোমরা ছোট ছোট এবং তুচ্ছ তুচ্ছ আকজ্ক্ষা করবে? তোমরা সবসময় এই আকাঙ্ক্ষা করো যে, আল্লাহ যেন তোমাদেরকে দ্বীনের বিরাট বিরাট খেদমত করার তাওফীক দান করেন এবং এ যুগের জন্য এই সমাজের জন্য যে কাজের প্রয়োজন আল্লাহ যেন তোমাদের থেকে সেই কাজ নেন। তোমাদের সম্পর্কে আমাদেরও এই আকজ্ক্ষা এবং স্বপ্ন। আল্লাহ যেন কবুল করেন, আমীন।

পরিশিষ্ট

হিন্দুস্তানে মুসলমানদের অস্তিত্ব দ্বীনী তা'লীমের উপর নির্ভরশীল

জামেয়া আরাবিয়া হাতোরা, বানদাহ-এর ছাত্রদের উদ্দেশ্যে মাওলানা সৈয়াদ আবুল হাসান আলী নাদাবী (রহঃ)-এর ভাষণ, যার সারসংক্ষেপ এই যে, আমাদের মহান পূর্ববর্তীগণ ইলম হাছিল করে মুসলমানদের দ্বীনী তালিম ও তারবিয়াতের খিদমতে লেগে যেতেন। দুনিয়ার ধন-দৌলত ও শান-শওকতের পরোয়া করতেন না। তাই এখনো হিন্দুস্তানে দ্বীন ও দ্বীনী তালিম টিকে আছে। আমাদেরকেও পূর্ববর্তীদের পথ অনুসরণ করতে হবে। তাহলেই হিন্দুস্তানের বুকে দ্বীন টিকে থাকবে। আর আমাদের দুনিয়ার জরুরত আল্লাহর মদদে গায়ব থেকে পুরা হবে।

نحمده ونصلي على رسولـه الكريم، أما بعد، فقد قال الله في القران الكريم :
فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ·

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম!

গতকালও একটি জলসা ছিলো এবং আজকের চেয়ে কয়েকগুণ বড় জলসা ছিলো। কিন্তু আপনাদের সঙ্গে, মাদরাসার তালিবানে ইলমের সঙ্গে কথা বলতে আমি যে আনন্দ পাই, যে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি এবং যে চিত্ত প্রসন্নতা অনুভব করি তা লক্ষ মানুষের জলসায়ও অনুভব করি না। কেননা আমিও আপনাদেরই মত মাদরাসার তালিবে ইলম। আমি মাদারেসের খেদমতকারী আলিম খান্দানেরই একজন নগণ্য মানুষ। মাদরাসার পরিবেশেই আমি চোখ খুলেছি, প্রতিপালিত হয়েছি এবং মাদরাসার পরিবেশেই আমার জীবন কেটেছে। মাদরাসাই আমার স্বপ্নের পৃথিবী। কোন সন্দেহ নেই যে, উভয় জলসাই ছিলো দ্বীনী জলসা। কিন্তু কালকের এবং আজকের জলসার মাঝে আমার কাছে এত পার্থক্য মনে হয় যেন কোন ব্যক্তি শহরের বিভিন্ন শ্রেণীর অসংখ্য মানুষের সমাবেশে বক্তব্য রাখলো, যাদের সঙ্গে তার দ্বীনী সম্পর্ক ছাড়া আর কোন পরিচয় নেই। তারপর সে ঘরের আপন লোকদের সাথে, খান্দানের রক্ত সম্পর্কের লোকদের সাথে এবং তার আদরের ছোট ছোট বাচ্চাদের সাথে কথা বললো।

আপনাদের সামনে কথা বলতে গিয়ে আমার এমনই মনে হচ্ছে যে, আমি আমার খান্দানের আপন লোকদের সঙ্গে এবং পরিবারের বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলছি। আপনারাও মনে করুন যে, আমি বাইরের অপরিচিত কোন মানুষ নই, বরং আপনাদেরই পরিবারের একজন। খুব বেশী সম্মান যদি আমাকে দিতে চান তাহলে মনে করুন যে, আমি আপনাদের শিক্ষকদের কাতারেরই একজন মানুষ।

যাক, আমি আপনাদের সামনে সূরা তাওবার একটি আয়াত তিলাওয়াত করেছি। মাশাআল্লাহ আপনারা সবাই তালিবানে ইলম। সুতরাং আয়াতের তরজমা করার প্রয়োজন নেই। তবু তরজমা করছি, কেননা হয়ত এখানে

প্রাথমিক শ্রেণীর ছোট ছোট তালিবে ইলমও আছে।

আয়াতের বিশদ তরজমা এই– 'যেহেতু এটা সম্ভব নয় এবং খুব সহজ নয় যে, সমস্ত মুসলমান বাড়ী-ঘর ছেড়ে, কাজ-কর্ম ফেলে ইলম শিক্ষার কাজে লেগে যাবে এবং পূর্ণ ইলম হাছিল করে আলিম হয়ে যাবে। অথচ ইলম হাছিল করা অতীব জরুরী। ইলম ছাড়া মুসলমানের যিন্দেগী চলতে পারে না। যিন্দেগীর কোন কাজ শরীয়তের পছন্দ মত হতে পারে না। তাহলে এমন কেন করা হয় না যে, মুসলমানদের প্রত্যেক জামাত থেকে, প্রত্যেক এলাকা থেকে এবং প্রত্যেক খান্দান থেকে কিছু লোক ইলম হাছিল করার জন্য বের হয়ে পড়বে এবং কোমর বেঁধে লেগে যাবে! এমন তো হতে পারে। তাতে বাধা কোথায়। .... فلو لا نفقر من كل فرقة منهم

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার কথা ভালোভাবেই জানেন। তিনি নিজেই মানুষের স্বভাবের মাঝে বিভিন্ন দুর্বলতা রেখেছেন। সুতরাং তিনি মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদার কথা জানেন এবং মানুষের অবস্থার কথা জানেন। ألا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি জানবেন না, অথচ তিনিই হলে সূক্ষ্মদর্শী এবং সর্ববিষয়ে অবগত?

সুতরাং মানুষকে তিনি এমন কোন আদেশ করেন না এবং মানুষের উপর এমন কোন দায়িত্ব আরোপ করেন না, যা মানুষের সাধ্যের বাইরে, যা মানুষের জন্য কষ্টসাধ্য। আল্লাহ এ আদেশ দেননি যে, দোকানদার দোকান ছেড়ে, কৃষক ক্ষেতখামার ছেড়ে, সৈনিক দেশরক্ষার দায়িত্ব ছেড়ে এবং দুর্বল ও মাযূর লোকেরা তাদের দুর্বলতা ও মাযূরি সত্ত্বেও ইলম শিক্ষার জন্য বের হয়ে পড়ুক এবং মাদরাসার খাতায় নাম লিখিয়ে দিক এবং নিজের এলাকায় মাদরাসা না থাকলে যেখানে মাদরাসা আছে, ইলম শিক্ষার ব্যবস্থা আছে সে এলাকার উদ্দেশ্যে হিজরত করুক এবং সেখানে গিয়ে ইলম চর্চায় আত্মনিয়োগ করুক। আল্লাহ মুসলমানদেরকে এধরনের আদেশের বাধ্য বা মুকাল্লাফ করেন নি। কেননা এটা পালন করা সম্ভব নয়। মানুষ কোন ওযর পেশ করার এবং অপারগতা প্রকাশ করার আগে আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন, সব কিছু ছেড়ে সবার বের হয়ে পড়া তো সম্ভব নয়, কিন্তু এমন কেন হয় না যে, প্রত্যেক শ্রেণী থেকে একদল লোক বের হয়ে পড়বে। মানুষের বিভিন্ন শ্রেণী আছে, বিভিন্ন পেশার লোক আছে, বিভিন্ন খান্দান ও পরিবার আছে, বিভিন্ন মহল্লা ও শহর আছে। তো প্রত্যেক শ্রেণী থেকে একটি করে দল কেন বের হয়ে পড়ে না?

ليتفقهوا في الدين যেন তারা দ্বীনের 'সমঝ' হাছিল করতে পারে। تفقه (বা সমঝ) শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবহ শব্দ। দ্বীনের আহকাম ও মাসায়েল, এগুলোর হিকমত ও রহস্য, এগুলোর ব্যবহার ও প্রয়োগক্ষেত্র, সম্বোধনের প্রকৃতি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় উপরোক্ত শব্দের অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা এমন এক ব্যাপক শব্দ ব্যবহার করেছেন যার চেয়ে ব্যাপক কোন শব্দ হতেই পারে না। 'যেন তারা দ্বীনের তাফাক্কুহ ও সমঝ হাছিল করে।'

و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم অর্থাৎ এতটুকুতেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে না যে, নিজে ইলম হাছিল করে আলিম হয়ে গেলো, নিজে দ্বীনের তাফাক্কুহ ও সমঝ হাছিল করে ফকীহ হয়ে গেলো। না, বরং ইলম হাছিল করার পর এবং দ্বীনের সমঝ হাছিল করার পর তার দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে নিজের কাওমের কাছে ফিরে এসে তাদেরকে দ্বীনের সমঝ দান করা এবং তাদেরকে হালাল-হারাম ও আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে সতর্ক করা।

কাওমের অর্থ এ নয় যে, মুসলমান এক কাওম, হিন্দু এক কাওম, হিন্দুস্তানী এক কাওম এবং আরব এক কাওম। এ অর্থে তো আরবী ভাষায় شعوب শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কাওমের অর্থ হলো মানুষের একটি গোষ্ঠী, দল ও জামাত। সুতরাং 'নিজের কাওম'-এর অর্থ এ নয় যে, হিন্দুস্তানী হিন্দুস্তানীদেরকে গিয়ে বোঝাবে, আরবরা আরবদেরকে গিয়ে বোঝাবে, বাঙ্গালীরা বাঙ্গালীদেরকে বোঝাবে। না, বরং অর্থ এই যে, যে যেখান থেকে এসেছে সে সেখানে গিয়ে নিজের খান্দান ও পরিবারকে, নিজের মহল্লা ও গ্রামবাসীকে এবং নিজের শহরের লোকদেরকে বোঝাবে।

মোটকথা, এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে যে বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং যে আদেশের বাধ্য ও 'মুকাল্লাফ' করেছেন তা এই যে, প্রথমে সে নিজে ইলম হাছিল করবে, দ্বীনের সমঝ হাছিল করবে, তারপর নিজের কাওমের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে দ্বীনের সমঝ দান করবে, তাদের অবস্থার সংশোধন করবে এবং হালাল-হারাম ও আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে সতর্ক করবে। শুধু নিজের সংশোধন এবং নিজের হিদায়াত ও নাজাতের ব্যবস্থা করা ইলম হাছিলের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

আয়াতের শেষে আল্লাহ বলেছেন- لعلهم يحذرون যেন তারা ভয় ও সতর্কতা গ্রহণ করে। আপনারা জানেন যে, কোরআন শরীফে আল্লাহর শানে لعل শব্দটি দ্বিধা বা সম্ভাবনার অর্থে ব্যবহৃত হয় না। কেননা সব বিষয়ে আল্লাহর ইলম নিশ্চিত। আল্লাহর শানে لعل শব্দটি হেতু ও কারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

অর্থাৎ যেন তারা ভয় ও সতর্কতার জীবন যাপন করে। হালাল-হারামের পার্থক্য অনুধাবন করে। কোন জিনিস বরবাদকারী এবং কোন জিনিস নাজাত দানকারী তা জানতে পারে এবং সে অনুযায়ী আমল করে। لعلهم يحذرون এর আওতায় এই সমস্ত অর্থই আসে।

পূর্ববর্তীগণ যা করেছেন

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম! আমাদের পূর্ববর্তীগণ যখন মাদরাসায় দ্বীনের ইলম ও সমঝ হাছিল করে আলিমে দ্বীন হতেন তখন তাঁদের একমাত্র কাজ এই হতো যে, স্থানে স্থানে তাঁরা মাদরাসা কায়েম করতেন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে যেতেন। তাঁদের পূর্ণ বিশ্বাস এই ছিলো যে, আল্লাহই একমাত্র রাযযাক। তিনিই সবাইকে রিযিক দান করেন। তাহলে যারা তাঁর দ্বীনের খেদমতে আত্মনিয়োগ করবে তিনি কেন তাদের রাযযাক হবেন না? কেন তিনি তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করবেন না? আপনি যদি মজদুর হিসাবে সারা দিন কারো কাজ করেন, সন্ধ্যার সে কি আপনাকে ভুলে যেতে পারে? মজুরি ও প্রতিদান না দিয়ে বিদায় করতে পারে? সে তো অবশ্যই মজদুরের মজুরির ব্যবস্থা করবে। এ যদি হয় দুনিয়ার মজদুরের সাথে দুনিয়ার মনিবের আচরণ তাহলে আল্লাহর বান্দা হিসাবে দ্বীনের কাজে নিমগ্ন আলিমের সঙ্গে আল্লাহর আচরণ কেমন হতে পারে? তাহলে আল্লাহর সম্পর্কে আপনার কী ধারণা, তিনি কি আপনাকে ভুলে যাবেন? ভুলে যেতে পারেন? না, তিনি তো তাঁর শান মোতাবেক আপনাকে স্মরণ রাখবেন এবং আপন কুদরতে আপনার যাবতীয় ইনতিযাম তিনি করবেন। অতীতে করেছেন, বর্তমানে করছেন। ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও করবেন।

এই যে, আমাদের পাক-ভারত উপমহাদেশে বরং সারা পৃথিবীতে দ্বীনের প্রচার প্রসার হয়েছে, সরকারের কোন রকম সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারের বৈরী আচরণ ও নগ্ন বিরোধিতা সত্ত্বেও এই যে দ্বীনের হেফাযত হচ্ছে। কোন কোন সরকার তো দ্বীন ও শরীয়তকে নিশ্চিহ্ন করার অপচেষ্টায় মেতে উঠেছিলো। বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই। ইতিহাস গ্রন্থে আপনারা সেই সব মর্মান্তিক কাহিনী পড়তে পারেন। আর আল্লাহ যাদেরকে কিতাবের যাওক ও পাঠমনস্কতা দান করেছেন তারা 'তারীখে দাওয়াত ও 'আযীমত' (ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক) পড়ে দেখতে পারেন। চতুর্থ খণ্ডে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানি (রাহ) এর এবং পঞ্চম খণ্ডে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রাহ) এবং তাঁর খান্দানের কর্ম ও কীর্তির ইতিহাস রয়েছে, পড়ে

দেখুন। হিন্দুস্তানের ইতিহাসে এমনও সময় এসেছে যখন বাদশাহী হুকুমত দ্বীন ও শরীয়তকে খতম করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলো। দ্বীন ও শরীয়তের সঙ্গে সাধারণ মুসলমানদের যে মযবুত সম্পর্ক ও বন্ধন ছিলো তা ছিন্ন করার জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করেছিলো। কিন্তু হিন্দুস্তানের বুকে আজও আল্লাহর দ্বীন টিকে আছে। সাধারণ মুসলমানদের জীবনে দ্বীনের প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। যা কিছু আপনারা এখন দেখছেন তা ঐ সকল আল্লাহওয়ালা ওলামায়ে কেরামে ত্যাগ ও কোরবানীরই ফল ও ফসল। দ্বীনের ইলম ও তাফাক্কুহ হাছিল করার পর এটাকেই তাঁরা তাঁদের জীবনের একমাত্র কাজ মনে করেছেন এবং নিজেদেরকে আল্লাহর পক্ষ হতে আদিষ্ট মনে করে দ্বীনের হিফাযতে পুরা যিন্দেগী ওয়াকফ করে দিয়েছেন। হাজারো ঝড়-ঝাপটার মুখেও দ্বীনের বাতিকে তাঁরা নিভে যেতে দেন নি। ইসলামের সঙ্গে আওয়ামের যে গভীর সম্পর্ক ছিলো তা ছিন্ন হতে দেন নি। দ্বীনের হিফাযতের এই কঠিন কাজ তাঁরা কয়েকভাবে করেছেন। প্রথমত বহু ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন স্থানে মাদরাসা ও মকতব কায়েম করেছেন। তাঁদের কাছে আসবাব ও সামান ছিলো না, উপায় উপকরণ ছিলো না। কিন্তু তাঁরা সে পরোয়া করেননি। আসমানের নীচে বসে গেছেন, গাছের ছায়ায় কিংবা ভাঙ্গা ঝুপড়িতে বসে গেছেন।

তাঁরা দালান-কোঠা ও ইমারাত বানানোর ফিকির করেন নি, যেমন বর্তমান যুগে দেখা যায়। এখন তো অবস্থা অন্য রকম। হয়ত এর পিছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে, যার বিশদ আলোচনার এখানে অবকাশ নেই। এখন তো সবার মাঝে প্রবলভাবে এই প্রবণতা শুরু হয়েছে যে, শানদার মাদরাসা হতে হবে, আলীশান ইমারত ও দালান-কোঠা হতে হবে। বিশাল বিশাল বাজেট হতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের খুব শান-শওকত হতে হবে এবং হুকুমতের স্বীকৃতি অর্জন করতে হবে। মাদরাসার সনদ নিয়ে বিদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ থাকতে হবে। সরকারী চাকুরি ও সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে। আরব দেশে তারা চাকুরি করবে, আর হিন্দুস্তানে তাদের পরিবার পরিজন আরাম আয়েশে থাকবে। কাঁচা ঘরের স্থানে দালান ওঠবে। সর্বত্র এই এক ধ্বংসাত্মক প্রবণতা শুরু হয়ে গেছে। লেখা-পড়া তো করে হিন্দুস্তানের মাদরাসায়, যেখানে গরীব মুসলমানদের সিনা-পসিনার কামাই থেকে চান্দা জমা করে তাদের রুটির ইনতিযাম করা হয়, অথচ ইলম শিক্ষা করে নিজেদের মেধা ও প্রতিভা নিয়ে তারা চলে যায় আরব দেশে, কিংবা হিন্দুস্তানের বড় বড় শহরে।

এর ফল কী দাঁড়ায়? সেখানে মানুষ তাদের ইলম দ্বারা কতটা ফায়দা

ওঠাতে পারে সে তো আল্লাহই ভালো জানেন। সেখানে যাদের যাওয়ার সুযোগ হয় তারাও নিজের চোখে কিছুটা দেখতে পান। ইলমের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। উদ্দেশ্য শুধু কামাই করা। দেশের বাড়ীতে দালান কোঠা তোলা। এটা তো ওলামায়ে কেরামের শান ছিলো না। এটা তো আমাদের আকাবিরে উম্মতের মেযাজ ছিলো না। আল্লাহর দ্বীন তো আল্লাহ্ নিজেই হিফাযত করবেন–

إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون

এই দ্বীন তো কেয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকার জন্য এসেছে। কিন্তু যাহেরী আসবাব হিসাবে বলা যায় যে, ওলামায়ে কেরাম যদি ত্যাগ ও কোরবানীর পথে না চলতেন তাহলে হিন্দুস্তানের মাটি থেকে এই দ্বীন কবেই বিদায় নিয়ে চলে যেতো। কিংবা অন্তত পক্ষে আওয়ামের দিল-দেমাগ থেকে, তাদের আমলী যিন্দেগী থেকে ইসলাম গায়েব হয়ে যেতো। কিন্তু এখনো হিন্দুস্তানের যমিনে দ্বীন ও শরীয়তের যা কিছু শান-শওকত দেখছেন। এই যে ইলমের সিলসিলা বাকী রয়েছে, কোরআন-হাদীছের চর্চা অব্যাহত রয়েছে। তালীম ও তাবলীগের সিলসিলা জারি রয়েছে– এগুলো হচ্ছে ওলামায়ে কেরামের ত্যাগ ও কোরবানির ফল।

ঘটনা এই যে, প্রথমে তাঁরা মাদরাসায় খুব মেহনত করে দ্বীনের ইলম ও তাফাক্কুহ হাছিল করেছেন। তারপর আল্লাহর নাম নিয়ে কোথাও গিয়ে জমে বসে গেছেন এবং পড়া ও পড়ানো শুরু করেছেন। তাঁদের কাছে মানুষ জমা হতো, আর তারা মসজিদে হালকা বানিয়ে দাওয়াতের কাজ করতেন। শরীয়তের আহকাম বয়ান করতেন। ঈমান-আকীদা দুরস্ত করার জন্য বে-কারার হয়ে চেষ্টা করতেন। এমনকি দূরদারাজের গ্রামে ও লোকালয়ে লম্বা সফর করতেন। মানুষের দয়া ও দান গ্রহণ না করে নিজেরাই নিজেদের ইনতিযাম করে নিতেন। তাদের সেই সব সফরের কারগুযারি ও কোরবানির কাহিনী আজ আমাদের বিশ্বাসও হতে চাইবে না যে, দ্বীনের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করা কি কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব! কিন্তু তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো। কেননা তাঁদের দিলে আল্লাহর কাছ থেকে আজর ও ছাওয়াব পাওয়ার ইয়াকীন ও বিশ্বাস ছিলো।

আল্লাহু আকবার! কেমন হিম্মতওয়ালা ইনসান ছিলেন তাঁরা! পেটে পাথর বেঁধে এবং গামছায় কয়েক মুষ্টি চনা বেঁধে তাঁরা বের হতেন এবং গ্রামে গ্রামে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতেন। তাঁদের এই মেহনত ও কোরবানির ওছিলায় কত গ্রামের পর গ্রাম এবং এলাকার পর এলাকা মুসলমান হয়েছে। মানুষের

ঈমান-আকীদা দুরস্ত হয়েছে।

মাওলানা কারামাত আলী জৌনপুরী ছিলেন একা একজন মানুষ। তিনি হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রাহ) এর বহু উঁচা দরজার খলীফা ছিলেন। তাঁর জিহাদের বড় শওক ছিলো। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য তলোয়ার চালানো, বন্দুক চালানো এবং যুদ্ধের বিভিন্ন কলাকৌশল শিক্ষা করেছিলেন। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হওয়ার শাহাদাতের মাকাম হাছিল করার বড় তামান্না ও আকাঙ্ক্ষা ছিলো তাঁর দিলে।

কিন্তু সৈয়দ শহীদ (রাহ) তাঁকে যুদ্ধের ময়দান থেকে এই বলে পাঠিয়ে দিলেন যে, না, তোমার কাজ এখানে নয়। তুমি তোমার এলাকায় ফিরে যাও এবং জাহিল মুসলমানদেরকে দ্বীনের তালীম দান করো, তাদের ঈমান-আকীদা দুরস্ত করো, তাদেরকে খাঁটি মুসলমান বানাও।

শায়খের আদেশে তিনি ফিরে এলেন। এর ফল কী হলো? একটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে তাঁর হাতে দুই কোটি মানুষ হিদায়াত লাভ করেছে। এই কিছু দিন আগে আমি বাংলাদেশ গিয়েছিলাম। সেখানে আমি স্বচক্ষে মাওলানা কারামাত আলী জৌনপুরী (রাহ) এর মেহনত ও কোরবানির ফল দেখে এসেছি যে, এখনও বাংলাদেশের মুসলমানদের মাঝে অন্যান্য মুসলিম এলাকার তুলনায় শিরক ও বিদ'আতের পরিমাণ খুব কম। তাদের সহজ সরল জীবনে ইসলামের প্রভাব অনেক বেশী।

আমি আপনাদের সামনে আল্লাহর একজনমাত্র বান্দার নমুনা তুলে ধরলাম। ইতিহাসের পাতায় এরকম নমুনা একটি দু'টি নয় অসংখ্য পাওয়া যাবে। কারো কারো নাম ও কর্ম ইতিহাস সংরক্ষণ করেছে, আর যাদের নাম ইতিহাসের পাতায় নেই, আছে শুধু আমলনামায় তাদের সংখ্যা যে কত তা শুধু আল্লাহই জানেন। আল্লাহর এই বান্দারা কখনো চিন্তা করেন নি যে, বড় বড় দালান কোঠা হতে হবে, বেশী বেশী ছাত্র হতে হবে। যে কোন জায়গায় তাঁরা বসে যেতেন সেখানেই ইলমের তা'লীম শুরু হয়ে যেতো। ফলে দ্বীন ও শরীয়তেরও হিফাযত হতো এবং তালীম ও তারবিয়াতের সিলসিলাও অব্যাহত থাকতো।

প্রয়োজন আকাবিরে উম্মতের অনুসরণ

আকাবিরীনে উম্মতের সেই তরীকা এখন আবার যিন্দা করার প্রয়োজন রয়েছে। আপনারা এখন দ্বীনের ইলম ও তাফাক্কুহ হাছিল করছেন। এখন থেকেই নিয়ত করে নিন যে, এখান থেকে ফারিগ হয়ে আপনারা যেখানে

প্রয়োজন সেখানে মাদরাসা কায়েম করবেন, মকতব কায়েম করবেন, আর যেখানে আগে থেকেই আছে সেখানে মাদরাসা-মকতবে দ্বীনের তালীম দিবেন। দাওয়াত ও তারবিয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন।

হিন্দুস্তানের নাযুকতম সময়

আপনাদেরকে সম্বোধন করে আজ আমি অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলতে চাই। হিন্দুস্তানের মুসলমানগণ এখন এমন একটি নাযুক মোড়ে এসে উপনীত হয়েছে যা বহু শতাব্দী পর পর এসে থাকে। ইতিহাসে বহু শতাব্দী পরে এমন নাযুক সময় এসে থাকে। আর তা বড় নাযুক সময় হয়ে থাকে, জীবন-মৃত্যুর সময় হয়ে থাকে। এখন হিন্দুস্তানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে বড় বড় মেধাবী, বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ ও রাজনীতি বিশারদরা অনেক চিন্তা ও পরিকল্পনা করে এর রূপরেখা তৈরী করেছে। এই শিক্ষাব্যবস্থা মুসলমানদের জন্য জাতিগত নির্মূলীকরণের সমার্থক। দৈহিকভাবে নির্মূলীকরণ নয়, বরং আত্মিক নির্মূলীকরণ। অর্থাৎ দ্বীন ও দ্বীনী শিক্ষা এবং দ্বীনী ভাষা ও হস্তলিপি থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেয়া, যাতে দ্বীন ও শরীয়তের সঙ্গে তাদের আর কোন সম্পর্কই বিদ্যমান না থাকে। স্কুল কলেজের ধর্মহীন শিক্ষা দ্বারা যদি মুসলিম শিশু-কিশোর ও তরুণদেরকে দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া যায় তাহলে নিজে নিজেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়ে যাবে। মুসলমানদের আগামী প্রজন্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ব্যাপক গণহত্যার কলঙ্ক এবং কোন শোরগোল ছাড়াই কাজ হাছিল হয়ে যাবে।

আপনারা হয়ত জানেন যে, তুরস্কে মুস্তাফা কামাল এ কৌশলই গ্রহণ করেছিলো। উছমানী খিলাফাত ছিলো ইসলামী উম্মাহর প্রাণকেন্দ্র। মোস্তফা কামাল খিলাফত বিলুপ্ত করার পর প্রথমেই হস্তলিপি পরিবর্তন করে দিলো। তুর্কী ভাষা প্রথমে আরবী হস্তলিপিতে লেখা হতো। কিন্তু সে সরকারী আইন জারি করে আবরী হস্তলিপি নিষিদ্ধ করে দিলো এবং রোমান হরফে তুর্কী ভাষা লেখা বাধ্যতামূলক করে দিলো। ফল এই দাঁড়ালো যে, ইলমী তাহযীব তামাদ্দুন ও সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং সমগ্র ইসলামী কতুবখানা থেকে তুর্কী মুসলমান বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। এভাবে কলমের এক খোঁচায় মুস্তাফা কামাল সুদীর্ঘ সাত শ বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও জ্ঞানসম্পদ শেষ করে দিলো। জনৈক দার্শনিক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, এ যুগে কোন কাওমের কুতুবখানা ও গ্রন্থাগারে আগুন লাগানো নিছক নির্বুদ্ধিতা। শুধু হস্তলিপি পরিবর্তন করে দেয়াই এখন যথেষ্ট।

আমাদের হিন্দুস্তানেও সেই ঘৃণ্য কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে। এখানেও

হস্তলিপি পরিবর্তনের অপচেষ্টা শুরু হয়েছে। আল্লাহর শোকর এই যে, আপনারা মাদরাসায় অন্য পরিবেশে আছেন। স্কুল কলেজের অবস্থা শুনুন। সেখানে এখন সত্তর আশিভাগ মুসলমান ছাত্র উর্দু ভাষা জানে না। মা-বাবাকে তারা হিন্দীতে চিঠি-পত্র লেখে। আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, যা এক সময় মুসমানদের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ছিলো তার অবস্থা এই যে, আলীগড় থেকে লেখা-পড়া করে আসা ডাঃ ইশতিয়াক কোরায়শী নিজে বলেছেন, বি এ ক্লাশের সত্তর আশি ভাগ ছাত্র উর্দু পড়তে বা লিখতে পারে না। চিঠি-পত্র তারা হিন্দিতে লিখে থাকে। তাহলে এখন দ্বীনী কিতাব পড়বে কারা? সুতরাং বন্ধুগণ! হিন্দুস্তানের ইতিহাসে বড় নাযুক মোড় এসে গেছে। মুসলিম শিশু-কিশোর ও তরুণরা দ্বীনের বুনিয়াদি শিক্ষা তথা তাওহীদ ও রিসালাত এবং আখেরাত ও পরকাল সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে পড়েছে।

আল্লাহ তা'আলা আপনাদের উপর বড় দয়া করেছেন যে, আপনাদের মা-বাবাকে তিনি অনেক বড় তাওফীক দান করেছেন, আর তারা দ্বীনের ইলম হাছিল করার জন্য আপনাদেরকে মাদরাসায় পাঠিয়েছেন। স্কুল কলেজের তো অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, দ্বীনের মৌলিক ও সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কেও তারা এখন অজ্ঞ। তাওহীদ কাকে বলে? নবী ও নবুয়তের পরিচয় কী? তাওহীদ ও রিসালাতের হাকীকত কী? আল্লাহর সঙ্গে নবীর সম্পর্ক কী এবং মানুষের সঙ্গে নবীর সম্পর্ক কী? নবীদের আগমনের উদ্দেশ্য কী? ইহকাল ও পরকালের হাকীকত কী? এ সম্পর্কে তাদের কিছুই জানা নেই। আখেরাত, হাশর-নশর ইত্যাদি শব্দ তারা বুঝতেই পারে না। এ বড় ভয়ংকর অবস্থা। এটা কী কল্পনা করা সম্ভব যে, হিন্দুস্তানী মুসলিম পরিবারের সন্তান উর্দু হস্তাক্ষর সম্পর্কেও অজ্ঞ হবে? কিন্তু এখন পরিস্থিতি এমনই দাঁড়িয়েছে।

এর কারণ কী? কারণ শুধু এই যে, ঘরের ও পরিবারের মুরুব্বীদের দিলে আল্লাহর মুহাব্বাতের পরিবর্তে দুনিয়ার মোহ ও মুহাব্বাত পয়দা হয়ে গেছে। তাদের আকাঙ্ক্ষা এই যে, আমাদের বাচ্চারা বড় বড় পরীক্ষা দিয়ে পাশ করুক এবং বড় বড় পদ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। ব্যস, তাহলেই আমাদের কামিয়াবি। অথচ এই দুনিয়াবী শিক্ষার ফল হয়েছে এই যে, যাদের শিক্ষার পিছনে অভিভাবকরা জীবনের আরাম আয়েশ ও সর্বস্ব ব্যয় করেছেন সেই নিমক হারাম ছেলেরাই বড় হয়ে আর বুড়ো মা-বাবার খবর নেয় না, বরং নিজেদের স্বপ্নের পৃথিরী গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কেননা যে শিক্ষা তারা পেয়েছে সেখানে মা-বাবার হকের কথা নেই। মা-বাবার ফযীলতের কথা নেই।

উস্তাদের হকের কথা নেই। আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ-নিষেধের কথা নেই। তাহলে মা-বাবার যিন্দেগীর খোলাসা কী দাঁড়ালো? خسر الدنيا و الآخرة দুনিয়াও গেলো, আখেরাতও গেলো।

উচ্চশিক্ষার নামে বাইরে যাওয়ার রোগ

বন্ধুগণ! এই দূর দারাযের সফর করে আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য সার্থক হয়ে যাবে যদি তোমরা শুধু এই পোখতা এরাদা করে নাও যে, এখান থেকে ফারিগ হয়ে তোমাদরে এলাকায় যে সব মাদরাসা আছে সেখানে গিয়ে পড়ানোর কাজে লেগে যাবে। নিজ নিজ গ্রামে, নিজ নিজ এলাকায় দ্বীনের তালীম ও তারবিয়াত প্রসারের মহান কাজে আত্মনিয়োগ করবে।

আমি তোমাদেরকে একটি কথা বলি, বড় বড় মাদরাসায় এখন এই ঝোঁক ও প্রবণতা ব্যাপক হয়ে পড়েছে যে, আমরা বাইরে গিয়ে লেখা-পড়া করবো, বিদেশের বড় বড় ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রী লাভ করবো এবং আর্থিক সচ্ছলতার মুখ দেখবো। আমার কাছে শুনে নাও ভাই, এই গরীব মাদরাসা-মকতবগুলো তোমাদের কাছে যে আশা করেছিলো, কাওম ও মিল্লত তোমাদের কাছে যে, আশা করেছিলো, উম্মাতের যে প্রয়োজন ছিলো, এটা হবে সেই আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে এবং সেই প্রয়োজনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।

আরব বিশ্বের অবস্থা আমার জানা আছে। আমি সেখানকার বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মজলিসের সদস্য। সুতরাং সেখানকার অবস্থা আমার চেয়ে ভালো কারো জানার কথা নয়। তাসত্ত্বেও আমি বিদেশের লেখা-পড়ার ঘোরতর বিরোধী। এই যে বাইরে যাওয়ার রোগ দেখা দিয়েছে, এটাকে আমি কাওম ও মিল্লাতের জন্য এবং হিন্দুস্তানের বে-সাহারা মুসলমানদের জন্য ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর মনে করি। আমাদের করণীয় ছিলো সেটাই যা আমাদের আকাবির ও পূর্ববর্তীগণ করে গিয়েছেন। অর্থাৎ যে কোন গ্রামে ও বস্তিতে মাদরাসা মকতব কায়েম করা এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা করে বসে যাওয়া। তালীম ও তারবিয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করা। মানুষের ঈমান-আকীদা ও আমল দুরস্ত করার মেহনতে লেগে যাওয়া। তালীম ও তারবিয়াতের কাজে লেগে যাওয়া।

স্বয়ং আল্লাহ্ তোমাদের রিযিকের যিম্মাদার

আপনারা দেখুন, আমি মসজিদে বসে বলছি, দুনিয়ার মানুষের যখন এই

অবস্থা যে, তারা তাদের মজদুরকে ভুলে না, বরং তাদেরকে উপযুক্ত মজুরি দেয়। সুতরাং যারা আল্লাহ তা'আলার কাজ করবে, আল্লাহর দ্বীনের খেদমতে আত্মনিয়োগ করবে, এটা হতেই পারে না যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভুলে যাবেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা তো রাব্বুল আলামীন, তিনি তো সকল দাতার বড় দাতা, তিনি তো সর্বশক্তিমান। সুতরাং তিনি তাঁর মজদুরদের কথা ভুলে যাবেন, এটা কী করে হতে পারে?

আমি বলতে চাই, এই বিশাল হিন্দুস্তানের যেখান থেকে পারেন এমন একজন মানুষ এনে দেখান, যিনি ইখলাছের সাথে দ্বীনের খিদমতে নিয়োজিত আছেন, অথচ অনাহারে অনটনে আছেন। তার থাকার ব্যবস্থা নেই, খানার ইনতিযাম নেই। এমন একজন মানুষ এনে দেখান, আমি আপনারও আসা-যাওয়ার ভাড়া দেবো, তারও আসা-যাওয়ার ভাড়া দেবো। আমি অনেক বার আমার মাদরাসার ছাত্রদেরকে বলেছি যে, দেখো; তোমরা ইখলাছের সাথে মাদরাসায় পড়াও, দ্বীনের খিদমত করো। তারপর যদি তোমাদের খাবার না জোটে তাহলে তোমাদের হাত আছে, আর আমার গলা আছে। আমার গলা চেপে ধরে তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করো যে, মাওলানা! আপনি তো বলেছিলেন যে, দ্বীনের জন্য যারা মেহনত করবে, যারা তালীম-তারবিয়াতের কাজে মশগুল হবে তারা বেকার থাকবে না, তাদের অনাহারের কষ্ট হবে না। অথচ দেখুন, আমরা কী অবস্থায় আছি!

যদি কখনো এমন হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, পিছনে বিশেষ কোন কারণ আছে। যেমন হয়ত ইখলাছ নেই, ছহী দ্বীনদারি নেই। হয়ত ইলমের যোগ্যতা আছে কিন্তু রাগ ও অহংকার এত বেশী যে, সোজা মুখে কথা বলতে পারে না, ঘাড় বাঁকা না করে তাকাতে পারে না। কথায় কথায় রাগে ফেটে পড়ে, অহংকারে সবাইকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। কিংবা কাজের উদ্যম ও মেহনতের জাযবা নেই, অলসতায় সময় কাটায়। ইলমের মাহের, ফনের বড় কামেল, কিন্তু পড়ানোর কাজে, তালিবে ইলমের খেদমতের কাজে আন্তরিকতা নেই। মোট কথা যেখানেই দেখবে কোন আলিমে দ্বীন সমস্যায় আছে, অনাহারে অনটনে আছে সেখানেই বুঝবে তার নিজের মাঝে কোন না কোন ত্রুটি আছে, কিছুর না কিছুর অভাব আছে। অভাব তার ভিতরে, বাইরে নয়। ত্রুটি তার নিজের, দ্বীনের নয়, ইলমে দ্বীনের নয়, তাওয়াক্কুলের নয়।

আল্লাহকে সাহায্য করো ......

ভাই ও বন্ধুগণ! দেখো, আমি তোমাদেরকে খুব আন্তরিকতার সাথে বলছি,

হিন্দুস্তানে অনেক মাদরাসা আছে। আমি সমস্ত মাদরাসার কদর করি এবং দু'আ করি সমস্ত মাদরাসা উন্নতি লাভ করুক। কিন্তু আমি যদি বলি যে, নাদওয়াতুল উলামার পরে এই মাদরাসার সঙ্গে আমার সবচে' বেশী আন্তরিকতার সম্পর্ক তাহলে তোমাদের অবাক হওয়া উচিত হবে না। আমি তোমাদেরকে আমার নিজের প্রিয় ছাত্র মনে করে নছীহত করছি, তোমরা প্রতিজ্ঞা করে নাও যে, হিন্দুস্তানে তোমরা দ্বীন ও ইলমের সম্পদ হিফাযত করার চেষ্টা করবে। দ্বীন ও শরীয়তের সঙ্গে, ইলম ও তালীমের সঙ্গে হিন্দুস্তানের মুসলমানদের এখনো সম্পর্ক ও বন্ধন রয়েছে তা নষ্ট হতে দেবে না, তাহলে আল্লাহ তা'আলাও তোমাদেরকে নষ্ট হতে দেবেন না। إن تنصروا الله ينصركم و يثبت أقدامكم যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো তাহলে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদম জমিয়ে দেবেন।

আল্লাহর সত্তা যেমন অনাদি-অনন্ত তেমনি তাঁর গুণাবলীও অনাদি ও অনন্ত। তিনি যখন বলেন যে, আমি রাযযাক– রিযিকদাতা, তখন তা কোন স্থান বা কালের সঙ্গে বিশিষ্ট হয় না, বরং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যেমন রিযিকদাতা ছিলেন তেমনি এখনো তিনি রিযিকদাতা। এটাই উম্মতের সর্বসম্মত আকীদা এবং এই আকীদার উপর আমাদের ঈমান নির্ভরশীল। সুতরাং আপনারা প্রতিজ্ঞা করুন যে, যে যে গ্রাম থেকে এবং যে যে এলাকা থেকে আপনারা এসেছেন যেখানেই সুযোগ হবে সেখানেই আপনারা মুসলামনদের তালীম ও তারবিয়াতের কাজে লেগে যাবেন। মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেবেন যে, দ্বীনের আকীদা কী কী? এবং দুনিয়ার আকীদা কী কী? তাওহীদ ও শিরকের মাঝে পার্থক্য কী? আখেরাত ও হাশর-নাশরের অর্থ কী? আপনারা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবেন যেন তারা তাদের সন্তানদের দ্বীনী তালীমের ব্যবস্থা করে।

আল্লাহ না করুন যদি আরো বিশ পঁচিশ বছর এভাবে কেটে যায় তাহলে এমন এক প্রজন্ম আপনাদের সামনে এসে যাবে যাদের সাথে কথা বলার জন্য আপনাদের দোভাষীর প্রয়োজন হয়ে পড়বে। কেননা তারা আপনাদের ভাষা বোঝবে না, আপনারাও তাদের ভাষা বোঝবেন না। এই 'জেনারেশন গ্যাপ' বা প্রজন্মের শূন্যতা রোধ করার জন্য এখন থেকেই আপনারা কোমর বেঁধে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। অবশ্যই আল্লাহ আপনাদের সাহায্য করবেন। অন্তরে এ অটল বিশ্বাস রাখুন যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অবশ্যই সাহায্য করে থাকেন। এটা আল্লাহর চিরন্তন বিধান, চিরনির্ধারিত ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা ও বিধান অতীতেও

ছিলো, এখনো আছে, সামনেও থাকবে। আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন হয় না। و لن تجد لسنة الله تبديلا

মুজাদ্দিদে আলফেছানীকে সামনে রাখুন

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রাহ) ছিলেন এক ফকীর ইনসান। কী ছিলো তাঁর কাছে? কোন উপায় উপকরণ ছিলো না। যাহেরী কোন আসনাব ছিলো না। কিন্তু ঈমান ও ইখলাছের শক্তি ছিলো, আল্লাহর উপর ভরসা ও তাওয়াক্কুল ছিলো। তিনি মহাশক্তিধর মোঘল সালতানাতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেলেন, আর আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করলেন। আল্লাহর গায়বি মদদেই তিনি এত বড় অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিলেন। সে যুগে বাদশাহ আকবর ছিলো দুনিয়ার দ্বিতীয় শক্তির অধিকারী বাদশাহ। যেমন ছিলো বিপুল শক্তির অধিকারী তেমনি ছিলো অসম সাহসী। তার দরবারে ছিলো দুনিয়ার সেরা জ্ঞানী-গুণী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের সমাবেশ। আমি বিশদ বিবরণে যাবো না, আপনারা ইতিহাস পড়ে দেখুন।

একদিকে ছিলো বাদশাহ আকবর, ছিলো তার শাহানশাহী দরবার, ছিলো তার ফৌজী শক্তি ও শাসনক্ষমতা। অন্যদিকে ছিলেন মুজাদ্দিদে আলফেছানী নামে আল্লাহর এক ফকীর বান্দা। দ্বীনের করুণ অবস্থা এবং উম্মতের অধঃপতন দেখে আল্লাহর বান্দার দিলে চোট লাগলো, আর তিনি সমকালীন রাজশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন।

নতীজা কী হলো? আকবর মারা গেলো, তারপর তার পুত্র বাদশাহ জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করলে। আকবরের চেয়ে তিনি অনেক উত্তম ছিলেন এবং হযরত মুজাদ্দিদ ছাহেবের ভক্ত ছিলেন। আকবর তো কোরবানি ও গরু জবেহ করা নিষিদ্ধ করেছিলো এবং শরাবকে হালাল ঘোষণা করেছিলো। তার আমলে গরু জবেহ করার শাস্তি ছিলো কতল। অথচ বাদশা জাহাঙ্গীরের আমলে যখন কালিঙ্গর দুর্গ জয় হলো এবং হিন্দু সেনাপতির হাতে জয় হলো তখন বাদশাহ জাহাঙ্গীরের প্রথম আদেশ ছিলো যে, এখানে মসজিদ্ তৈরী করো এবং গরু জবেহ করো। এটা কার মেহনত মোজাহাদার বরকত ছিলো? কার হিম্মত ও ইখলাছের নতীজা ছিলো? হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রাহ) এর।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহজাহান সিংহাসনে আরোহণ করলেন এবং ঘোষণা দিলেন যে, ফেরআউন নির্বোধ ছিলো, তাই সিংহাসনে বসে সে খোদায়ী দাবী করেছে। আমি মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত, তাই আমি দুই রাকাত শোকরানা নামায পড়বো।

শাহজাহানের পর এলেন বাদশাহ আওরঙ্গযেব (রাহ), যাকে আমাদের আকাবিরগণ আল্লাহর অলী বলে গণ্য করেছেন। হিন্দুস্তানের খলীফায়ে রাশেদ বলে গণ্য করেছেন। সাইয়েদুনা আবু বকর ছিদ্দীক, ওমর ফারূক, উছমান গনী, আলী মোরতাযা ও ওমর বিন আব্দুল আযীযের পরে ষষ্ঠ খলীফায়ে রাশেদ রূপে তাঁর নাম আপনারা উল্লেখ করতে পারেন। দুনিয়া স্বীকার করেছে যে, এ সবই ছিলো হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রাহ) এর কোরবানির নতীজা।

শুরুতে সামান্য ইমতিহান

ভাই ও বন্ধুগণ! সুতরাং তোমাদের ভয় কিসের? আল্লাহর উপর ভরসা করে প্রতিজ্ঞা করো যে, হিন্দুস্তানের বুকে দ্বীন ও শরীয়তকে তোমরা বাকী রাখবে। ইলম ও তালীমের ধারাকে তোমরা অব্যাহত রাখবে। দ্বীনের সঙ্গে মুসলমানদের যে সম্পর্ক ও বন্ধন তা অটুট রাখবে। এই প্রতিজ্ঞা করো, তারপর দেখো, আল্লাহর পক্ষ হতে কেমন গায়বী মদদ নেমে আসে! দ্বীন তো আল্লাহর কুদরতে এমনিতেই যিন্দা থাকবে, তোমাদের মেহনত দ্বারা তোমরা নিজেরা সৌভাগ্যের অধিকারী হবে। তোমাদের কিসমত খুলে যাবে।

এটাই হলো তোমাদের করণীয়। হয়ত শুরুতে সামান্য পরীক্ষা হবে, সামান্য অনাহার ও অভাব-অনটন আসবে। যদি আসে তবে তা হবে খুবই সাময়িক। তারপর যখন আল্লাহ তা'আলা বরকতের দরজা খোলবেন তখন যারা দেখার তারা দেখতে পাবে যে, শাহানা যিন্দেগী কাকে বলে!

আর শোনো! তোমরা দ্বীনের খিদমত করবে মানুষের কাছে কোন বিনিময়ের প্রত্যাশা ছাড়া এবং নাম ও শোহরতের আকাঙ্ক্ষা ছাড়া। বড় বড় মাদরাসার কথা চিন্তা করবে না। আলীশান ইমারতের ফিকির করবে না। ফকীরানা হালাতের ছোটখাটো মাদরাসা-মকতব কায়েম করবে এবং সেখানেই খিদমতে লেগে যাবে। এতে বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ করবে না। আমাদের আকাবির ও বুজুরগানে দ্বীন তো ডালিম গাছের নীচে বসে গিয়েছিলেন। একজন উস্তাদ ছিলেন মোল্লা মাহমুদ, আর একজন শাগিরদ ছিলেন মাহমুদুল হাসান, যামানা যাকে চিনেছে শায়খুল হিন্দ নামে। শুরু হয়ে গেলো উস্তাদ শাগিরদের পড়া ও পড়ানো। ডালিম গাছের নীচের সেই মাদরাসা বড় হতে হতে একসময় হয়ে গেলো দেওবন্দের মত বিশ্ববিখ্যাত মাদরাসা।

একইভাবে মাযাহেরুল উলুম মাদরাসার ইতিহাস পড়ো, নাদওয়াতুল উলামার ইতিহাস পড়ো। নাদওয়া প্রথমে কী ছিলো? ছোট একটি কামরা।

এখনো তা বিদ্যমান আছে। আমরা যখন সেখানে যাই তখন ভেবে হয়রান হয়ে যাই যে, ইয়া আল্লাহ! এখানে এই ছোট্ট এক কামরায় নাদওয়ার কী অবস্থা ছিলো! এখানে মাওলানা শিবলী নোমানী থাকতেন! এখানে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ছাত্র হিসাবে পড়তেন! এখানেই কেটেছে আল্লামা সৈয়দ সোলায়মান নাদাবী (রাহ) এবং মাওলানা আব্দুল বারী (রাহ) এর তালিবে ইলমী জীবন! বড় বড় আলিমে দ্বীন ও মুফাক্কিরে ইসলাম, যাদের নাম আজ সারা দুনিয়াতে উজ্জ্বল, যাদেরকে নিয়ে আমরা এখন গর্ব করি তারা সবাই এখানে লেখা-পড়া করেছেন! আজকের এই বিশাল নাদওয়ার সঙ্গে এর কী তুলনা! কিন্তু সেখানে কারা পয়দা হয়েছে, আর এখানে কারা পয়দা হচ্ছে!

দ্বীনী তালীমের মেযাজ ঃ উস্তাদের প্রতি ভক্তি

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম! হয়ত তোমাদেরকে বলার প্রয়োজন নেই, তবু বলি; আমাদের যে তালীমী সিলসিলা তার স্বভাব ও মেযাজ দুনিয়ার অন্যান্য শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। দুনিয়ার শিক্ষাব্যবস্থায় শুধু মেধা ও পরিশ্রম যথেষ্ট। একজন মেধাবী ছাত্র চেষ্টা সাধনা দ্বারাই শিক্ষাজীবনের সফলতার শীর্ষ চূড়ায় উপনীত হতে পারে। অথচ আমার কাছে শোনো ইউরোপ আমেরিকার নির্ভেজাল জড়বাদী শিক্ষাব্যবস্থার কথা। আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মাঝে শিক্ষকদের প্রতি রয়েছে অসাধারণ ভক্তি-শ্রদ্ধা। আমি তো এবার ইংল্যান্ডে গিয়ে হয়রান হয়ে গেছি। দুনিয়ার প্রাচীনতম ও মর্যাদাপূর্ণ ইউনিভার্সিটিগুলোর মাঝে অক্সফোর্ডের নাম শীর্ষস্থানে। সেখানে একটি ইসলামী সেন্টার প্রতিষ্ঠার প্রোগ্রাম ছিলো। যুবরাজ চার্লস উপস্থিত ছিলেন। সেন্টারের উদ্বোধনের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো। আমি খুবই হতবাক হলাম যখন আমাকে বলা হলো যে, এই রাস্তা শুধু শিক্ষকদের চলাচলের জন্য। ছাত্ররা এ পথে চলাচল করতে পারে না, তবে যারা কোন বিষয়ে আলোচনা বা প্রশ্নোত্তরের জন্য শিক্ষকের পিছনে অনুগমন করে শুধু তাদের জন্য অনুমতি রয়েছে। ছাত্ররাও শ্রদ্ধার সঙ্গেই এ আইন মেনে নিয়েছে। তাদের মনে কোন ক্ষোভ নেই যে, আমাদের পায়ে এমন কি ত্রুটি রয়েছে যে, আমরা এ পথে চলতে পারবো না!

আমাদেরকে আরো দেখানো হলো যে, এটা ডাইনিং হল। এখানে নিয়ম এই যে. শিক্ষক উপরে এবং ছাত্ররা নীচে বসে আহার করে। এটা হতে পারে না যে, ছাত্রও শিক্ষকের সমান স্থানে বসে আহার করবে। অবশ্য ছাত্রদেরও সে জন্য কোন ক্ষোভ নেই। এমনকি জায়গা না পেলে ছাত্ররা দাঁড়িয়েই আহার করে

নেয়, তবু শিক্ষকদের খালি জায়গায় কেউ বসে না।

এ হলো ঐ জাতির সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের কথা যাদের কাছ থেকে আমরা শিক্ষা ও সভ্যতা শিখেছি বলে গর্ব করে থাকি। অথচ আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আজ যা কিছু হচ্ছে তা আমরা সবাই জানি। আসলে ইউরোপের যা কিছু ভালো তা বর্জন করে যা কিছু মন্দ তাই শুধু আমরা গ্রহণ করেছি। আর দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, সেই মন্দগুলো আরো নিকৃষ্টরূপে এখন আমাদের কাওমী মাদরাসগুলোতে অনুপ্রবেশ করতে শুরু করেছে।

কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়েও আমি গিয়েছি। জানতে পারলাম: কেমব্রীজের বাধ্যতামূলক নিয়ম এই যে, ভর্তির সময়ই প্রত্যেক ছাত্রকে লিখিতভাবে জানাতে হয় যে, কোন্ শিক্ষককে সে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছে এবং কার তত্ত্বাবধানে সে তার শিক্ষা ও অধ্যয়নকাল অতিবাহিত করবে। শুধু কোন বিভাগে বা ক্লাশে নাম লিখিয়ে দেয়া যথেষ্ট নয়। তাকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে যে, আমি অমুক শিক্ষকের অভিভাবকত্বে আছি এবং তার তত্ত্বাবধানে ও দিকনির্দেশনায় অধ্যয়ন করছি। তাকে আমি নিয়মিত আমার গবেষণাকর্ম দেখাই এবং তিনি আমাকে বিষয় ও গ্রন্থ নির্বাচন করে দেন। কী পড়বো, কী পড়বো না, কোন লেকচারে উপস্থিত থাকবো বা থাকবো তা তিনিই নির্ধারণ করে দেন।

বিগত কালে আমাদের কাওমী মাদরাসার তরীকা এই ছিলো যে, প্রত্যেক তালিবে ইলম একজন উস্তাদ নির্বাচন করে নিতো এবং তার অভিভাবকত্বে নিজেকে সমর্পণ করতো। তারপর মন-প্রাণ দিয়ে উস্তাদের সবরকম খেদমত করতো। তার জুতা বহন করতো এবং তার কাছ থেকে ইলম ও তারবিয়াত হাছিল করতো। এমনকি চিন্তায়, চেতনায় ও সর্ববিষয়ে নিজেকে উস্তাদের প্রতিচ্ছবিরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করতো। কিন্তু সেই কাওমী মাদরাসা আজ নেই। ছাত্রদের সে অবস্থা এখন আর নেই। তাদের চিন্তায়ও এখন আধুনিকতার অনুপ্রবেশ ঘটছে। ছাত্রদের এখন না উস্তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে, না বড়দের সঙ্গে কোন যোগাযোগ আছে। ব্যস, শুধু 'ক্লাসে' কিছু শব্দ পড়ে নেয়া, তারপর যে যার পথে, যে যার মতে। বন্ধুগণ ঐভাবে আর যাই হোক ইলমে দ্বীন আসবে না, আসতে পারে না। ইলমী ও আমলী জীবন গড়বে না, গড়তে পারে না। এত ছাত্র আসে, এত ছাত্র পড়ে এবং এত ছাত্র ফারেগ হয়। কিন্তু কর্মজীবনে তারা কোথায় হারিয়ে যায়? কী এর কারণ? কোথায় এর রহস্য?

আমার প্রিয় বন্ধুগণ! এই মাদরাসার তালিবানে ইলমকে তো আমি বিশেষ ভাবে বলতে চাই। কেননা মাশাআল্লাহ, এই মাদরাসা বুনিয়াদ তো রাখা হয়েছে

অতি উচ্চ বিনয়ের উপর এবং সুন্নতের পরিপূর্ণ ইত্তেবা-এর উপর। সুতরাং এখানে তো বিশেষভাবে জোর দিতে হবে আকাবিরে উম্মতের প্রতি আযমত ও মুহাব্বাত এবং ভক্তি-শ্রদ্ধার উপর। বিশেষভাবে জোর দিতে হবে আকাবিরে উম্মতের ভাবধারা ও চিন্তা-চেতনা পরিপূর্ণরূপে গ্রহণের উপর। আসাতেযায়ে কেরামের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার উপর এবং মুরুব্বীদের দিকনির্দেশনায় শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করার উপর। অন্তত স্কুল-কলেজের ছাত্রদের যে সম্পর্ক তাদের শিক্ষকদের সঙ্গে, তার চেয়ে বেশী সম্পর্ক তো কাওমী মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকের মাঝে অবশ্যই হতে হবে। এ মাদরাসায় তো এগুলো অবশ্যই হতে হবে। কেননা এখানকার পরিবেশ বড় সাদাসিধা ও শান্ত-সরল। শহরের কোলাহল ও শোরগোল, শহরের আলোড়ন ও আন্দোলন থেকে দূরে এক গ্রামে নিরব শান্ত পরিবেশে আপনাদের মাদরাসা। যেন একখণ্ড সুদূর অতীত! এখানে তো আপনারা অবশ্যই বড় আবেগ ও জাযবা নিয়ে এসেছেন এবং আপনাদের মা-বাবাও বড় আশা ও প্রত্যাশা নিয়ে পাঠিয়েছেন। এখানে আসাতেযায়ে কেরামও একাগ্র চিত্তে, দরদের সাথে তালীম তারবিয়াতে মশগুল আছেন। আলহামদুলিল্লাহ! এখানে তো ঐ সকল ফেতনা নেই যা থেকে শহরের মাদরাসাগুলোকে বাঁচানোর কোন উপায় নেই। আল্লাহ করুন, বহু বহু দিন যেন এখানে ঐ সকল ফেতনা আসতে না পারে।

উস্তাদকে জীবনের মুরুব্বীরূপে গ্রহণ করো

উস্তাদের প্রতি তোমাদের অন্তরে গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করতে হবে, প্রত্যেক উস্তাদের সঙ্গে আদবের আচরণ করতে হবে এবং বিশেষ কোন উস্তাদকে জীবনের মুরুব্বীরূপে এবং আদর্শ ও নমুনারূপে গ্রহণ করতে হবে। তার প্রতিটি নড়া-চড়া, ওঠা-বসা, কথা-বার্তা ও চিন্তা-ভাবনা গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং নিজের জীবনে তার সফল বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে। যারা এটা করতে পেরেছে তাদেরই জীবন-ভেলা অকূল দরিয়া পার হয়ে তীরে এসে ভিড়েছে এবং তারা কামিয়াব হয়েছে। আর যারা নিজের মত চলেছে তারা মাঝ দরিয়ায় ডুবেছে এবং অতলে তলিয়ে গেছে।

যোগত্য অর্জন করো

দ্বিতীয় বিষয় এই যে, ইলমের ক্ষেত্রে তোমরা পারদর্শিতা অর্জন করো, জ্ঞান ও শাস্ত্রে পূর্ণতা লাভ করো। বিভিন্ন মাদরাসায় সবসময় আমি একটা কথা বলে থাকি যে, আমি আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে দু'টি বিষয়কে কামিয়াবি

ও সফলতার চাবিকাঠি রূপে সাব্যস্ত করেছি। তা হলো 'ইখলাছ ও ইখতিছাছ'। অর্থাৎ নিয়তের বিশুদ্ধতা ও বিষয়ের বিশেষজ্ঞতা। প্রথম কথা, আমি যা কিছু করবো, যা কিছু পড়বো-পড়াবো এবং শিখবো-শেখাবো তা শুধু আল্লাহর জন্য, আল্লাহকে খুশী করার জন্য। দ্বিতীয়ত সব বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করবো, কিন্তু অন্তত কোন একটি বিষয়ে পূর্ণ যোগ্যতা ও বিশেষজ্ঞতা অর্জন করবো।

'ইখলাছ ও ইখতিছাছ'- এ দু'টি গুণ হলো তালিবুল ইলমের সেই ডানা যা দ্বারা আমাদের কাওমী মাদারেসের তালিবানে ইলম উর্ধ্বাকাশে উড্ডয়ন করতে পারে। আল্লাহর সঙ্গে মু'আমালা হবে ইখলাছের এবং ইলমের সঙ্গে মু'আমালা হবে ইখতিছাছের। হাদীছ বলো, ফিকাহ বলো, ছারফ ও নাহব বলো, আদব বলো, ভাষা ও সাহিত্য বলো- যে কোন শাস্ত্রের কথাই বলো তাতে তুমি বিশেষজ্ঞতা ও পূর্ণ যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করো। তাহলে তুমি যেখানেই থাকো মানুষ তোমাকে খুঁজে খুঁজে বের করবে। তুমি যদি দুয়ার বন্ধ করে ঘরেও বসে থাকো মানুষ তোমাকে বাধ্য করবে দুয়ার খুলে বের হওয়ার জন্য। মানুষ হাতে ধরে, পায়ে ধরে তোমাকে অনুরোধ করবে যে, আমার সঙ্গে চলুন এবং আমার কাজ করে দিন, আপনার যা কিছু শর্ত ও চাহিদা, আমি তা পূর্ণ করবো। যোগ্যতার মাঝে স্বভাবগত ভাবেই আল্লাহ আকর্ষণের ও বিকাশের গুণ রেখেছেন। তোমার মাঝে কোন বিষয়ে যোগ্যতা থাকবে আর মানুষকে তা আকৃষ্ট করবে না তা হতে পারে না। তদ্রূপ তোমার মাঝে ইখলাছ থাকবে আর আল্লাহ তোমার যিম্মাদারি গ্রহণ করবেন না তা হতে পারে না।

আফসোস, আজ কাওমী মাদারেসের অবস্থা এই হয়েছে যে, কোন শাস্ত্র ও 'ফন'-এর মাহের উস্তাদ দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন, কিংবা মাদরাসা থেকে বিদায় নিলেন, নতীজা অভিন্ন। অর্থাৎ তার স্থান পূরণের জন্য যোগ্য মানুষ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এই খতরনাক অবস্থার সংশোধন কিন্তু ছোট ছোট মাদরাসাগুলো থেকেই সহজে হতে পারে।

সফল শিক্ষা জীবনের সর্বোত্তম উপায় হলো ছোট ছোট মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর বড় বড় মাদরাসায় গিয়ে উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করা। আমাদের বড় বড় মাদরাসাগুলোতে উত্তম যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্র কিন্তু ছোট মাদরাসাগুলো থেকেই আসে। দেওবন্দ, মাযাহেরুল উলূম- সবখানে একই অবস্থা হবে। আমাদের নাদওয়ার অবস্থাও তাই। নাদওয়ায় যারা ছাত্র হিসাবে বিশেষ সুনাম ও কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তারা প্রায় সকলেই কোন ছোট মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে তারপর নাদওয়ায় এসেছেন। কারণ

নাদওয়ায় তো একেক শ্রেণীতে আশি-নব্বইজন ছাত্র হয়, আরো বেশীও হয়। ফলে শিক্ষক প্রতিটি ছাত্রের আলাদা পরিচয়ও মনে রাখতে পারেন না এবং কার কী গুণ ও দুর্বলতা তা বুঝতে পারেন না। আলাদাভাবে কারো পিছনে মেহনত করারও সুযোগ থাকে না। লম্বা রেলগাড়ী যেন নিজের গতিতে চলেছে। পক্ষান্তরে ছোট মাদরাসগুলোতে শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যা হয় দশ থেকে পনেরজন। ফলে উস্তাদ প্রত্যেককে আলাদাভাবে চিনতে পারেন। প্রত্যেকের শিরায় হাত রেখে তার দুর্বলতা চিহ্নিত করতে পারেন এবং শাসনে সোহাগে প্রত্যেককে আলাদাভাবে গড়ে তুলতে পারেন। মোটকথা শিক্ষার প্রাথমিক বুনিয়াদ গড়ার ক্ষেত্রে বড় মাদরাসাগুলোর তুলনায় ছোট মাদরাসাগুলোতে বেশী সুযোগ রয়েছে।

আমাদের যে নিযামে তা'লীম ও শিক্ষাব্যবস্থা শুরু থেকে চলে এসেছে, এই কওমী মাদারেস হলো তার প্রতিনিধি। কিন্তু এখন মাদরাসাগুলো খাতরায় পড়ে গিয়েছে, অস্তিত্বের সংকটে পড়ে গিয়েছে।

এর আসল কারণ হলো জ্ঞান-যোগ্যতা ও শাস্ত্রীয় পারদর্শিতার ঘাটতি এবং মাহির উস্তাদের অভাব। আপনিই বলুন, উপযুক্ত শিক্ষকই যদি না পাওয়া যায় তাহলে শিক্ষার্থী পাওয়া যাবে কীভাবে? খোঁজ নিয়ে দেখুন, বড় বড় আলিম ও আদর্শ শিক্ষক যারা দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন তাঁদের শূন্যস্থান কারা পূরণ করেছেন? হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রাহ), হযরত মাওলানা মদনী (রাহ) এবং মাওলানা ফখরুদ্দীন (রাহ) এর স্থান কারা পূরণ করেছেন? বড় বড় মাদরাসায় এখন শায়খুল হাদীছ পাওয়া যায় না। ইলমুল ফিকাহর শিক্ষক, উছূলে ফিকাহর শিক্ষক পাওয়া যায় না। আদবের শিক্ষক পাওয়া যায় না। আদবের দু'চার জন যাওবা পাওয়া যায় প্রাচীন শাস্ত্রগুলো পড়ানোর শিক্ষক তো একেবারেই পাওয়া যায় না। দিন দিন তাদের সংখ্যা শূন্যের কোঠায় চলে আসছে।

আমার বক্তব্যকে যে ক্ষোভ ও উষ্মার প্রকাশ মনে না করা হয়। কারো প্রতি আমার অনুযোগ নেই। আমি শুধু যামানার অধঃগতি দেখে, রঙ বদল দেখে বিলাপ করছি। তবে এখনো অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে, যদি আপনারা আসাতেযা কেরামের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে তোলেন, যদি মুহব্বতের রিশতা আবার কায়েম করেন। হৃদয়ের বন্ধন দ্বারা আপনাদের এই আসাতেযা কেরাম থেকেও আপনারা অনেক কিছু শিখতে পারেন। তাদের সিনা থেকেও অফুরন্ত 'ফায়য' হাছেল করতে পারেন। কেননা উস্তাদের সিনা থেকে

'ফায়য'-এর প্রবাহ দান করেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এমনকি উস্তাদের সিনায় ফায়য যদি নাও থাকে তাহলে আল্লাহ ফায়য পয়দা করে দেন। তখন সামান্য ইলম থেকেও এমন ফায়য প্রবাহিত হয় যা অনেক সময় বড় বড় ইলমওয়ালা থেকেও হয় না। সবকিছু হলো ভক্তি-মুহব্বত ও হৃদয়-বন্ধনের কারিশমা এবং চেষ্টা-সাধনা ও মেহনত-মোজাহাদার কারামাত।

খুবই ভালো হয়েছে যে, কালকের জলসার পর আজ আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে আলাদাভাবে সম্বোধন করার সুযোগ দান করেছেন। আমি ও আপনারা একই পরিবারের মানুষ, একই কাফেলার যাত্রী, অভিন্ন লক্ষ্যের অভিযাত্রী। তবে আমার বক্তব্যকে আপনারা যেন নিছক বক্তৃতা মনে না করেন। আমার এ হৃদয় নিঙড়ানো আবেদন আপনারা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করুন। আজ এই মজলিস থেকেই প্রতিজ্ঞা করে উঠুন যে, মেহনত-মোজাহাদার মাধ্যমে এখান থেকে আপনারা পূর্ণ যোগ্যতা ও কামিল ইখলাছ হাছিল করবেন। তারপর নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে দ্বীনের ও ইলমে দ্বীনের খিদমতে আত্মনিয়োগ করবেন। যেখানে সম্ভব হবে সেখানেই অবিচল হয়ে বসে পড়বেন। একখানে সম্ভব না হলে অন্যখানে মাদরাসা ও মকতব কায়েম করবেন।

বড় বড় জামেয়া ও দারুল উলূমের তুলনায় ছোট ছোট মাদরাসা ও মকতব কায়েম করাকে আমি বেশী জরুরী ও উপকারী মনে করি। আমি দ্বীনী তা'লীমী কাউন্সিলের যিম্মাদার। আমার ভালোভাবেই জানা আছে যে, আগামী দিনে কী ধরনের বিপ্লব আসছে এবং কোন পথে আসছে? এই হিন্দুস্তানে ধর্মের সাথে পরিচয়হীন, জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কহীন সম্পূর্ণ নতুন এক প্রজন্ম কীভাবে তৈরী হচ্ছে? এই নতুন প্রজন্মকে দ্বীনের সঙ্গে জুড়ে রাখার জন্য বড় বড় দারুল উলূম ততটা কার্যকর নয়, যতটা কার্যকর হবে ছোট ছোট মকতব-মাদরাসা।

কিয়ামত পর্যন্ত এই দ্বীনের অস্তিত্ব আল্লাহ অবশ্যই বাকী রাখবেন। ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ইনশাআল্লাহ হতেই থাকবে, যারা দ্বীনের জন্য, মুসলমানদের দ্বীনী তা'লীম ও তারবিয়াতের জন্য জান কোরবান করবেন, কলিজা পানি করবেন। তাদের বরকতে দ্বীন যিন্দা থাকবে, ইলম বাকী থাকবে এবং তা'লীম ও তারবিয়াত বহাল থাকবে। আমি শুধু কামনা করি যে, আপনারাই হোন সেই মরদে ময়দান। আপনাদেরকেই আগে বাড়তে হবে এবং জানের বাজি লাগাতে হবে। হিন্দুস্তানে মুসলমানদের যত আবাদী আছে, যে বিপুল জনগোষ্ঠী আছে তাদের রিশতা ও সম্পর্ক যেন অটুট থাকে দ্বীনের সঙ্গে, তাওহীদ ও রিসালাতের সঙ্গে, কোরআন ও সুন্নাহর সঙ্গে এবং ইসলামের

তাহযীব-তামাদ্দুন ও সংস্কৃতির সঙ্গে। আপনারা মেহনত করুন, তারপর আল্লাহ্ তা'আলা কাজ নেবেন। এবং এই মেহনতের ফল শুধু হিন্দুস্তানেই নয়, বরং দুনিয়ার অন্যান্য এলাকায়ও পৌঁছে দেবেন। আল্লাহ্ তা'আলা বারবার তাঁর কুদরত প্রকাশ করেছেন, সামনেও তিনি করতে সক্ষম। কিন্তু আমরা যা করতে পারি তা তো আমাদেরকে প্রথমে করতে হবে, তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আপন কুদরতের প্রকাশ ঘটাবেন।

দু'আ করুন আল্লাহ্ যেন আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করেন এবং তাকদীরে ইলাহী যেন এখনই এই মজলিসকে নির্বাচন করেন। এই মজলিসে যারা বসে আছে তাদের দ্বারা যেন তিনি তার দ্বীনের হিফাযতের কাজ নিয়ে নেন। আমীন।

সৌজন্যে– তা'মীরে হায়াত, জুন ১৯৮৬ 'ঈসাঈ

বাংলাভাষার নেতৃত্ব গ্রহণ করুন

১৪ই মার্চ, ১৯৮৪ কিশোরগঞ্জের জামিয়া এমদাদিয়া প্রাঙ্গনে বিশিষ্ট আলিম, ইসলামী বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র-শিক্ষক সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ। প্রথমে তিনি ওলামায়ে হিন্দের সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড ও যুগান্তকারী অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেন। তারপর বাংলাদেশের আলিম ও তালিবানে ইলমের প্রতি ওলামায়ে হিন্দের কর্মধারা অনুসরণের আহ্বান জানান।

তাঁর বক্তব্যের সারসংক্ষেপ এই যে, বাংলাদেশে ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর এই সংকটসন্ধিক্ষণে ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। প্রথমত ইসলামের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক অটুট রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত আলিম সমাজকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় এদেশে আলিম সমাজের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে যেতে পারে।

উপস্থিত ওলামায়ে কিরাম এবং আমার প্রিয় তালিবানে ইলম! এতক্ষণ আমি হিন্দুস্তানী ওলামায়ে কেরামের সংস্কার আন্দোলন এবং কীর্তি ও অবদানের কথা আলোচনা করলাম এবং সফলতার যে চিত্র তুলে ধরলাম, যদি বাংলাদেশে আপনারা সেই সফলতা অর্জন করতে চান তাহলে আপনাদেরও একই পথ ও পন্থা অনুসরণ করতে হবে।

আপনাদের প্রথম কর্তব্য হবে দেশ ও জাতির চিন্তার গতিধারা এবং স্বভাব ও প্রবণতা সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকা এবং সতর্ক দৃষ্টি থাকা। আপনাদের মুহূর্তের অসর্তকতার সুযোগে ইসলামের শত্রুরা এ জাতিকে নিয়ে যেতে পারে জাহেলিয়াতের পথে অনেক দূরে। কারণ আপনারাই হলেন এ জাতির ঈমান-আকীদা ও চিন্তা-চেতনার অতন্দ্র প্রহরী। প্রহরী অসতর্ক বা তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে কোন দুর্গ শত্রুর হামলা থেকে নিরাপদ হতে পারে না। সুতরাং আপনাদেরকে পূর্ণ সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে যেন ইসলামের সঙ্গে এদেশের সম্পর্ক বিন্দুমাত্র শিথিল না হয়। যে দেশ এবং যে জাতির খিদমতের জন্য আল্লাহ আপনাদের নির্বাচন করেছেন তাদের ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে একদিন আপনাদেরকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। নবীর ওয়ারিছ ও উত্তরাধিকারী হিসেবে অবশ্যই আপনাদেরকে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে যে, সেখানে তোমাদের উপস্থিতিতে আমার উম্মত কীভাবে ইসলামের দুশমনদের প্রতারণার শিকার হলো? কীভাবে দ্বীন থেকে সরে গেলো? এ দেশের শাসক যারা, রাজনৈতিক কর্ণধার যারা, তারা জিজ্ঞাসিত হবে কি না, সে প্রশ্ন এখানে নয়। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহনেই যে, সবার আগে ওলামায়ে কেরামের কাছেই কৈফিয়ত চাওয়া হবে যে, তোমরা বেঁচে থাকতে আমার রেখে আসা দ্বীনের এমন করুণ অবস্থা হতে পারলো কীভাবে? কোন্ মুখে আজ আমার সামনে দাঁড়িয়েছো? আল্লাহ হেফাযত করুন, হাশরের ময়দানে আল্লাহর নবীর সামনে যেন লজ্জিত না হতে হয়? আপনারা জানেন, ইরতিদাদের ফিতনার যুগে আল্লাহর রাসূলের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) পরিবেশ ও পরিস্থিতির সকল প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে গর্জে উঠেছিলেন—

أ ينقص الدين و أنا حي؟

আমি বেঁচে থাকবো, আর দ্বীনের অঙ্গহানি হবে?

আপনাদের দেশে এখন ইরতিদাদের ফিতনা শুরু হয়েছে, চিন্তার ইরতিদাদ। সুতরাং সেই ছিদ্দীকী ঈমান বুকে নিয়ে আপনাদেরও আজ গর্জে ওঠতে হবে বাতিলের বিরুদ্ধে, আমরা বেঁচে থাকতে দ্বীনের ক্ষতি হবে? না, তা হতে পারে না। এখন আপনাদেরকে গৌণ মতপার্থক্যগুলো ভুলে গিয়ে দ্বীন ও ঈমান রক্ষার বৃহত্তর ও মৌলিক লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বুদ্ধিবৃত্তিক সংকটে নিপতিত জাতির এ মুহূর্তে বড় প্রয়োজন ওলামায়ে উম্মতের ঐক্যবদ্ধ পথনির্দেশনার।

ইখলাছ ও আত্মত্যাগ, ভালোবাসা ও আন্তরিকতা এবং উন্নত চরিত্রের আলো দ্বারা জাতির সেই অংশটিকে প্রভাবিত ও উদ্বুদ্ধ করুন, তাকদীরের ফায়সালায় যাদের হাতে আজ দেশ শাসনের ভার অর্পিত হয়েছে, কিংবা আগামীকাল অর্পিত হতে চলেছে। এ যুগে শাসনক্ষমতা লাভের জন্য অপরিহার্য যোগ্যতা, দক্ষতা ও উপায়-উপকরণ যাদের হাতে রয়েছে, জাতির সেই সংবেদনশীল অংশটিকে দ্বীনের কাজে প্রতিদ্বন্দ্বী না বানিয়ে সহযোগী বানাবার চেষ্টা করুন। শুধু এবং শুধু দ্বীনের ফায়দার উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করা আপনাদের অপরিহার্য কর্তব্য। অত্যন্ত হিকমত ও প্রজ্ঞার সাথে তাদেরকে তাদের ভাষায় এবং তাদের মেযাজে বোঝাতে হবে।

আপনাদের সম্পর্কে তাদের মনে এ বিশ্বাস ও আশ্বাস যেন অটুট থাকে যে, আপনারা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নন, বরং তাদের ও উম্মতের প্রকৃত কল্যাণকামী। আপনারা নিঃস্বার্থ ও আন্তরিক। তাদের কাছে আপনাদের যেন কোন প্রত্যাশা না থাকে। চাওয়া-পাওয়ার কোন প্রশ্ন যেন না থাকে। সুযোগ সুবিধার কথা হয়ত বলা হবে, লোভ ও প্রলোভনের হাতছানি হয়ত আসবে। এমনকি হয়ত বা সুযোগ গ্রহণের মাঝে দ্বীনের 'ফায়দা' নজরে আসবে। এ বড় কঠিন পরীক্ষা। তখন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর অটল-অবিচল থাকতে হবে। ওয়ারিছে নবীর ঈমান ও বিশ্বাস এবং ইতমিনান ও প্রশান্তি নিয়ে আপনাদের তখন বলতে হবে, তোমাদের দুনিয়া তোমাদের জন্য মোবারক হোক, আমরা তো দ্বীনের রাস্তায় তোমাদের কল্যাণ চাই। তোমাদের আখেরাতের সৌভাগ্য চাই। মনে রাখবেন, আপনাদের বিনিময় আল্লাহর কাছে। আল্লাহ ছাড়া কেউ আপনাদের বিনিময় দিতে পারে না।

দ্বিতীয় যে বিষয়টির প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হলো এ দেশের ভাষা ও সাহিত্য। বাংলাভাষাকে অন্তরের মমতা দিয়ে গ্রহণ করুন এবং মেধা ও প্রতিভা দিয়ে বাংলা সাহিত্য চর্চা করুন। কে বলেছে, এটা অস্পৃশ্য ভাষা? কে বলেছে, এটা হিন্দুদের ভাষা? বাংলাভাষা ও সাহিত্যচর্চায় পুণ্য নেই, পুণ্য শুধু আরবীতে উর্দুতে, কোথায় পেয়েছেন এ ফতোয়া? এ ভ্রান্ত ও আত্মঘাতী ধারণা বর্জন করুন। এটা অজ্ঞতা, এটা মূর্খতা এবং আগামীদিনের জন্য এর পরিণতি বড় ভয়াবহ।

এ যুগে ভাষা ও সাহিত্য হলো চিন্তার বাহন, হয় কল্যাণের চিন্তা, নয় ধ্বংসের চিন্তা। বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে আপনারা শুভ ও কল্যাণের এবং ঈমান ও বিশ্বাসের বাহনরূপে ব্যবহার করুন। অন্যথায় শত্রুরা একে ধ্বংস ও বরবাদির এবং শিরক ও কুফুরির বাহনরূপে ব্যবহার করবে।

সাহিত্যের অঙ্গনে আপনাদেরকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন অধিকার করতে হবে। আপনাদের হতে হবে আলোড়ন সৃষ্টিকারী লেখক-সাহিত্যিক ও বাগ্মী বক্তা। ভাষা ও সাহিত্যের সকল শাখায় আপনাদের থাকতে হবে দৃপ্ত পদচারণা। আপনাদের লেখা হবে শিল্পসম্মত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। আপনাদের লেখনী হবে জাদুময়ী ও অগ্নিগর্ভা, যেন আজকের ধর্মবিমুখ শিক্ষিত সমাজ অমুসলিম ও নামধারী মুসলিম লেখক-সাহিত্যিকদের ছেড়ে আপনাদের সাহিত্য নিয়েই মেতে ওঠে এবং আপনাদের কলম-জাদুতেই আচ্ছন্ন থাকে।

দেখুন; এ কথা আপনারা লখনৌর অধিবাসী, উর্দুভাষার প্রতিষ্ঠিত লেখক এবং আরবীভাষার জন্য জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তির মুখ থেকে শুনছেন। আলহামদু লিল্লাহ, আমার বিগত জীবন কেটেছে আরবীভাষার সেবায় এবং আল্লাহ চাহে তো আগামী জীবনও আরবীভাষারই সেবায় হবে নিবেদিত। আরবীভাষা আমাদের নিজেদের ভাষা, বরং আমি মনে করি যে, আমাদের মাতৃভাষা। আমাদের কথা থাকুক, আল্লাহর শোকর আমার খান্দানের অনেক সদস্যের এবং আমার ছাত্রদের অনেকের সাহিত্য প্রতিভা খোদ আরব সাহিত্যিকদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আরবরাও নিঃসংকোচে স্বীকার করে।

বন্ধুগণ! উর্দুভাষার পরিবেশে যে চোখ মেলেছে, আরবী সাহিত্যের সেবায় যার জীবন-যৌবন নিঃশেষ হয়েছে সে আজ তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে পূর্ণ দায়িত্ব সচেতনতার সাথে বলছে, বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে ইসলাম বিরোধী শক্তির রহম করমের উপর ছেড়ে দিও না। 'ওরা লিখবে, তোমরা পড়বে' – এ

অবস্থা কিছুতেই বরদাশত করা উচিত নয়। মনে রেখো, লেখা ও লেখনীর রয়েছে অদ্ভূত প্রভাবক শক্তি যে, এর মাধ্যমে লেখকের ভাব-অনুভূতি, এমনকি তার হৃদয়ের স্পন্দনও পাঠকের মাঝে সংক্রমিত হয়। অনেক সময় পাঠক নিজেও তা অনুভব করতে পারে না। অবচেত মনে চলে তার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। ঈমানের শক্তিতে বলীয়ান লেখকের লেখনী পাঠকের অন্তরেও সৃষ্টি করে ঈমানের বিদ্যুত প্রবাহ। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ) বলতেন–

'প্রত্রযোগেও মুরীদের প্রতি তাওয়াজ্জুহ আত্মসংযোগ নিবদ্ধ করা যায়। শায়খ তাওয়াজ্জুহসহকারে মুরীদের উদ্দেশ্যে যখন পত্র লেখেন তখন সে পত্রের হরফে হরফে থাকে এক অত্যাশ্চর্য প্রভাবশক্তি।'

এ ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও রয়েছে। আমাদের মহান পূর্ববর্তীদের রচনাসম্ভার আজো বিদ্যমান রয়েছে। পড়ে দেখুন, আপনার ছালাতের প্রকৃতি বদলে যাবে। হয়ত পঠিত বিষয়ের সঙ্গে ছালাতের কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু লেখার সময় হয়ত সেদিকে তাঁর তাওয়াজ্জুহ নিবদ্ধ ছিলো। এখন সে লেখা পড়ে গিয়ে ছালাত আদায় করুন; হৃদয় জীবন্ত এবং অনুভূতি জাগ্রত হলে অবশ্যই আপনি উপলব্ধি করবেন যে, আপনার ছালাতের রূপ ও প্রকৃতি বদলে গেছে, তাতে রূহ ও রূহানিয়াত সৃষ্টি হয়েছে। এ অভিজ্ঞতা আমার বহুবার হয়েছে। আপনি অমুসলিম লেখকের সাহিত্য পাঠ করবেন, তাদের রচিত গল্প-উপন্যাস ও কাব্যের রস উপভোগ করবেন, তাদের লিখিত ইতিহাস গলাধঃকরণ করবেন অথচ আপনার হৃদয়ে তা রেখাপাত করবে না, আপনার চিন্তা-চেতনাকে তা আচ্ছন্ন করবে না, এটা কী করে হতে পারে? আগুন জ্বালাবে না এবং বিষ তার ক্রিয়া করবে না, এটা কীভাবে বিশ্বাস করা চলে? চেতন মনে আপনি অস্বীকার করুন, কিন্তু আপনার অবচেতন মনে লেখা ও লেখনী তার নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করবেই। আমি মনে করি আপনাদের জন্য এটা বড়ই লজ্জার কথা। বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত না হলে আমার কিছুতেই বিশ্বাস হতো না যে, যে দেশে যে ভাষায় লক্ষ লক্ষ আলিমের জন্ম হয়েছে সে দেশে সেভাষায় কোরআনের প্রথম অনুবাদকারী হচ্ছেন একজন হিন্দু সাহিত্যিক।

এদেশের মুসলিম সাহিত্যিকদের আপনারা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরুন। নজরুল ও ফররুখকে তুলে ধরুন। সাহিত্যের অঙ্গনে তাদেরও যে অবিস্মরণীয় কীর্তি ও কৃতিত্ব রয়েছে তা বিশ্বকে অবহিত করুন। নিবিষ্ট চিত্ত ও গবেষক দৃষ্টি নিয়ে তাদের সাহিত্য অধ্যয়ন করুন, অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করুন এবং সম্ভব হলে আরবীভাষায়ও তাদের সাহিত্য তুলে ধরুন। কত শত আলোড়ন সৃষ্টিকারী

মুসলিম সাহিত্য-প্রতিভার জন্ম এ দেশে হয়েছে তাদের কথা লিখুন। বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে তাদের তুলে আনুন।

আল্লাহর রহমতে এমন কোন যোগ্যতা নেই যা কুদরতের পক্ষ হতে আপনাদের দেয়া হয় নি। হিন্দুস্তানে আমাদের মাদরাসাগুলোতে এমন অনেক বাঙ্গালী ছাত্র আমি দেখেছি যাদের মেধা ও প্রতিভার কথা মনে হলে এখনো ঈর্ষা জাগে। পরীক্ষায় ও প্রতিযোগিতায় তাদের মোকাবেলায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্ররা অনেক পিছনে থাকতো। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাকে মানপত্র দেয়া হয়েছে। আমাদের ধারণাই ছিলো না যে, এত সুন্দর আরবী লেখার লোকও এখানে রয়েছে। কখনো হীনমন্যতার শিকার হবেন না। সব রকম যোগ্যতাই আল্লাহ আপনাদের দান করেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এগুলোর সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না।

আমার কথা মনে রাখবেন। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে নিতে হবে। দু'টি শক্তির হাত থেকে নেতৃত্ব ছিনিয়ে আনতে হবে। অমুসলিম শক্তির হাত থেকে এবং অনৈসলামী শক্তির হাত থেকে। অনৈসলামী শক্তি অর্থ ঐসব নামধারী মুসলিম লেখক-সাহিত্যিক যাদের মন-মস্তিষ্ক ও চিন্তা-চেতনা ইসলামী নয়। ক্ষতি ও দুষ্কৃতির ক্ষেত্রে এরা অমুসলিম লেখকদের চেয়েও ভয়ংকর।

মোটকথা, এ উভয় শক্তির হাত থেকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব ছিনিয়ে আনতে হবে। নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করুন এবং এমন অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টি করুন যেন অন্য দিকে কেউ ফিরেও না তাকায়। আলহামদু লিল্লাহ! আমাদের হিন্দুস্তানী আলিম সমাজ প্রথম থেকেই এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। ফলে সাহিত্য, কাব্য, সমালোচনা, ইতিহাস– এক কথায় সাহিত্যের সর্বশাখায় এখন আলিমদের রয়েছে দৃপ্ত পদচারণা। তাঁদের উজ্জ্বল প্রতিভার সামনে সাহিত্যের বড় বড় দাবীদাররাও নিষ্প্রভ। একবার একটি জনপ্রিয় উর্দু সাহিত্যসাময়িকীর পক্ষ হতে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিলো। প্রতিযোগীদের দায়িত্ব ছিলো উর্দুভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নির্বাচন। বিচারকদের রায়ে তিনিই পুরস্কার লাভ করেছেন যিনি মাওলানা শিবলী নোমানীকে উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরুষ প্রমাণ করেছিলেন। উর্দুভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক কোন সম্মেলন বা সেমিনার হলে সভাপতিত্বের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হতো মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নদবী, মাওলানা আব্দুসসালাম নদবী, মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শিরওয়ানী, কিংবা মাওলানা

আবদুল মাজেদ দরয়াবাদীকে। উর্দু কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসের উপর দু'টি বই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত। একটি হলো মওলভী মুহাম্মদ হোসাইন আযাদ কৃত 'আবে হায়াত', দ্বিতীয়টি আমার মরহুম পিতা মাওলানা আবদুল হাই কৃত 'গুলে রা'না' (কোমল গোলাপ)

মোটকথা হিন্দুস্তানে উর্দু সাহিত্যকে আমরা অন্যের নিয়ন্ত্রণে যেতে দেই নি। তাই আল্লাহর রহমতে সেখানে কেউ এ কথা বলতে পারে না যে, মাওলানা উর্দু জানে না, কিংবা টাকশালী উর্দুতে তাদের হাত নেই। এখনো হিন্দুস্তানী আলিমদের মাঝে এমন লেখক, সাহিত্যিক ও অনলবর্ষী বক্তা রয়েছেন যাদের সামনে দাঁড়াতেও অন্যদের সংকোচ বোধ হবে। ঠিক এ কাজটাই আপনাদের করতে হবে বাংলাদেশে।

আমার কথা আপনার লিখে রাখুন। দীর্ঘ জীবনের লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন, কিংবা বিমাতাসুলভ আচরণ এ দেশের আলিম সমাজের জন্য জাতীয় আত্মহত্যারই নামান্তর হবে।

প্রিয় বন্ধুগণ! আমার এ দু'টি কথা মনে রেখো; এর বেশী আর কিছু আমি বলতে চাই না। প্রথম কথা হলো– এই দেশ ও জাতির হিফাযতের দায়িত্ব তোমাদের। সুতরাং ইসলামের সাথে এ দেশের সম্পর্ক কোন অবস্থাতেই যেন শিথিল হতে না পারে। অন্যথায় তোমাদের এই শত শত মকতব-মাদরাসা বেকার ও মূল্যহীন হয়ে পড়বে। আমি সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই। আমার কথায় তোমরা দোষ ধরো না। কেননা আমি তো মাদরাসারই মানুষ, মাদরাসার চৌহদ্দিতেই কেটেছে আমার জীবন। আমি বলছি, আল্লাহ না করুন, ইসলামই যদি এ দেশে বিপন্ন হলো তাহলে মকতব-মাদরাসার কী প্রয়োজন থাকলো, বরং এগুলোর অস্তিত্বের সুযোগই বা কোথায় থাকলো? সুতরাং তোমাদের প্রথম কাজ হলো এদেশে ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা করা, ইসলামের সঙ্গে এ জাতির বন্ধন অটুট রাখা। দ্বিতীয় কাজ হলো, যে কোন মূল্যে দেশ ও জাতির নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেয়া। আর তা বাংলাভাষা ও সাহিত্যে পূর্ণ অধিকার এবং সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন ছাড়া কখনো সম্ভব নয়।

আমার খুবই আফসোস হচ্ছে যে, আপনাদের সাথে আমি বাংলাভাষায় কথা বলতে সক্ষম নই। যদি আমি আপনাদের ভাষায় আপনাদেরকে সম্বোধন করতে পারতাম তাহলে আজ আমার আনন্দের কোন সীমা থাকতো না। ইসলামের দৃষ্টিতে কোন ভাষাই পর নয়, বিদেশী নয়। পৃথিবীর সকল ভাষাই আল্লাহর সৃষ্টি এবং প্রত্যেক ভাষারই রয়েছে নিজস্ব কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য। ভাষা বিদ্বেষ হলো

জাহেলিয়াতের উত্তরাধিকার। কোন ভাষা যেমন পূজনীয় নয়, তেমনি ঘৃণা-বিদ্বেষেরও পাত্র নয়। একমাত্র আরবীভাষাই পেতে পারে পবিত্র ভাষার মর্যাদা। এছাড়া পৃথিবীর আর সব ভাষাই সমমর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ মানুষকে বাকশক্তি দিয়েছেন এবং যুগে যুগে মানুষের মুখের ভাষা উন্নতি ও সমৃদ্ধির বিভিন্ন সোপান অতিক্রম করে বর্তমান রূপ ও আকৃতিতে আমাদের কাছে পৌঁচেছে। মুসলমান প্রতিটি ভাষাকেই শ্রদ্ধা ও মর্যাদার চোখে দেখে। কেননা ভাষা আল্লাহর সৃষ্টি, আল্লাহর দান এবং মনের ভাব প্রকাশে সব ভাষাই মানুষকে সাহায্য করে। তাই প্রয়োজনে যে কোন ভাষা শিক্ষা করা ইসলামেরই নির্দেশ। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়দ বিন ছাবিত (রাঃ) কে হিব্রুভাষা শেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথচ হিব্রু হচ্ছে নির্ভেজাল ইহুদী ভাষা। মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যদি আমরা উদাসীন থাকি তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তা চলে যাবে বাতিল শক্তির নিয়ন্ত্রণে। ফলে যে ভাষা ও সাহিত্য হতে পারতো ইসলামের শিক্ষা ও দীক্ষা প্রচারের কার্যকর মাধ্যম, সেটাই হয়ে দাঁড়াবে শয়তান ও শয়তানিয়াতের বাহন। আপনাদের এখানে কলকাতা থেকে বিরুদ্ধ সংস্কৃতির সাহিত্য আসছে। সাহিত্যের ছদ্মাবরণে ইসলামবিরোধী বাদ-মতবাদ এবং চরিত্রবিধ্বংসী সংস্কৃতির প্রচার চলছে। তাতে ইসলামী মূল্যবোধ ধ্বংসের মালমশলা মেশানো হচ্ছে, আর সরলমনা তরুণ সমাজ গোগ্রাসে তাই গিলছে। এর পরিণতি কখনো শুভ হতে পারে না।

আপনারা তিরমিযি, মিশকাত, কিংবা মীযানের শরাহ লিখতে চাইলে আরবী-উর্দুতে লিখুন, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু জনগণকে বোঝাতে হলে জনগণের ভাষায় কথা বলতে হবে। যুগে যুগে আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলকে তাঁদের কাওমের ভাষায় কথা বলতে হয়েছে। নায়েবে রাসূল হিসাবে আপনাদেরও একই তরীকা অনুসরণ করতে হবে।

আমি আপনাদের খিদমতে পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই– পাক-ভারত উপমহাদেশে হাদীছ, তাফসীর, ফেকাহ ও উছূল শাস্ত্রের উপর এ পর্যন্ত অনেক কাজ হয়েছে। পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যাখ্যা ও টীকাগ্রন্থও লেখা হয়ে গেছে। তাতে নতুন সংযোজনের বিশেষ কিছু নেই। আপনাদের সামনে এখন পড়ে আছে কর্মের নতুন ও বিস্তৃত এক ময়দান। দেশ ও জাতির উপর আপনাদের নিয়ন্ত্রণ যেন শিথিল হতে না পারে। মানুষ যেন মনে না করে যে, দেশে থেকেও আপনারা পরদেশী। স্বদেশের মাটিতে এই প্রবাস-জীবন অবশ্যই আপনাদের ত্যাগ করতে হবে। মনে রাখবেন, এ দেশেই আপনাদের থাকতে হবে এবং এ

দেশের সমাজেই দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দিতে হবে। এদেশের সাথেই আপনাদের ভাগ্য ও ভবিষ্যত জড়িত।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا فليبلغ الشاهد الغائب

হে মুসলামনগণ! তোমাদের জান এবং তোমাদের মাল এবং তোমাদের আবরু-ইজ্জত পরস্পরের জন্য হারাম ও পবিত্র। যেমন এই মাসের এই দিনটি তোমাদের জন্য হারাম ও পবিত্র। যারা উপস্থিত তারা আমার বাণী পৌঁছে দাও ঐলোকদের কাছে যারা অনুপস্থিত।

সুতরাং ভাষাগত পার্থক্যের কারণে কোন মুসলমান ভাইকে অপমান করা, তার ইজ্জত-আবরু লুণ্ঠন করা, কিংবা তাকে হত্যা করা হবে চরম জুলম ও অবিচার। আল্লাহ বলেছেন–

قد جعل الله لكل شيء قدرا

প্রতিটি বস্তুর জন্য আল্লাহ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ও স্তর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কোন মুসলমানের জন্য সে সীমা লঙ্ঘন করা বৈধ নয়। মাতৃভাষা ও সাহিত্যকে ভালোবাসো। চর্চা-সাধনায় আত্মনিয়োগ করো। তোমার সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ ঘটাও, কাব্যের রস উপভোগ করো, কিন্তু অতিরঞ্জন ও সীমা লঙ্ঘন করো না। কোরআন শরীফকেও যদি কেউ পূজা করা শুরু করে এবং উপাস্যজ্ঞানে সিজদা করে তবে সে মুশরিক হয়ে যাবে। কেননা ইবাদত শুধু আল্লাহর প্রাপ্য। তবে সব ভাষাকে স্ব স্ব মর্যাদায় বহাল রেখে মাতৃভাষাকে ভালোবাসা এবং স্বীয় অবদানে তাকে সমৃদ্ধ করে তোলা শুধু প্রশংসনীয়ই নয়, অপরিহার্য কর্তব্যও বটে।

বন্ধুগণ! আমি পরদেশী মুসাফির। দুদিনের জন্য এসেছি তোমাদের দেশে তোমাদের মেহমান হয়ে। তোমাদের কল্যাণ কামনায় নিবেদিত হয়ে الدين النصيحة এই হাদীছের উপর আমল করে তোমাদের কয়েকটি উপদেশ দিয়ে গেলাম। যদি পরদেশী মুসাফির ভাইয়ের এ দরদভরা আওয়ায তোমাদের মনে থাকে তাহলে একদিন না একদিন অবশ্যই এর গুরুত্ব তোমরা উপলব্ধি করতে পারবে। কিন্তু তা যেন সময় পার হয়ে যাওয়ার পর এবং পানি মাথার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার পর না হয়। একদিন তোমরা অবশ্যই বোঝবে, আমি কী বলেছিলাম এবং কেন বলেছিলাম।

فستذكرون ما أقول لكم و أفوض أمري إلى الله ، إن الله بصير بالعباد

তোমাদের যা বলছি, অচিরেই তোমরা তা স্মরণ করবে। আমি আমার যাবতীয় বিষয় আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছি। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সবকিছু দেখেন।

আসমানের ফিরেশতারা যেন সাক্ষী থাকে, কিরামান কাতিবীন যেন লিখে রাখে যে, প্রতিবেশী ভাইদের প্রতি আমি আমার দায়িত্ব পূর্ণ করেছি। আমি আবার বলছি– শেষবারের মত বলছি, তোমরা যদি এ দেশের মাটিতে বাঁচতে চাও; যদি এখানে ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা করতে চাও তাহলে এটাই হচ্ছে একমাত্র পথ। আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন। আমীন।

তাম্মা বিহামদিল্লাহি বিল খায়রি